আধুনিক
মননে
আলোর
পরশ

মিজানুর রহমান আজহারি

Scanned by CamScanner

বই সম্পর্কে

একটি স্বর্ণালি সমাজ বিনির্মাণে প্রয়োজন কিছু সুন্দর মনের পরিশীলিত মানুষ। মানুষের মনোজগৎ ও আচরণে পরিশুদ্ধতা এলে স্বাভাবিকভাবেই তার সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে সমাজের প্রতিটি স্তরে। সমাজ হয়ে ওঠে ন্যায়-ইনসাফ ও সমৃদ্ধির স্বর্গরাজ্য। কিন্তু আত্মিক পরিশুদ্ধি আকস্মিক অর্জনের কোনো বিষয় নয়। আন্তরিক নিষ্ঠা ও ধারাবাহিক অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়েই গঠিত হয় নির্মল হৃদয়। এই প্রক্রিয়ার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত মানুষের চিন্তা-বিশ্বাস, আচার-উচ্চারণ, জীবনদর্শন ও লাইফস্টাইলে ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধন; সেইসঙ্গে সত্যের পথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রজন্ম নির্মাণ। আর এই বিষয়গুলোরই সাবলীল উপস্থাপনা আমাদের *আহ্বান*।

নৈতিক ও নিষ্ঠাবান প্রজন্ম গঠনে মিজানুর রহমান আজহারির প্রথম সওগাত *ম্যাসেজ*। *আহ্বান* তার দ্বিতীয় কিস্তি। এই পবিত্র আহ্বানে আপনাকে স্বাগত।

Scanned by CamScanner

আহ্বান

আধুনিক মননে আলোর পরশ

মিজানুর রহমান আজহারি

Scanned by CamScanner

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা—১১০০
০২-৫৭১৬৩২১৪, ০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
info@guardianpubs.com
www.guardianpubs.com

প্রথম প্রকাশ	২২ মার্চ, ২০২২
গ্রন্থস্বত্ব	লেখক
প্রচ্ছদ	সাইমুম আহমেদ হাসিব
নামলিপি	দিনার মিনহাজ
আইএসবিএন	৯৭৮-৯৮৪-৯৬৫৮৪-৩-৬
ফিক্সড প্রাইস	২৭০ টাকা

ফিক্সড প্রাইসে বই কিনুন

Scanned by CamScanner

প্রকাশকের কথা

বইয়ের পাতায় দুনিয়া কাঁপানো তুমুল জনপ্রিয় মানুষদের জীবনী পড়েছি। মনে ভাবনা জাগত—তাদের যদি একবার দেখতে পেতাম। প্রবীণ নাগরিকদের মুখে যখন তাদের দেখা সফল মানুষদের গল্প শুনতাম, তখন ইচ্ছে হতো সেসব সফল মানুষকে দেখার। বুঝতে চাইতাম—ঠিক কী কারণে একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে এত ভালোবাসে? সফল মানুষরা কীভাবে তাদের সাফল্যগাথা রচনা করে, তা জানার এক বিপুল আগ্রহ ছিল। মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠার মতো কঠিন কাজ আর কী হতে পারে?

আমার সৌভাগ্য, বই নিয়ে কাজ করার সুবাদে বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় দাঈ, চিন্তক ও আলোচক মিজানুর রহমান আজহারি ভাইকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। 'তুমুল জনপ্রিয়' শব্দ দুটো তাঁর নামের সাথে খুবই মানানসই, এতে হাতে গোনা দু-একজন ছাড়া কারও দ্বিমত থাকার কথা না। তাঁর সাথে কাজ করে বুঝেছি, সফল মানুষরা কেন সফল হয়। শিখেছি, কীভাবে একটা কাজের পেছনে লেগে থাকতে হয়। বিনয় আর নিরহংকারের ছবক পেয়েছি সন্তোপর্ণে। বড়ো মানুষদের চিন্তা, দর্শন, বোধ ও আচরণ আদতেই অনেক বড়ো মানুষের মতো।

প্রকাশকের কথার শুরুতেই এসব আলাপ তোলার কারণ আছে। ব্যক্তি যখন প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেন, ব্যক্তিত্বের আভা যখন কোটি মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে, তখন তাঁর ব্যাপারে জনপরিসরে জানানোর একটা তাগিদ থাকেই। বইয়ের জগতের একজন মানুষ হিসেবে আশ্বস্ত করছি, আপনারা এতদিন মুহতারাম আজহারির জবানীতে অমীয় সুধা পান করেছেন, এখন ধীরেধীরে তাঁর কলমের ধার দেখতে পাবেন, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর কলমেও বিশেষ রহমত ঢেলে দিয়েছেন, মুহূর্তেই দারুণ করে লিখতে পারেন। শব্দচয়ন ও বাক্যগঠনে, ভাবের বহিঃপ্রকাশে তিনি পরিণত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছেন। একজন কথক সহজে লিখতে পারেন না; বলা আর লেখা ভিন্ন দুটো বিষয়। কিন্তু তিনি উভয়ের মাঝে এক নতুন সেতু নির্মাণ করে চলছেন।

Scanned by CamScanner

কেন আজহারিকে পাঠ করছে তরুণরা? আগেই উল্লেখ করেছি, তিনি 'বিপুল জনপ্রিয়'। তাঁর কথা মানুষ তন্ময় হয়ে শোনেন, তাঁর কথা শোনার জন্য মানুষ অপেক্ষা করেন। তাঁর নসিহা গ্রহণ করার জন্য প্রজন্মের বড়ো একটা অংশ প্রতীক্ষার প্রহর গোনে। খুব সাধারণ কথামালাকে অসাধারণভাবে উপস্থাপনের এক দারুণ যোগ্যতা রাব্বুল আলামিন তাঁকে দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। তাঁর প্রথম বই *ম্যাসেজ : আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া* লাখো তরুণের হাতে পৌঁছেছে। অনেক তরুণ আমাদের মেইল করেছে, ফোন করেছে; অসংখ্য তরুণের মননে দ্বীনের ছোঁয়া লেগেছে। এর চেয়ে আনন্দের খবর, ভালো খবর আর কী হতে পারে?

আলহামদুলিল্লাহ! *আহ্বান : আধুনিক মননে আলোর পরশ* সম্মানিত লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ। বলা যায় প্রথমটার সিক্যুয়াল। এই গ্রন্থে সুনির্দিষ্ট আটটি বিষয়ে উম্মাহর সামনে লেখকের ভাবনা ও প্রস্তাবনা উপস্থাপিত হয়েছে। স্পিরিচুয়াল নসিহার পাশাপাশি জীবনঘনিষ্ঠ কিছু আলাপ সামনে এসেছে। আমরা বিশ্বাস করি, পাঠকরা খুব সহজ ভাষায় আসমানি আলোর পরশ অনুভব করবেন, নতুন বোধের মুখোমুখি হবেন, ইনশাআল্লাহ।

আমাদের আহ্বান আল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার, চিরস্থায়ী মুক্তি নিশ্চিত করার।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১৭ মার্চ, ২০২২

Scanned by CamScanner

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত, যাঁর অপার করুণায় পূর্ণতা পায় আমাদের যাবতীয় সৎকর্ম। দরুদ ও সালাম প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, যিনি আমৃত্যু আমাদের আহ্বান করে গেছেন মহাসত্যের দিকে।

আমি ক্ষুদ্র মানুষ; চেষ্টা করি শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আল্লাহর বান্দাদের দ্বীনের পথে আহ্বান করতে। সাধ্যের সবটুকু দিয়ে দ্বীনের বুঝ জনপরিসরে তুলে ধরার এক আসমানি তাগাদা হৃদয়ে সর্বদাই অনুভব করি। আমি আলোচনার জগতের মানুষ; কথা বলার মাঝেই স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পাই। তবে এই প্রজন্মের একজন তরুণ হিসেবে মনেপ্রাণে চাই সম্ভাব্য সকল উপায়ে সত্যের পয়গাম মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে। সেই তাড়না থেকেই হাতেকলম তুলে নেওয়া। প্রায় বছর খানেকের ব্যবধানে একুশে বইমেলা ২০২২-এ বাজারে আসছে আমার দ্বিতীয় বই *আহ্বান : আধুনিক মননে আলোর পরশ*। বাংলা সাহিত্যের দুনিয়ায় ছোট্ট একজন কন্ট্রিবিউটর হিসেবে অংশ নিতে পেরে আমি যারপরনাই আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত।

গত কয়েক বছরে ইসলামি সাহিত্যাঙ্গনে অসাধারণ কিছু কন্টেন্ট যুক্ত হয়েছে। আমাদের পূর্বসূরিরা তো বটেই, হালের তরুণরাও লিখে চলেছে অদম্য গতিতে। লাখো পাঠক ইসলামি সাহিত্য পড়ছে। নতুন প্রজন্ম দ্বীনকে জানতে চায়, খুঁজে পেতে চায় সত্যের দিশা। জ্ঞান-তৃষ্ণায় কাতর এই মুসাফিরদের হরফের পানি পান করানোর নৈতিক দায়িত্ব আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। তাই সাহিত্যের মানুষ না হয়েও লেখালিখির দুঃসাহস করেছি। পেরেছি খুব সামান্য কিছুই।

সাহিত্যরূপ অপার দরিয়ায় দুফোঁটা পানি যুক্ত করতে পেরে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি। প্রথম গ্রন্থ—*ম্যাসেজ : আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া* যেভাবে পাঠকবৃন্দ গ্রহণ করেছেন; তাতে আমি অভিভূত, বিস্মিত। সম্মানিত পাঠকদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েই নতুন করে লেখার হিম্মত পেয়েছি।

সময়কে ধারণ করে সুনির্দিষ্ট আটটি বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হয়েছে এই গ্রন্থে। বইটিতে কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতি, সাহাবিদের বক্তব্য, সালাফদের ভাষ্য,

Scanned by CamScanner

বিভিন্ন শিক্ষণীয় ঘটনা, ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক স্কলারদের রেফারেন্সের পাশাপাশি আমার নিজস্ব কিছু চিন্তা-ভাবনাও উপস্থাপিত হয়েছে। বরাবর বলে এসেছি—আমাদের বক্তৃতা, লেখালিখি কিংবা দ্বীনের যেকোনো উপস্থাপনা পদ্ধতি হওয়া উচিত সহজ-সরল, জীবনঘনিষ্ঠ। গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষায় হয়তো উচ্চশিক্ষিত শ্রেণিকে আকৃষ্ট করা যায়, কিন্তু সাধারণ জনতার দুয়ারে পৌঁছানো যায় না। তাই ভাবনাগুলোকে বৈঠকি কথামালায় রূপ দিয়ে কিছু আহ্বান জানিয়েছি বইটিতে। বিশেষভাবে খেয়াল রেখেছি—প্রকাশভঙ্গি যাতে তরুণ ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকজনের বোধের অতীত হয়ে না ওঠে। সকল ধর্ম, বয়স, শ্রেণি-পেশার পাঠক নিজেদের সাথে বইটিকে কানেক্ট করতে পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রতিশ্রুতিশীল প্রকাশনা সংস্থা গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সকে পাশে পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। পুরো টিম দুর্দান্ত পরিশ্রম করেছে। গ্রন্থটিকে পাঠকদের সামনে স্মার্টলি উপস্থাপন করতে বেশ কিছু তরুণ দিন-রাত শ্রম দিয়েছে, তাদের সকলের প্রতিই আন্তরিক মোবারকবাদ। প্রত্যেকের কল্যাণ কামনা করছি।

মানুষ হিসেবে আমরা কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নই। এই বইটিতেও কোনো ভুল থাকবে না—এমন দাবি করা হবে মোটের ওপর অন্যায্য। মানবিক দুর্বলতাপ্রসূত বিশেষ কোনো টাইপিং মিসটেইক অথবা তথ্যগত অসংগতি আপনাদের চোখে পড়লে দয়া করে আমাদের জানাবেন। আমরা পরবর্তী সংস্করণে সেটা সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

আহ্বান বইটিতে মানুষের বোধ ও বিশ্বাসে উন্নয়ন, আত্মিক সমৃদ্ধি, সম্পর্কের রসায়ন এবং লাইফস্টাইলে ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধন নিয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আশা রাখছি, বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের নিকট ইসলামের সৌন্দর্য, মূল তাৎপর্য, স্পিরিট ও মধ্যপন্থার শিক্ষা তুলে ধরতে বইটি কিছুটা হলেও অবদান রাখবে, কাজ করবে সঠিক জীবনদর্শন বিনির্মাণে অনন্য সহায়িকা হিসেবে। আধুনিক মননে দ্বীনের পরশ লাগুক—এই প্রত্যাশায় স্বাগত জানাই আলোকের আহ্বানে।

মিজানুর রহমান আজহারি
১২ মার্চ, ২০২২

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

Scanned by CamScanner

কাছে আসার গল্প

কখনো কি বিজন অন্ধকারে রবের পানে মুখ তুলে বলেছেন—'দয়াময় প্রভু! প্রাণাধিক ভালোবেসেছি তোমায়!'

ঝলমলে জ্যোৎস্নার আলো গায়ে মেখে কখনো কি খুঁজেছেন রহমতের সুধা? অনুভব করেছেন কি কদর রাতে শান্তির সমীরণ? ভেবে দেখেছেন কি—এই যে আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রকম্পিত হচ্ছে, ধমনিতে রক্ত বইছে আপন ধারায়, নিয়ম মেনে সংকুচিত ও সম্প্রসারিত হচ্ছে মস্তিষ্কের অসংখ্য সূক্ষ্ম নিউরন, আপনার প্রতিটি স্পর্শ কিংবা উপলব্ধি—সবই মহান রবের অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ! আপনার সামগ্রিক অস্তিত্বই মহান রবের অনিঃশেষ রহমত ও ভালোবাসার জ্যোতির্ময় নিদর্শন!

তিনি তো সেই রব, যিনি আমাদের ক্ষমা করার জন্য মুখিয়ে থাকেন; অথচ কী নির্বোধ আর হতভাগা আমরা! মহান রবের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনার ফুরসতই পাই না। লাগাতার লিপ্ত থাকি নানাবিধ পাপাচারে। এতৎসত্ত্বেও তিনি আমাদের অক্সিজেন বন্ধ করে দেন না। এমনকী বন্ধ কামরায় নিভৃতে যখন গুনাহ ও নাফরমানিতে লিপ্ত হই, তখনও দরজার ফাঁক গলে অক্সিজেন সরবরাহ করে আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন তিনি। আমরা তাঁকে ভুলে থাকি হররোজ, কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও তিনি ভুলেন না আমাদের। আমরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও তিনি পরম মমতায় কাছে ডেকে বলেন—'আমার দিকে এক পা এগিয়ে এসো, তোমার দিকে দুই পা এগিয়ে যাব আমি।' শেষ রাতের নিস্তব্ধতায় শান্ত-নিবিড় আবহে যে মহান প্রভু বান্দার দিকে স্নেহের বাহু

Scanned by CamScanner

বাড়িয়ে আহ্বান করেন—'কে আছ এমন, আমার কাছে চাইবে? আমি তোমায় সব দিয়ে দেবো!' সেই রব থেকে আমরা কতই-না বিমুখ! তাঁর ক্ষমার স্বরূপ এমনই যে, আমরা অনুতাপ বা অনুশোচনায় বিলম্ব করি; কিন্তু তিনি ক্ষমা করতে বিলম্ব করেন না।

কত আদরে-যতনে আমাদের তৈরি করেছেন আল্লাহ! ধুলোবালি থেকে নিরাপদ রাখতে চোখের ওপর দিয়েছেন স্বয়ংক্রিয় পর্দা, ত্বককে করেছেন মসৃণ। অতিরিক্ত আলোয় যেন কষ্ট না পাই, সেজন্য চোখের ওপর দুই ভ্রু দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন। নাকে যেন ধুলো না ঢোকে, সেজন্য তার ভেতরে নেটের ব্যবস্থা করেছেন ছোটো ছোটো লোম দিয়ে। পায়ের পাতা পুরু করেছেন, যেন পথ চলতে কষ্ট না হয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটানোর জন্য রিজিক হিসেবে পৃথিবীতে দিয়েছেন অসংখ্য নিয়ামত। গাছপালা, তরুলতা দিয়ে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করেছেন আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস চলমান রাখার জন্য। সৌন্দর্যে চোখ জুড়ানোর জন্য প্রকৃতিকে সাজিয়েছেন ফুলে-ফুলে। তাতে মোহনীয় সুবাসের গন্ধ দিয়েছেন। মিষ্টতায় হৃদয় ভরিয়ে দিতে রেণুর মাঝে সৃষ্টি করেছেন মধুর বিন্দু। ফুলের মিলনমেলায় পাঠিয়েছেন রসিক ভ্রমর। অপরূপ দৃশ্যে ভরিয়ে তুলেছেন চারপাশ, যেন সতেজ হৃদয়ে ওঠে 'আলহামদুলিল্লাহ' গুঞ্জন, জাগরিত হয় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি।

কিন্তু কী দুর্ভাগ্য আমাদের! যে রব সদা কাছে টানতে আগ্রহী, আমরা তাঁর থেকেই দূরে পালিয়ে বেড়াই অহর্নিশ। যিনি আমাদের জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, আমরা তাঁর থেকেই মুখ ফিরিয়ে রাখি। শুধু তা-ই নয়; অজ্ঞতা, অবাধ্যতা, হঠকারিতা আর অহংকারের মাধ্যমে চোখের সামনে এমন এক দুর্ভেদ্য পর্দা তৈরি করে ফেলি, যা আল্লাহর নৈকট্যকেই আড়াল করে ফেলে। একপর্যায়ে ভুলেই যাই মহামহিম রবকে; ভুলে যাই সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার অনস্বীকার্য সম্পর্ক। কখনো কখনো স্রষ্টার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসি অথবা তাঁর সমতুল্য ভাবা শুরু করি অন্য কাউকে। এতে অবাধ্যতার পর্দা কেবল পুরুই হতে থাকে। ফলে স্রষ্টার আহ্বান আর আমাদের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না। বিচ্ছিন্ন হয় রবের সঙ্গে বান্দার নিবিড় যোগাযোগ।

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বান্দার চূড়ান্ত সফলতা। আর রবের নৈকট্য অর্জনের জন্য প্রথমেই তাঁর অবাধ্যতা থেকে সরে আসতে হবে। একই সঙ্গে বিরত থাকতে হবে সমস্ত নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড থেকে। তাঁর বিধানসমূহ পালনে হতে হবে অধিকতর যত্নশীল। অতঃপর আনুগত্যের শির নত করে আল্লাহ ও আমাদের মধ্যকার কৃত্রিম পর্দাকে ভেদ করতে হবে।

Scanned by CamScanner

অনুশোচনা ও ইস্তেগফার মেশানো চোখের পানি সেচে এগিয়ে নিতে হবে নৈকট্যের তরণি।

রবের নৈকট্যলাভের পথ

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সফলকাম ব্যক্তিরাই হবেন বিচার দিনে বিশেষ সম্মানের অধিকারী। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদের অভিহিত করেছেন সাবিকুন বা অগ্রগামী বলে। তিনি বলেন—

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ- اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ-

'আর অগ্রগামীরা তো অগ্রগামী-ই। তারাই নৈকট্যলাভকারী।' (সূরা ওয়াকিয়া : ১০-১১)

হাশরের মাঠে যখন মানুষ 'ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি' বলে বিলাপ করতে থাকবে, নিজের আমলনামা দেখে কঠিন পরিণামের ভয়ে বুক চাপড়াবে, পিপাসায় কাতর হয়ে আর্তচিৎকার দেবে পানি পানি বলে, তখন এই সাবিকুন তথা অগ্রগামীরা থাকবেন পরম নিশ্চিন্তে আরশের ছায়াতলে। তাঁদের জন্য প্রস্তুত থাকবে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত, যেখানে তারা মণিমুক্তা খচিত আসনে হেলান দিয়ে বসবেন। সামনে উপবিষ্ট থাকবে ডাগর ডাগর চোখের অধিকারী অপূর্ব মোহনীয় রূপসি হুর! যেন তারা লুকিয়ে রাখা কোনো দুষ্প্রাপ্য মুক্তো। আতিথেয়তার জন্য তাঁদের চারপাশে প্রজাপতির মতো বিচরণ করবে সুশ্রী বালকের দল! সেই স্নিগ্ধ পরিবেশে আকর্ষণীয় পাত্রে তাঁরা পরিবেশন করবে সুমিষ্ট শরাব; যাতে না থাকবে মত্ততা, না আসবে কোনো ঘোর!

জান্নাতিদের জন্য আয়োজন করা হবে এক জাঁকালো মহোৎসব! সেই উদ্‌যাপনে অংশ নেওয়াই হবে মানব জীবনের পরম ও চরম সার্থকতা! অপরদিকে এই মহা আয়োজনে যারা আমন্ত্রিত হবে না, তাদের মতো দুর্ভাগা আর কে আছে! জীবনের সকল পাওয়া যে সেদিনেই পূর্ণ হবে। চক্ষু শীতল হবে, তৃপ্ত হবে তৃষিত হৃদয়। সেদিন সমস্ত পর্দা উঠে যাবে, উবে যাবে সমস্ত উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠা। আকাশ ও জমিনে বইবে শুধুই প্রশান্তির মোলায়েম বাতাস! সেদিন সময় থমকে যাবে, আটকে যাবে চোখের পলক। চারিদিকে বিরাজ করবে মহা মোলাকাতের আমেজ!

Scanned by CamScanner

কারণ, সেদিন যে দেখা দেবেন আমাদের অস্তিত্বের কারিগর, আমাদের একান্ত আপনজন, সর্বোত্তম অভিভাবক, মমতার আধার, অনুগ্রহের উৎস, মহামহিম রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা! বান্দাকে দর্শন দিতে তিনি নিজের পবিত্র চেহারার রওশনকে সেদিন উন্মুক্ত করবেন! যে স্রষ্টাকে কোনোদিন দেখিনি, শুধু অনুভব করেছি হৃদয়ের গহিন তলে! যাঁর অস্তিত্বের ব্যাপারে কখনো কোনো সন্দেহ ঠাঁই দিইনি মনে; বরং শত কুমন্ত্রণা সত্ত্বেও যাঁকে বিশ্বাস করেছি একনিষ্ঠ চিত্তে! যাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের অপেক্ষায় থেকেছি এতকাল! সৃষ্টিলগ্ন থেকে আজতক ভোগ করে চলেছি যাঁর অনুগ্রহ! যিনি কঠিন মুসিবতে যাবতীয় বিপর্যয় থেকে দিয়েছেন পরিত্রাণ, বিচারের কঠিন দিনে যে রব আমাদের মুক্তির একমাত্র সহায়, বিশ্বাসের প্রতিদানে রহমতের পালক মেলে যেই মহান সত্তা আমাদের স্থান দিয়েছেন অনাবিল সুখের ঠিকানা জান্নাতে, সেই অবিনশ্বর প্রভু তাশরিফ আনবেন তাঁর নগণ্য বান্দাদের সামনে!

এ যে মহাসৌভাগ্য! পরম পাওয়া! বান্দার প্রতি স্রষ্টা প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ উপহার! রবের পবিত্র নুরের ঝলকে সেদিন বান্দার পলক থমকে যাবে। একাগ্র মনোযোগে স্রষ্টার পানে তাকিয়ে কেটে যাবে কত শত কাল! দৃষ্টি দিয়েছেন যে রব, পলক মেলে তাঁকেই দেখবে চোখ। এ যে সৃষ্টির চূড়ান্ত সার্থকতা! বর্ণনাতীত সাফল্য! সেদিন মহান আল্লাহ স্বয়ং তাঁর আদরের বান্দাদের আবৃত্তি করে শোনাবেন কুরআনের অমিয় বাণী। আর পরম প্রভুর অকল্পনীয় মধুর ধ্বনিতে সিক্ত হবে মানব হৃদয়!

পরজগতের সেই মহা আনন্দোৎসবে আমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য প্রধান যোগ্যতা হবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন! আর তার জন্য অপরিহার্য পাথেয় হলো—

১. আল্লাহর প্রতি নিখাঁদ ভালোবাসা
২. তাঁর নৈকট্য অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা
৩. তাঁর পথনির্দেশ অনুসরণ এবং
৪. ভালোবাসার প্রমাণস্বরূপ যেকোনো ত্যাগ স্বীকার ও পরীক্ষার জন্য সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি।

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য বান্দাকে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। আর প্রতিটি ধাপেই ভেদ করতে হয় অবাধ্যতার পর্দা। এভাবে ধারাবাহিক চর্চার মধ্য দিয়ে বান্দা আস্তে আস্তে রবের নৈকট্যের দিকে এগিয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

আর রবের সামনে হাজির হওয়ার জন্য নিজেকে করে তোলে অধিকতর প্রস্তুত ও পরিপাটি। সেই ধাপগুলো হলো—

নৈকট্যের সূচনা : স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক চিরন্তন। এই সম্পর্ক কখনোই ছিন্ন হওয়ার নয়। তিনিই আমাদের পরম আদরে সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, শত অবাধ্যতা সত্ত্বেও প্রতি মুহূর্তে ঢেলে দিচ্ছেন অনুগ্রহের বারিধারা। তিনি বলেন—

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ-

'আর আমার রহমত সকল কিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত।' (সূরা আ'রাফ : ১৫৬)

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক একপাক্ষিক, যেখানে মনিব শুধু দিয়েই যাচ্ছেন আর বান্দা অবিরাম ভোগে মত্ত। কিন্তু এটি কারও অজানা নয় যে, একপাক্ষিক আগ্রহে সম্পর্ক কখনোই জমে ওঠে না। এতে মনিবের সন্তুষ্টি কিংবা নৈকট্য অর্জন করা মোটেই সম্ভব নয়। শোকরহীন এমন একতরফা ভোগকে বলে অকৃতজ্ঞতা। আর অকৃতজ্ঞতার পেয়ালা হাতে মালিকের গভীর সম্পর্কের আবেহায়াত পান কী করে সম্ভব! সুতরাং ভালোবাসা হতে হবে উভয়পাক্ষিক। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন—

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَه-

'আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, তারাও আল্লাহকে ভালোবাসে।' (সূরা মায়েদা : ৫৪)

বান্দা যখন আল্লাহর রঙে রঙিন হতে চায়, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হয় এবং প্রস্তুত থাকে যাবতীয় ত্যাগ স্বীকারের জন্য, তখন পরম করুণাময় রব এই ভালোবাসার স্বীকৃতস্বরূপ নিজের নৈকট্যের দুয়ার খুলে দেন।

আল্লাহর নৈকট্যের সূচনা হয় তাঁর প্রতি ঈমান আনার মাধ্যমে। এই ঈমান বা বিশ্বাস তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রথমে অন্তর থেকে বিশ্বাস করতে হয় আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি যাবতীয় অংশীদারত্ব থেকে মুক্ত একক ও সয়ম্ভূ সত্তা। ভালো-মন্দের মালিকও একমাত্র তিনিই। তিনিই আমাদের প্রতিপালন করেন, রিজিক বণ্টন করেন, বিধান দেওয়ার কর্তৃত্বও তাঁর হাতে। সবশেষে আমরা সবাই তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করব। মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও মনোনীত রাসূল। এই বিশ্বাসসমূহের মৌখিক ঘোষণা এবং সর্বশেষ তা কর্মে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঈমানের শর্ত পূরণ হয়।

Scanned by CamScanner

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে আমলে পরিণত করার জন্য রাসূল ﷺ-এর দেখানো পথে হাঁটতে হবে। তাঁকে অনুসরণ করতে হবে প্রতিটি পদক্ষেপে। তিনি যেভাবে যা কিছু করেছেন, করতে বলেছেন, সেভাবেই তা সম্পন্ন করতে হবে। এটাই আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার নবির অনুসরণ করো; তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেবেন।’ (সূরা আলে ইমরান : ৩১)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এবং আনুগত্যের ঘোষণাদানের মধ্য দিয়েই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রথম শর্ত পূরণ হয়। এরপর শুরু হয় মূল যাত্রা। এই যাত্রায় আস্তে আস্তে নিজেকে ভাঙতে হয় এবং নতুন করে গড়তে হয় রবের দেওয়া ছাঁচে। বাধ্য হয়ে কিংবা লোকদেখানোর জন্য নয়, ভাঙা-গড়ার এই প্রক্রিয়া চলে সহজাত ভঙ্গিমায়। সৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অগ্রসর হচ্ছে তার স্রষ্টার দিকে—রবের জন্য এর থেকে আনন্দের আর কী হতে পারে!

নৈকট্যের অগ্রযাত্রা : আল্লাহর নৈকট্যলাভের যাত্রা শুরু হয় তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে যথাযথ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে। কেননা, তিনি আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি করে। মানব সৃষ্টির সূচনাকালে তিনি ফেরেশতাদের বলেছিলেন—

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً-

‘স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই।’ (সূরা বাকারা : ৩০)

মালিকের নির্দেশের বাইরে প্রতিনিধির নিজস্ব বলতে কিছুই থাকে না। তার প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ধারিত হয় মালিকের নির্দেশনার আলোকে। তাই প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের দায়িত্ব হলো—আল্লাহর হুকুম-আহকাম পুরোপুরি মেনে চলা এবং তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ তায়ালার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি হুকুম হলো—মানুষকে ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া

Scanned by CamScanner

এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করা। সুতরাং, এই দায়িত্ব পালন করাও প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিনিধিকে প্রথমেই মালিকের আদেশ-নিষেধসমূহ পরিপূর্ণভাবে জেনে নেওয়া আবশ্যক। এরপরই লেগে পড়তে হয় তা বাস্তবায়নের একান্ত প্রচেষ্টায়। মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনামা হলো পবিত্র কুরআন। এই মহাগ্রন্থেই রয়েছে মানুষের সমস্ত প্রয়োজন ও সংকট মোকাবিলার কার্যকর রোডম্যাপ, সন্নিবেশিত হয়েছে সর্বোত্তম উপায়ে জীবন পরিচালনার চূড়ান্ত মূলনীতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ-

'এটি আল্লাহর কিতাব, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। এটি মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শক।' (সূরা বাকারা : ০২)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ-

'কুরআন নাজিল করা হয়েছে রমজান মাসে, যা মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন, যা সত্য-সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়।' (সূরা বাকারা : ১৮৫)

সুতরাং, প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের কাজ হবে কুরআন-হাদিস ও ইসলামি শরিয়াহর বিধিবিধান সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানার্জন এবং তা বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করা। এই সকল তৎপরতার মধ্য দিয়েই আরম্ভ হবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের দিকে আমাদের আনুষ্ঠানিক যাত্রা।

নৈকট্যের শর্ত পূরণ : আমরা ঈমান আনার মাধ্যমে রবের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হই। সেই চুক্তির আওতায় নিজের জান ও মাল তাঁর নিকট সমর্পণ করি জান্নাতের বিনিময়ে। আল্লাহর সাথে এই কৃত চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন করা তাঁর নৈকট্যলাভের অন্যতম শর্ত। মহান আল্লাহর ঘোষণায়—

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ-

Scanned by CamScanner

'প্রকৃত ব্যাপার হলো—আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং (যুদ্ধের ময়দানে) মারে ও মরে।' (সূরা তাওবা : ১১১)

আমরা যারা ঈমান এনেছি, তারা প্রত্যেকেই এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি। এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন এবং বিনিময়ে পরকালে প্রস্তুত রেখেছেন সুশোভিত জান্নাতের বাগিচা। তবে আল্লাহ আমাদের থেকে ক্রয়কৃত জীবন ও সম্পদ আমাদের কাছেই আমানত রেখেছেন। শর্ত কেবল একটাই; যেন তাঁর নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যেই জীবনকে ভোগ করি, সম্পদকে ব্যয় করি তাঁর দ্বীনের স্বার্থে। এই চুক্তি যথাযথভাবে মেনে চললেই কেবল রবের নৈকট্য অর্জন সম্ভব হবে।

নৈকট্যের সুধা লাভ : যখন বান্দার সকল কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, প্রফুল্লচিত্তে, দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে যখন সে ঘোষণা দেয়—

اِنَّ صَلَاتِیۡ وَنُسُكِیۡ وَمَحۡیَایَ وَمَمَاتِیۡ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ-

'আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ—সবই সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্য।' (সূরা আনআম : ১৬২)

ঠিক তখনই সে পরম করুণাময় রবের নৈকট্যের সুধা লাভ করে। পান করে রবের রেজামন্দির আবেহায়াত। এই পর্যায়ে বান্দা ও রবের মাঝে কোনো অবাধ্যতার পর্দা থাকে না, থাকে না কোনো অভিমান-অনুযোগ। ফলে বান্দা হয়ে যায় রবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু; যেমন বন্ধু হয়েছিলেন প্রিয় পয়গম্বর সাইয়্যিদুনা ইবরাহিম (আ.)।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন মানুষের জন্য কঠিন কিছু নয়। কেননা, তিনি তো অন্তর্যামী! মানুষের মনের যাবতীয় খবর সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তিনি মানুষের কর্মসমূহ মূল্যায়ন করেন তাদের নিয়্যাত ও আন্তরিকতার ওপর ভিত্তি করে। বাহ্যিক আবরণ তাঁর কাছে গৌণ। রাসূল ﷺ বলেন—

'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক চেহারা ও সম্পদ দেখেন না; দেখেন তোমাদের অন্তর ও কর্মকাণ্ড।' (মুসলিম : ২৫৬৪)

আল্লাহ দুর্বল বান্দার জন্য সহজ করতে চান; দূর করতে চান সব রকম জটিলতা। তিনি বান্দাকে ক্ষমা করতে ভালোবাসেন; অপছন্দ করেন শাস্তি

Scanned by CamScanner

বা আজাবে নিপতিত করতে। প্রার্থনা করলে তিনি খুশি হন; না চাইলে হন রুষ্ট। মনের খবর জানার ক্ষেত্রে তিনি বান্দার অতি সন্নিকটে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ-

'আমি তার গলদেশের শিরা অপেক্ষাও অধিকতর নিকটবর্তী।' (সূরা কাফ : ১৬)

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ-

'(হে নবি!) আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন তাদের বলুন—আমি এত নিকটবর্তী যে, কেউ যখন আমাকে ডাকে, তখন তার ডাক শুনি। সুতরাং তারাও আমার কথা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করুক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে আসে।' (সূরা বাকারা : ১৮৬)

আমরা যদি আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হই, নিয়্যাতকে পরিশুদ্ধ করি, দুই হাত বাড়িয়ে দিই রবের নৈকট্যের দিকে, দ্বীনকে পরিণত করি সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে, তাহলে আমাদের প্রতি তিনি রহমতের বারিধারা বর্ষণ করবেন। তাঁর দিকে এক হাত অগ্রসর হলে তিনি দুই হাত এগিয়ে আসবেন আমাদের দিকে। হাদিসে কুদসিতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন—

'যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত এগিয়ে যাই। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে পায়ে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে যাই দৌড়ে দৌড়ে।' (মুসলিম : ৬৭২৬)

এই হাদিস সম্পর্কে ইবনে রজব হাম্বলি (রহ.) বলেন—

'মানুষ! তুমি যদি দুনিয়ার কোনো বাদশাহের দরজায় যাও, হয়তো সে তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে না। ফিরেও তাকাবে না তোমার দিকে; এমনকী তোমাকে তার কাছে ভিড়তেই দেবে না। কিন্তু সকল বাদশাহের বাদশাহ বলছেন—"যে ব্যক্তি আমার

Scanned by CamScanner

দিকে হেঁটে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে দৌড়ে যাই।" তবুও তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য কিছুর পেছনে দৌড়াচ্ছ! তুমি সবচেয়ে জঘন্যভাবে প্রতারিত হচ্ছ এবং পথ হারিয়ে দিশাহীন হয়ে পড়ছ।'

মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন—

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ -

'হে মানুষ! কোন জিনিস তোমাকে তোমার রবের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে?' (সূরা ইনফিতার : ৬)

মানুষ যখন আল্লাহর নৈকট্যের সুধা পান করে, তখন আর কোনো হতাশা, দুঃখ, ক্লেশ বা অপ্রাপ্তির বেদনা তাকে স্পর্শ করতে পারে না, পথভ্রষ্ট করতে পারে না দুনিয়ার কোনো মোহ। নিজের সমস্ত প্রচেষ্টা, অর্জন সে তখন সঁপে দেয় মহান প্রভুর উদ্দেশে। নিজের ক্যারিয়ারকে পরিচালিত করে আল্লাহ নির্দেশিত পথে, সমস্ত সম্পদ-মেধা-শ্রম ব্যয় করে উম্মাহর স্বার্থে। ক্ষমতা-অর্থ-বৈভব যত বাড়তে থাকে, তত বেশি সে নিজেকে নিয়োজিত করে মানবতার কল্যাণে। স্রষ্টার আনুগত্য আর সৃষ্টির সেবাই হয় তাঁর প্রধান কাজ। তাঁর হাত ও মুখ দ্বারা নিশ্চিত হয় অন্য সকল মানুষের নিরাপত্তা।

সমাজে যখন আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন সমাজ হয়ে যায় শান্তির বসুধা। হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ভুলে মানুষ তখন পরস্পরের কল্যাণ কামনায় রত হয়। ব্যক্তিস্বার্থ উপেক্ষা করে নিজেকে উৎসর্গ করে বৃহত্তর উম্মাহর তরে। আল্লাহর দেওয়া যোগ্যতা ও সক্ষমতা ব্যয় করে তাঁরই সৃষ্টির মঙ্গলার্থে। এভাবে মানুষ ক্রমশ তার অধিকার ফিরে পায়; দূরীভূত হয় অন্যায়-অত্যাচার আর দুর্নীতির দূষিত সংস্কৃতি। সমাজকে বর্ণিল করে তোলে শান্তি ও সমৃদ্ধির জান্নাতি আমেজ।

আল্লাহর নৈকট্যলাভে সহায়ক উপাদান

এমন কিছু কাজ রয়েছে, যেগুলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকে সহজ করে তোলে। অন্য কথায়, ব্যক্তিকে প্রভুর নৈকট্যের জন্য আস্তে আস্তে প্রস্তুত করে তোলে। এগুলোকে রবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রাথমিক প্রস্তুতিও বলা চলে। নিজের দৈনন্দিন রুটিনে এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ যুক্ত করে যথাযথভাবে

Scanned by CamScanner

চর্চা করলে ব্যক্তি নিজে থেকেই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কাজগুলো হলো—

বিনয়াবনত সিজদা : সিজদা হলো সুমহান সত্তা 'মহান' আল্লাহর সামনে সর্বাধিক বিনীতভাবে নিজেকে সমর্পণ। গোটা সৃষ্টিজগৎ অনাদিকাল থেকে আল্লাহর সিজদায় অবনত। সিজদায় যখন লুটিয়ে পড়ি, তখন আমরা দেহের সবচেয়ে মর্যাদাবান ও সুউচ্চ অংশ 'মস্তক' ভূলুণ্ঠিত করে দিই। নিজেকে এর চেয়ে বেশি আর ছোটো করা যায় না। আমাদের অবস্থা তখন اَلْاَسْفَلْ তথা চূড়ান্ত অবনমিত, আর রব তখন اَلْاَعْلٰى তথা সর্বোচ্চ মহান ও মর্যাদাবান। তাইতো আমরা তাঁর সম্মান ও বড়োত্বের ঘোষণা দিয়ে বলে উঠি—

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى-

'অতি পবিত্র আমার রব, যিনি সুউচ্চ।'

নিজেকে ছোটো কিংবা তুচ্ছ হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য এর চেয়ে উৎকৃষ্ট তরিকা আর হতে পারে না। এজন্যই সিজদাবনত এই দৃশ্য অবলোকন করতে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন, বান্দাকে কাছে টেনে নেন পরম মমতায়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সিজদাবনত মস্তকে তাঁর নৈকট্য প্রার্থনার আহ্বান জানিয়েছেন পবিত্র কুরআনে—

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ-

'তুমি সিজদা করো এবং নৈকট্য অর্জন করো।' (সূরা আলাক : ১৯)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> 'বান্দা আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হয়, যখন সে সিজদায় অবনত হয়। অতএব, তোমরা ওই অবস্থায় অধিক পরিমাণে দুআ করতে থাকো।' (মুসলিম : ৪৮২)

কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানার্জন : মানুষ তার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে নিজ নিজ চিন্তার আলোকে। এই চিন্তা গঠিত হয় তার অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। এই জ্ঞানার্জনের অন্যতম প্রধান উপায় হলো—নিয়মিত অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়। মানুষকে বাস্তব জীবনে সবচেয়ে গভীরভাবে প্রভাবিত করে—তার অর্জিত জ্ঞান। তাই সঠিকভাবে জীবনযাপনের জন্য শুদ্ধ জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। মানুষ যখন সঠিকভাবে জানে—সে কে, কোথা থেকে তার আগমন, কীভাবে তার সৃষ্টি, কী তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য, কোথায় গন্তব্য,

Scanned by CamScanner

প্রকৃত দায়িত্বই-বা কী, তখন সে জীবনকে সুন্দরভাবে সাজাতে সচেষ্ট হয়। নিবেদিত হয় জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনে।

বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রধান উৎস হলো কুরআন ও হাদিস। এখানেই রয়েছে মানুষের জীবন পরিচালনার সর্বোত্তম নির্দেশিকা। ফলে জীবনকে সঠিক কক্ষপথে রাখতে কুরআন-হাদিসের জ্ঞান অর্জনের বিকল্প নেই। ইসলামের এই প্রধান দুই উৎস অধ্যয়নের মাধ্যমেই একজন মুমিন জানতে পারে—কে তাকে সৃষ্টি করেছেন? কেন সৃষ্টি করেছেন? তার চূড়ান্ত গন্তব্য কোথায় এবং কীভাবে সেখানে যেতে হবে? ফলে কুরআন-হাদিসে বিজ্ঞ মুমিন বান্দারাই কেবল জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হন। আর এই কারণেই তারা আল্লাহকে ভালোবাসেন সবচেয়ে বেশি; তাঁর শাস্তিকে ভয় করেন এবং হুকুম-আহকামের ব্যাপারে থাকেন সদা সতর্ক। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَٰٓؤُا-

'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে।' (সূরা ফাতির : ২৮)

এই ভয় ও ভালোবাসার যৌথ শক্তিতে কুরআন-হাদিসের জ্ঞানে আলোকিত মুমিনরা সক্ষম হয় শয়তানের ধোঁকাকে ঠেকিয়ে দিতে। তাদের অন্তর হয় সজীব ও সতেজ, হৃদয় থাকে রবের প্রেমে মশগুল। অন্তরের এই নিষ্কলুষ চরিত্রই তাদের মহান রবের দিকে ধাবিত করে।

মালেক ইবনে দিনার (রহ.) বলেছেন—

'নিশ্চয়ই কুরআন হলো হৃদয়ের প্রাণ, যেমন মাটির প্রাণ বৃষ্টি।'

নিয়মিত কুরআন-হাদিস অধ্যয়ন স্মরণ করিয়ে দেবে আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের কথা। আমরা অনেকেই শুধু কুরআন তিলাওয়াত করি, কিন্তু বোঝার চেষ্টা করি না মোটেই। এতে কিছু সওয়াব হয় ঠিক, কিন্তু কুরআনের প্রকৃত হক আদায় হয় না। অথচ কুরআন পাঠের অর্থ হলো—আল্লাহর সাথে কথা বলা। যদি বোঝার চেষ্টাই না করি, তাহলে কথোপকথনের মর্ম উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর বর্ণনায় বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

'নিশ্চয়ই হৃদয়ে মরিচা ধরে, যেভাবে পানি লাগলে লোহায় মরিচা ধরে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো—"হে আল্লাহর রাসূল!

Scanned by CamScanner

এ মরিচা দূর করার উপায় কী?" তিনি বললেন—"বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ এবং কুরআন তিলাওয়াত।"'
(বায়হাকি, শুআবুল ঈমান : ১৮৫৯)

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে তাই নিয়মিত কুরআন-হাদিস অধ্যয়ন করা একান্ত কর্তব্য। পাশাপাশি ইসলাম বুঝতে সহায়ক সাহিত্য পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলাও জরুরি।

ফরজ ইবাদতসমূহ পালন : আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার স্বীকারোক্তির পর বান্দার প্রথম কর্তব্য হলো—তাঁর নির্ধারিত ফরজ ইবাদতসমূহ যথাযথভাবে পালন করা। ফরজ ইবাদত উপেক্ষা করে কখনোই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন সম্ভব তো নয়; বরং এর মাধ্যমে বান্দা ও রবের মাঝে সৃষ্টি হয় যোজন যোজন দূরত্ব। বান্দার অবাধ্যতার পর্দায় আড়াল হয়ে যায় রবের অপার অনুগ্রহ। 'ফরজ' বান্দার জন্য আল্লাহ নির্ধারিত অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। ফলে এই কর্তব্যকে এড়িয়ে চলার অর্থ আল্লাহর অপরিহার্য আদেশকেই উপেক্ষা করা, অবাধ্যতার আবর্জনায় নিজেকে কর্দমাক্ত করা। আর এটা তো সুবিদিত যে, অবাধ্যতার কালিমা গায়ে মেখে কখনো মনিবের নৈকট্য অর্জন করা যায় না।

অপরদিকে আবশ্যক ইবাদতগুলো যথাযথভাবে আদায়ের মাধ্যমে বান্দা অবচেতন মনেই এমন সব গুণাবলি অর্জন করে, যা তাকে ধাবিত করে রবের রেজামন্দির দিকে। কেননা, প্রতিটি ফরজ ইবাদতেরই রয়েছে আলাদা আলাদা গুরুত্ব ও হাকিকত। উদাহরণস্বরূপ, সালাত অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে আমাদের অন্তরকে পবিত্র রাখে, তৈরি করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের অবারিত সুযোগ। এর মধ্য দিয়ে রবের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ দুই-ই বৃদ্ধি পায়। নামাজের প্রতিটি রাকাতে আমরা উচ্চারণ করি রবের একত্ববাদ, মহত্ত্ব ও পবিত্রতার বাণী। আনুগত্যের শির নত করে দিই তাঁর কদম তলে। বারবার ঘোষণা করি—'আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি, তোমার কাছেই সাহায্য চাই।' আমরা যখন একাগ্রচিত্তে এই দুআ করতে থাকি, মহান আল্লাহ তখন আর সাড়া না দিয়ে পারেন না। তবে কখনো তিনি বান্দার প্রার্থনার ফল তাৎক্ষণিক দান করেন, আবার কখনো তা জমিয়ে রাখেন আখিরাতের জন্য।

অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলোর অন্যতম 'সাওম' আমাদের মাঝে সৃষ্টি করে তাকওয়া ও আত্মসংযম। এটি আমাদের চোখ, কান ও জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ

Scanned by CamScanner

করতে শেখায়। ঢালস্বরূপ ভূমিকা রাখে সকল পাপের বিরুদ্ধে। আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করে গলায় লাগাম পরিয়ে নফসকে কঠোর শাসন করতে, মানুষের প্রতি উদার ও মহানুভব হতে। এভাবে রবের হুকুমের ছাঁচে ফেলে সাওম আমাদের প্রস্তুত করে; নিয়ে যায় রবের একান্ত সান্নিধ্যে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত হলো জাকাত। লোভের বিষাক্ত রস নিংড়ে এটি আমাদের অন্তরকে বিশুদ্ধ করে। আল্লাহ দয়া করে আমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন, সেখানে অন্য বান্দাদের জন্যও রয়েছে নির্দিষ্ট হক বা অধিকার। এই অংশটুকু আমাদের নয়; পুরোপুরি অন্যের। অপরকে অধিকার বঞ্চিত করে তা ভোগ করা আমাদের জন্য সম্পূর্ণ হারাম। জাকাত প্রদানের মাধ্যমে অপর বান্দাকে এই প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়ার ফলে রবের সাথে গড়ে ওঠে মুমিনের ঘনিষ্ঠ মিতালি। নিশ্চিত হয় আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের পবিত্রতা। একই সঙ্গে মালিক খুশি হয়ে যান তাঁর বান্দার প্রতি। ফলে মালিকের নৈকট্য অর্জন নিছক সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

একইভাবে হজ হলো চেতনাগতভাবে রবের দিকে ফেরার এক আনুষ্ঠানিক ভ্রমণ। দুনিয়ার দায় মিটিয়ে, সমস্ত ব্যস্ততা থেকে মুখ ফিরিয়ে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান রবের দিকে যাত্রা! বান্দার গায়ে তখন কবরের বসন, মুখে লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক ধ্বনির তাওহিদি সাক্ষ্য। এ যেন মরণের আগেই মৃত্যুর মহড়া!

হজ আমাদের অন্তরে দুনিয়ার মোহ হ্রাস করে একত্ববাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। অন্তরে জন্ম নেওয়া বর্ণবাদকে মুছে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে গেঁথে ফেলে একটি সুতোয়। সমূলে ধ্বংস করে হিংসা, বিদ্বেষ কিংবা জাতিগত ভেদাভেদ। এ বাৎসরিক মহাসম্মেলনে অংশ নিয়ে সারা বিশ্বের মুসলিম জনতা একযোগে ঘোষণা করে প্রতিপালকের বড়োত্ব ও মর্যাদা। সবার পরিচয় তখন এক ও অভিন্ন; সকলেই সেখানে এক আল্লাহর নগণ্য বান্দা! কেবল এই চিত্রই মানুষের মন থেকে যাবতীয় হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত করার জন্য যথেষ্ট। এজন্য ফরজ ইবাদতসমূহ অত্যন্ত গুরুত্ব ও যত্নের সাথে আমাদের যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। কেননা, এর মাধ্যমেই ত্বরান্বিত হবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন।

নফল ইবাদত আদায় : মৌলিক ইবাদতসমূহ আদায় করতে আমরা বাধ্য; কিন্তু ভালোবাসার দাবিই হলো বাধ্যবাধকতার ঊর্ধ্বে উঠে অতিরিক্ত কিছু করা। এতে সম্পর্ক গভীর হয়, বাড়ে পারস্পরিক বোঝাপড়ার রসায়ন।

Scanned by CamScanner

নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ

কিয়ামুল লাইল : নফল ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো—কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদের সালাত। এই সালাত আল্লাহর সাথে বান্দার ভালোবাসাকে অধিক হারে বৃদ্ধি করে, সুদৃঢ় করে সৃষ্টি ও স্রষ্টার অকৃত্রিম সম্পর্ক। কেননা, এই সালাত আদায় করতে হলে বান্দাকে নফসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিজয়ী হতে হয়, ত্যাগ করতে হয় আরামদায়ক ও প্রশান্তিময় ঘুম। বান্দা যখন আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে তার প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে যায়, তখন প্রভুর চেয়ে খুশি আর কেউ হন না।

তাহাজ্জুদ বান্দাকে আল্লাহর রেজামন্দির জন্য প্রস্তুত করে। নবুয়তের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত করতে বিশ্বনবি ﷺ-কে রাতের বেশিরভাগ অংশে তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি বলেন—

يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ- قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا- نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا-
اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا- اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا-

'হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী! রাতের বেলা নামাজে রত থাকো কিছু সময় ছাড়া। অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কিছু কম করো অথবা তার ওপর কিছু বাড়িয়ে নাও। আর কুরআন থেমে থেমে পাঠ করো। আমি অতি শীঘ্রই তোমার ওপর একটি গুরুভার বাণী নাজিল করব।' (সূরা মুজ্জাম্মিল : ০১-০৫)

এরপর রাসূল ﷺ যখন নবুয়তের দায়িত্ব পালনে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন, তখন আল্লাহ তাহাজ্জুদকে নফলে পরিণত করলেন। আর প্রিয় পয়গম্বরের জন্য ঘোষণা করলেন সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান। তিনি বলেন—

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا-

'আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ো। এটি তোমার জন্য নফল। অচিরেই তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।' (সূরা বনি ইসরাইল : ৭৯)

Scanned by CamScanner

তাহাজ্জুদ আদায় শুধু নবিদের বৈশিষ্ট্য-ই নয়; এটি মুমিনদেরও একটি বিশেষ গুণ। আল্লাহ তায়ালা সফল মুমিনদের দিনলিপি বর্ণনা করে বলেন—

> كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ- وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ-
>
> 'রাতের বেলা তাঁরা কমই ঘুমাত। তাঁরা ক্ষমাপ্রার্থনা করত রাতের শেষ প্রহরে।' (সূরা জারিয়াত : ১৭-১৮)

বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

> 'মহান আল্লাহ প্রতিরাতের শেষ প্রহরে প্রথম আসমানে নেমে আসেন। আর বান্দাকে ডেকে ডেকে বলতে থাকেন—"কে আছ এমন, আমার কাছে চাইবে; আমি তোমার চাওয়া পূরণ করব। কে আছ এমন, আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে; আমি তোমায় ক্ষমা করে দেবো।"' (বুখারি : ১১৪৫)

মহান মনিব যখন সপ্তম আকাশ ছেড়ে নেমে আসেন ধরণির সন্নিকটে, পৃথিবীর দুয়ারে কড়া নেড়ে বান্দাকে আহ্বান করেন আদরের স্বরে, রবের প্রেমে মশগুল বান্দা তখন কীভাবে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে? প্রভুর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে কী করে আচ্ছন্ন থাকতে পারে গভীর নিদ্রায়? আরামের বিছানা যে তার কাছে মনে হয় বিরহের আগুন। ফলে রাতের নীরবতা ভেঙে উঠে পড়ে সে। মনের আগুনকে শান্ত করে অজুর সিক্ত পানি দিয়ে। অতঃপর দাঁড়িয়ে যায় প্রভুর সাথে শেষ রাতের মোলাকাতে।

প্রবৃত্তি তো চায় শেষ রাতে বিছানায় আরাম করতে। বান্দা যখন সেই কামনাকে তুচ্ছ করে হাজির হয় রবের সামনে, তখন রব তার জন্য নৈকট্যের দুয়ার খুলে দিতে কার্পণ্য করেন না। তার জন্য প্রস্তুত করেন চির শান্তির নীড় জান্নাত। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'রাতে উঠে নামাজে দাঁড়িয়ে যাও, যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। তাহলে তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'
> (মুসনাদে আহমদ : ৪৫১)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

> 'সেই ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তায়ালা রহম করুন, যে রাতের বেলায় জেগে উঠে সালাত পড়ে এবং প্রিয়তমা স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয়।

Scanned by CamScanner

সে জেগে উঠতে গড়িমসি করলে মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়, যাতে সজাগ হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ সেই মহিলার প্রতিও রহম করুন, যে প্রথমে জেগে উঠে সালাত আদায় করে আর জাগিয়ে তোলে প্রিয়তম স্বামীকে। স্বামী জেগে উঠতে গড়িমসি করলে মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়, যাতে সে জেগে ওঠে।' (আবু দাউদ : ১৩০৮)

কুরআন তিলাওয়াত : কুরআন তিলাওয়াত হলো আল্লাহর সাথে বান্দার কথোপকথন, তাঁর সঙ্গে নৈকট্য বৃদ্ধির অন্যতম কার্যকর উপায়। এ সুমহান বাণী তিনি পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন মানবজাতির হিদায়াতের উদ্দেশ্যে। এ কুরআন বান্দা ও রবের মধ্যকার সম্পর্কের সেতুবন্ধন। ফলে অর্থ অনুধাবন করে কুরআন তিলাওয়াত করলে মনে হবে—স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই আপনার সাথে কথা বলছেন। আবার কখনো মনে হবে—এতে আগে থেকেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে আপনার মনের সকল চাহিদা, আকুতি ও প্রার্থনা। আপনি তিলাওয়াত করছেন আর মনের অজান্তে প্রভুকে শুনিয়ে যাচ্ছেন নিজের প্রয়োজনের সকল ফিরিস্তি। কখনো মনে হবে—ঐতিহাসিক সব ঘটনা পরিক্রমায় হারিয়ে যাচ্ছেন। কখনো-বা মনে হবে—হাবুডুবু খাচ্ছেন তথ্য-উপাত্তের অথই সাগরে।

জীবনবোধ, মোটিভেশন, উপদেশমালা, আইনি বিধিবিধান, প্রকৃতির অপরূপ বর্ণনা; কী নেই এতে! এ যেন মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়; যা আবৃত্তি করলে হৃদয় প্রশান্ত হয়, জেগে ওঠে ঘুমন্ত বিবেক। আবেগের দুয়ারে লাগে এক জ্যোতির্ময় ছোঁয়া। তাইতো রাসূল ﷺ কুরআন তিলাওয়াতকে আখ্যা দিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদত হিসেবে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।' (আবু দাউদ : ১৪৫২)

অন্যত্র এসেছে—

'তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো। কেননা, কিয়ামতের দিন কুরআন তাঁর পাঠকের জন্য সুপারিশ করবে।' (মুসলিম : ৮০৪)

Scanned by CamScanner

অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে—

> 'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করবে, তার নেকি হবে দশগুণ হিসাবে। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মিম মিলে একটি হরফ; বরং আলিফ একটি, লাম একটি এবং মিম আরেকটি হরফ।' (তিরমিজি : ২৯১০)

নফল রোজা : আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে নফল রোজা খুবই ফলপ্রসূ একটি উপায়। রোজার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হলো—এটি নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে দারুণ কার্যকর এক অস্ত্র। এ ধরনের অতিরিক্ত ইবাদত নফসের খায়েশকে দলিত করে হৃদয়ে জাগ্রত করে সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণ। একই সঙ্গে রোজা বান্দাকে নৈতিক পরিশোধনের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালার অধিক নিকটবর্তী করে তোলে। এজন্য রাসূল ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় সপ্তাহের প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার এবং মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে সিয়াম পালন করতেন। আমরাও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নবিজির অনুসরণে এই দিনগুলোতে নফল রোজা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি।

দান-সাদাকা : আল্লাহ আমাদের যে রিজিক দিয়েছেন, সেখান থেকে অন্য ভাইয়ের জন্য খরচ করা বদান্যতার পরিচায়ক। এ ধরনের দান-সাদাকার মাধ্যমে অপরের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়, সুদৃঢ় হয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। আল্লাহর সম্পদ দিয়ে তাঁরই সৃষ্টির সেবা করার সুযোগ তৈরি হয় এর মাধ্যমে। আর যে ব্যক্তি সৃষ্টির সেবায় সচেষ্ট হয়, মহান স্রষ্টা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন সব থেকে বেশি। আমরা যা ভোগ করি, তা কোনো একসময় নিঃশেষে ক্ষয় হয়ে যায়। কিন্তু যা দান করি, তা মূলত আমাদের আমলনামাতেই গচ্ছিত থাকে, আমাদের জন্য বয়ে আনে চিরকালীন কল্যাণ।

রাসূল ﷺ একবার একটা ভেড়া কুরবানি করে গোশত বিতরণ করলেন। বিতরণ শেষে তিনি উম্মুল মুমিনিনকে জিজ্ঞেস করলেন—

> 'ঘরে কিছু বাকি আছে কি?' আম্মাজান জবাব দিলেন—'ঘাড়ের গোশত ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।' রাসূল ﷺ বললেন—'বরং সবকিছুই আছে (আমলনামায়), শুধু ঘাড়ের অংশটুকু ব্যতীত।' (তিরমিজি)

দান অনেকটা লাইফটাইম ব্যাবসার মতো। দুনিয়ায় সামান্য বিনিয়োগই পরকালে ফিরে আসবে শতগুণ মুনাফাসমেত। এজন্যই আলি (রা.) বলেছেন—

> 'আল্লাহর সাথে ব্যাবসা করো, অবশ্যই তুমি লাভবান হবে।'

Scanned by CamScanner

একই কথা ধ্বনিত হয়েছে পবিত্র কুরআনে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ-

'যারা আল্লাহর পথে নিজের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো, যা উৎপন্ন করে সাতটি শিষ। প্রতিটি শীর্ষে রয়েছে শত শস্যদানা। আর আল্লাহ যাকে চান, তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।' (সূরা বাকারা : ২৬১)

এজন্য মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার আগেই সাধ্যমতো দান অব্যাহত রাখা উচিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের যা কিছু ধন-সম্পদ দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করো সেই দিনটি আসার আগে, যেদিন কোনো কেনাবেচা চলবে না, বন্ধুত্ব কাজে লাগবে না এবং কারও কোনো সুপারিশও কাজে আসবে না।' (সূরা বাকারা : ২৫৪)

সাদাকার অর্থ-সম্পদ দেওয়া উচিত গরিব-দুঃখী, ফকির-মিসকিন, কন্যাদায়গ্রস্ত, ঋণ ও বিপদগ্রস্ত, ইয়াতিম অথবা অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে। পাশাপাশি ইসলাম ও মানবসেবায় নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এবং নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কাজেও ব্যয় করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নিজ আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে যারা অভাবী, তারা অন্য সাহায্যপ্রার্থীদের তুলনায় অগ্রাধিকার পাবে।

জিকির ও দুআ : আমাদের সমস্ত অবাধ্যতা আল্লাহকে ভুলে থাকারই অনিবার্য প্রতিফল। অন্তর যখন আল্লাহর কথা ভুলে যায়, তখন সেটা পরিণত হয় শয়তানের অভয়ারণ্যে। অপরদিকে যে অন্তরে আল্লাহর স্মরণ সদা বহমান, সে অন্তর থাকে সতেজ ও নির্মল। সেখানে থাকে না কোনো হতাশার অমানিশা, থাকে না অপ্রাপ্তির বেদনা। পাঁজরজুড়ে শুধু প্রবাহিত হয় শান্তির কলতান। জিকিরই অন্তরে বয়ে আনে এই অনাবিল সাকিনাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন—

Scanned by CamScanner

اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوۡبُهُمۡ بِذِكۡرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكۡرِ اللّٰهِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ -

'এরা সেই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর জিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখ, কেবল আল্লাহর জিকিরই সেই জিনিস—যা দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়।' (সূরা রা'দ : ২৮)

মুমিনের ক্বলব মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর জিকির থেকে বিমুখ হয় না। তাদের অন্তরে সদা জাগ্রত থাকে আল্লাহু আকবার ধ্বনি। হৃদয়ে নিয়ত জারি থাকে রবের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে তারা সর্বাবস্থায় সর্বোচ্চ তৎপর। যে অন্তর মনিবের স্মরণে এতটা ব্যতিব্যস্ত, দয়াময় রব কী করে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারেন! এমন একনিষ্ঠ গোলামকে ভালো না বেসে কীভাবে থাকবেন তিনি!

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করছেন—

فَاذۡكُرُوۡنِیۡۤ اَذۡكُرۡكُمۡ -

'আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব।' (সূরা বাকারা : ১৫২)

এজন্য রাসূল ﷺ আমাদের জিহ্বাকে সর্বক্ষণ আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। জিকিরের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন—

'যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে, আর যে ব্যক্তি করে না, তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের মতো।' (বুখারি : ৬০৪৪)

জিকির যেমনই জিহ্বার উচ্চারণের মাধ্যমে হতে পারে, তেমনই অন্তরের স্মরণ বা উপলব্ধির মাধ্যমেও হতে পারে। এর দ্বারা শুধু অবচেতন মনে আল্লাহর প্রশংসামূলক কিছু শব্দ উচ্চারণকেই বোঝায় না; বরং শয়নে-স্বপনে, কথাবার্তায়, চালচলনে, আচার-আচরণে তথা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর দেওয়া নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করাও জিকিরের অন্তর্ভুক্ত। তবে বিশেষ বিশেষ সময়ে নির্দিষ্ট কিছু শব্দ বা বাক্য দ্বারা জিকির রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ। এ শব্দমালা কিংবা দুআর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর স্মরণকেই জারি রাখা হয়। আমাদের প্রত্যেকের উচিত

Scanned by CamScanner

এই সমস্ত দুআ আত্মস্থ করে আল্লাহর দরবারে পেশ করা। বাজারে বিভিন্ন মাসনুন দুআ ও জিকির শেখার জন্য ছোটো ছোটো পুস্তিকা পাওয়া যায়। আমরা চেষ্টা করব সেখান থেকে অর্থসহ মাসনুন দুআ ও জিকিরগুলো মুখস্থ করে নিয়মিত আমলে করতে।

তওবা ও ইস্তেগফার : পাপ ও অবাধ্যতার পথ থেকে ফিরে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা আল্লাহর নৈকট্যলাভের অন্যতম উপায়। বান্দা পাপ থেকে ফিরে এলে আল্লাহ ঠিক ততটাই খুশি হন, যতটা খুশি হন কোনো পথিক তার হারানো বাহন পুনরায় ফিরে পেলে। নবিজির খাদেম আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশি খুশি হন, যে তার বাহনে চড়ে কোনো মরুভূমি বা জনহীন প্রান্তর অতিক্রম করছিল। অতঃপর কোনোক্রমে বাহনটি তার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। বাহনের পিঠে ছিল সমস্ত খাদ্য ও পানীয়। এরপর তার ফিরে আসার ব্যাপারে লোকটি নিরাশ হয়ে একটি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে বাহনটি হঠাৎ তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে যায়। আর সে তার লাগাম ধরে প্রভূত আনন্দে বলে ওঠে—"হে আল্লাহ! তুমি আমার দাস, আর আমি তোমার প্রভু!" সীমাহীন উচ্ছ্বাসে সে এমন ভুল করে ফেলে।' (মুসলিম : ২৭৪৭)

আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> 'নিশ্চয়ই আল্লাহ রাতের বেলা তাদের জন্য ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন, যারা দিনের বেলা গুনাহ করে। আর দিনের বেলা তিনি ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন তাদের জন্য, যারা রাতের অন্ধকারে পাপাচারে লিপ্ত হয়। সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া পর্যন্ত এটি চলমান থাকে।' (মুসলিম : ৭১৬৫)

গুনাহ করার পর শয়তান আমাদের কুমন্ত্রণা দিতে থাকে—'তুমি তো অনেক গুনাহ করে ফেলেছ। আল্লাহ তোমায় আর কখনোই ক্ষমা করবেন না। তিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত।' এসব কুমন্ত্রণা দিয়ে শয়তান আমাদের আল্লাহ থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে দেয়। দুর্বল করে দেয় আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের বন্ধন, কিন্তু মুমিন বান্দা ঘুণাক্ষরেও কখনো শয়তানের

Scanned by CamScanner

এমন কূটচালে প্রভাবিত হয় না; বরং ভুল করার সাথে সাথেই ইস্তেগফার ও তওবার আবেদন নিয়ে হাজির হয় প্রভুর দুয়ারে। আনাস (রা.)-এর বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'প্রত্যেক আদম সন্তানই গুনাহে লিপ্ত হয়; কিন্তু তাদের মধ্যে ওই সকল লোকেরাই সর্বোত্তম, যারা অনুতপ্ত হয় এবং তওবা করে।' (তিরমিজি : ২৪৯৯)

আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> 'কসম সেই সত্তার, যাঁর হাতে গচ্ছিত আমার প্রাণ! যদি তোমরা গুনাহ না করতে, তাহলে আল্লাহ তোমাদের এমন এক জাতিতে পরিণত করতেন, যারা গুনাহের পর আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করত, অতঃপর আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিতেন।'
> (মুসলিম : ৭১৪১)

জান্নাতে ইবলিসের প্ররোচনায় আমাদের আদি পিতা আদম (আ.) এবং আদি মাতা হাওয়া (আ.) উভয়েই ভুল করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁরা নিজেদের ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন প্রতিপালকের কাছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে সেই প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন—

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-

> 'তারা বলল—"হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের ওপর দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।"' (সূরা আ'রাফ : ২৩)

প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ নিজেও দিনে অসংখ্যবার ইস্তেগফার করতেন; যদিও তিনি ছিলেন যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত, নিষ্পাপ ও নির্মল মহামানব। আম্মার ইবনে ইয়াসার মুজানি (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর সমীপে তওবা করো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাও। কেননা, আমি প্রতিদিন ১০০ বার তওবা করে থাকি।' (মুসলিম : ২৭০২)

Scanned by CamScanner

এজন্য আমরা নির্দিষ্ট কিছু সময় বাছাই করে নিজের পর্যালোচনা ও সমালোচনা করব। নিজের বিগত ভুলের জন্য ইস্তেগফার ও তওবা করব। এভাবে প্রতিনিয়ত আত্মসমালোচনা ও ইস্তেগফারের মধ্য দিয়ে আমরা ধাবিত হব আল্লাহর নৈকট্যের দিকে। তবে মনে রাখতে হবে, শুধু আস্তাগফিরুল্লাহ... আস্তাগফিরুল্লাহ...বলাটাই তওবা নয়; এর জন্য রয়েছে কিছু নির্দিষ্ট আদব ও পদ্ধতি।

ইমাম মুহিউদ্দিন আন-নববি (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন—

> ‘প্রত্যেক পাপ থেকে তওবা তথা চিরতরে প্রত্যাবর্তন করা সকলের জন্য ওয়াজিব। গুনাহ যদি হাক্কুল্লাহ তথা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে এবং হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকারসংক্রান্ত না হয়, তাহলে এ ধরনের তওবা কবুলের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে—
>
> ১. সম্পূর্ণরূপে পাপাচার বর্জন।
>
> ২. বিগত গুনাহের জন্য লজ্জা, অনুতাপ, অনুশোচনা ও
>
> ৩. পাপের পুনরাবৃত্তি না ঘটানোর ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প।’

এর একটি শর্তও যদি লুপ্ত হয়, তাহলে সেই তওবা বিশুদ্ধ হবে না। পক্ষান্তরে যদি সেই পাপ মানুষের অধিকার সম্পর্কিত হয়, তাহলে তার জন্য তওবা কবুল হওয়ার শর্ত চারটি। উপরিউক্ত তিনটির সাথে অতিরিক্ত চতুর্থ শর্ত হলো—‘হকদারকে তার প্রাপ্য পরিশোধ করা’। যদি কেউ অবৈধ পন্থায় কারও মাল হরণ করে থাকে, তাহলে অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে তা হকদারকে ফিরিয়ে দিতে হবে। অন্যদিকে কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিলে বা কোনোরূপ অন্যায় করে থাকলে সংশিষ্ট ব্যক্তির কাছে যথার্থ শাস্তির জন্য নিজেকে পেশ করতে হবে অথবা চাইতে হবে নিঃশর্ত ক্ষমা।

নেককারদের সহবত : আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো সৎকর্মশীল সহকর্মী বা বন্ধু। রাসূল ﷺ বলেছেন—

> ‘মানুষ তার বন্ধুর ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। সুতরাং সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে, তা যেন অবশ্যই যাচাই করে নেয়।’
> (মুসনাদে আহমদ : ৮০১৫)

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন—

> ‘তুমি দৃঢ়চিত্ত হয়ে তাদের সাথে অবস্থান করো, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং দুনিয়ার

Scanned by CamScanner

জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে। তোমার দুই চোখ যেন তাদের থেকে ঘুরে না যায়। আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার জিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম হয়েছে বিনষ্ট।' (সূরা কাহাফ : ২৮)

কুরআন ও হাদিসে অসংখ্য জায়গায় উত্তম সহকর্মী বা বন্ধু নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভালো ও মন্দ বন্ধু জীবনকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে, রাসূল ﷺ-এর উপমায় তা স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলেন—

'ভালো ও দুষ্ট বন্ধু মেশক (সুগন্ধি) বহনকারী এবং হাঁপরে ফুঁৎকারদাতার (কামার) মতো। মেশক বহনকারী ব্যক্তির অবস্থা তো এমন; হয় সে এ মেশক তোমাকে উপহার দেবে, নয়তো তুমি তার থেকে সেটি খরিদ করবে অথবা তার থেকে লাভ করবে সুঘ্রাণ। আর হাঁপরে ফুঁকদাতা ব্যক্তি হয় তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দেবে, নয়তো তুমি তার কাছ থেকে পাবে কেবলই দুর্গন্ধ।' (বুখারি : ২১০১)

অপর একটি হাদিসে রাসূল ﷺ বলেন—

'অসৎসঙ্গীর চেয়ে একাকিত্ব ভালো। আর একাকিত্বের চেয়ে সৎসঙ্গী ভালো।' (শুয়াবুল ঈমান : ৪৬৩৯)

বলা হয়ে থাকে—'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।' এ কারণেই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্যে থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ করে যুবকদের ক্ষেত্রে। কেননা, এ বয়সেই বিচিত্র বিষয়ের ওপর তীব্র কৌতূহল জন্মে এবং পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার যাবতীয় সুযোগ, শক্তি ও সক্ষমতা থাকে সবচেয়ে বেশি। ফলে এই বয়সে বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনাও ব্যাপক। তা ছাড়া এই বিশেষ কালপর্বের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ভিত্তিতেই পরবর্তী জীবন পরিচালিত হয়। তাই এমন মানুষদের সাথে চলাফেরার চেষ্টা করতে হবে; যারা দাওয়া, তাজকিয়া ও অধ্যবসায়ে দিনাতিপাত করে। এতে পাপ থেকে বেঁচে থাকা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে, তৈরি হবে দ্বীন পালনের অদম্য উৎসাহ।

নিয়মিত আত্মপর্যালোচনা : আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথে কতটুকু অগ্রসর হলাম, কোথাও বিচ্যুতি ঘটল কি না ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা

Scanned by CamScanner

করা জরুরি। এতে নিজের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা সহজ হয়। একই সঙ্গে তৈরি হয় অধিকতর আত্মোন্নয়ন ও আত্মশুদ্ধির অবারিত সুযোগ। ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন—

> 'প্রত্যেক মানুষের উচিত রাতে ঘুমানোর আগে একটি ঘণ্টা আল্লাহর জন্য ব্যয় করা। সেই সময়ে নিজেকে প্রশ্ন করা দরকার—আজকের দিনে সে কী হারিয়েছে আর কী অর্জন করেছে। এরপর সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং এ অবস্থাতেই নিদ্রা যাবে। প্রতিরাতেই এমনটি করা উচিত।'

আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য মুমিন জীবনের সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি। আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক কে না চায়? কে না চায় তাঁর প্রিয়ভাজন হতে? কারণ, আল্লাহ যার হয়ে যায়, গোটা জগৎটাই তার হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রীর কাছের কেউ হতে পারলে, প্রিয় সেলিব্রেটির একটা ফোন কল পেলে কিংবা প্রিয় মানুষটি হঠাৎ কাছে ডেকে নিলে আমাদের অনুভূতি কেমন হয়—ভেবে দেখুন তো! আর বিশ্বজাহানের অধিপতি স্বয়ং আল্লাহ যদি বলেন—'আমি আমার এ বান্দাকে ভালোবাসি। হে ফেরেশতারা! তোমরাও তাকে ভালোবাসো।' এমন পরিস্থিতে সে ব্যক্তির জীবনে অপ্রাপ্তি বলতে আর কিছু থাকে না। মানবজীবনের এটাই তো চূড়ান্ত সফলতা।

সুতরাং নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার কাছে সঁপে দেওয়ার মানসিকতা অর্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, তিনিই আমার সর্বাধিক আপন, সবচেয়ে কাছের। আমি আমার যতটা কাছে, তারচয়েও বেশি সন্নিকটে মহান আল্লাহ। আমি নিজেকে ভালোবাসি যতটা, ততোধিক ভালো তিনি আমাকে বাসেন—এটা কি আমরা বিশ্বাস করি? অনুভব করি হৃদয় দিয়ে?

রবের কাছে যেতে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগে না, প্রয়োজন পড়ে না মধ্যস্থতার। কোনোরূপ মাধ্যম ব্যতিরেকেই তিনি আমাদের ডাকে সাড়া দেন প্রতিমুহূর্তে। তিনি সকল কিছু দেখেন, শোনেন ও জানেন। তিনি তো অন্তর্যামী! আমরা তাঁর সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য পেতে যতটা না আগ্রহী, তারচেয়ে বেশি উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করেন তিনি। আমরা একটু আগালে তিনি এগিয়ে আসেন অনেক দূর। মায়া ও মমতার স্পর্শে কাছে টেনে নেন প্রিয় বান্দাদের, আগলে রাখেন অফুরান দয়ার বাঁধনে।

Scanned by CamScanner

হেলদি লাইফস্টাইল

সুস্থতা দুনিয়ার জীবনে সবচেয়ে বড়ো নিয়ামতগুলোর একটি। সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন জীবনে আনে ছন্দ, গতি আর প্রশান্তি। অন্যদিকে অসুস্থতা মানুষের সমস্ত অর্থবিত্ত, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে ম্লান করে দেয়। এজন্যই ইসলাম সুস্থতাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'আল্লাহর নিকট একজন সুস্থ-সবল মুমিন দুর্বল মুমিন অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ও উত্তম।' (মুসলিম : ৬৯৪৫)

একজন সুস্থ-সবল মুমিন যথাযথ হকের সাথে আল্লাহর ইবাদত পালনে অধিক সমর্থ হন। পাশাপাশি মানুষের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন, পারেন অন্যের সাহায্যে পাশে দাঁড়াতে। প্রয়োজনে কঠিন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেও পিছপা হন না তিনি। তাই আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়ার জন্য হলেও নিজের সুস্থতা ও ফিটনেস সম্পর্কে মুমিনের সচেতন হওয়া একান্ত কর্তব্য। তা ছাড়া নিজের সুস্থতা ও ফিটনেসের প্রতি যত্নবান হওয়া মুমিনদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও বটে। সকল নবি-রাসূলই সুস্বাস্থ্যের প্রতি ছিলেন যত্নবান। প্রত্যেকেই ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী কর্মবীর। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও অত্যন্ত কর্মঠ ও সক্রিয় জীবন নির্বাহ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মরুভূমিতে মেষ চড়াতেন, ব্যাবসা-বাণিজ্য করতেন দূর-দূরান্তে। নবুয়তের পূর্বে নিভৃতে ধ্যান করার উদ্দেশ্যে হাইকিং করে উঠেছেন ৬৩৪ মিটার উঁচু জাবালে নুর পর্বতের গুহায়। বাস্তব জীবনে উট, গাধা,

Scanned by CamScanner

ঘোড়া ইত্যাদি বাহনে চড়েছেন। নিজেই যুদ্ধপরিচালনা করেছেন, সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন জিহাদের ময়দানে। এ ছাড়া তিনি প্রায়ই মদিনার বাজার পরিদর্শনে যেতেন, অসুস্থদের দেখতে যেতেন, নিয়মিত মদিনা থেকে হেঁটে হেঁটে চলে যেতেন কুবা পর্যন্ত। ছাগলের দুধ দোহন থেকে শুরু করে নিজের জুতা-জামা সেলাই পর্যন্ত যাবতীয় সাংসারিক কাজে তিনি সাগ্রহে অংশ নিতেন। সর্বোপরি একটি কর্মচঞ্চল, গতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন করেছেন বিশ্বনবি মুহাম্মাদ ﷺ।

সুস্থতা একদিনে অর্জিত হয় না। এটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিলে তিলে অর্জিত হওয়ার বিষয়। এর জন্য চাই পরিকল্পিত উপায়ে নিয়মিত শরীর, মন ও আত্মার পরিচর্যা এবং নিয়মমাফিক জীবনযাপন। কিন্তু মানুষমাত্রই নিয়মের প্রতি উদাসীন। তারা যাচ্ছেতাই চলতেই অধিক পছন্দ করে। এ কারণে অজান্তেই মানুষ ধীরে ধীরে নিজের সুস্থতাকে দুর্ভেদ্য খাঁচায় বন্দি করে ফেলে। পরে যখন অসুস্থতা তার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায়, তখন বুঝতে পারে—কী নিয়ামতকে এতদিন উপেক্ষা করেছে তারা। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবি ﷺ ইরশাদ করেছেন—

> 'অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তায়ালার দুটি বিশেষ নিয়ামতের প্রতি উদাসীন। একটি স্বাস্থ্য, অপরটি তার অবসর।' (বুখারি : ৬৪১২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সুস্থতার জন্য একই সঙ্গে শরীর ও আত্মাকেও সমান গুরুত্ব দিতেন। এ দুইয়ের মাঝে সমন্বয়ের জন্য তিনি অনুসরণ করতেন নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম ও পদ্ধতি। পরিমিত ও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ, নিয়মিত ঘুম, শারীরিক শ্রম, বিনোদন, পরিবার ও আত্মীয়দের সময় দান, ইবাদত, জিকির, রোজা, দীর্ঘক্ষণ নামাজে মগ্ন থাকা ইত্যাদি ছিল তাঁর সুস্থ ও সাবলীল জীবনের প্রধান নিয়ামক। মনুষ্য বৈশিষ্ট্যানুযায়ী কখনো অসুস্থ হলে তিনি যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণ করতে কখনোই দ্বিধা করতেন না। বলতেন—

> 'হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো। কেননা, মহান আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার প্রতিষেধক তিনি দেননি। তবে একটি রোগ আছে, যার কোনো প্রতিষেধক নেই। আর তা হলো—বার্ধক্য।' (ইবনে মাজাহ : ৩৪৩৬)

Scanned by CamScanner

এবারে রাসূল ﷺ-এর সুস্বাস্থ্যের কয়েকটি চাবিকাঠি একটু জেনে নেওয়া যাক—

১. উত্তম খাদ্যাভ্যাস (Healthy Diet)

রাসূল ﷺ-এর সুস্বাস্থ্যের পেছনে সবচেয়ে বড়ো নিয়ামক ছিল উত্তম খাদ্যাভ্যাস। তিনি ছিলেন পরিমিত ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত। কখনো উদর পূর্তি করে খেতেন না। পেটকে আনুমানিক তিন ভাগ করে এক ভাগের জন্য খাবার খেতেন, আরেক ভাগ পানি দ্বারা পূর্ণ এবং অপরভাগ খালি রাখতেন সব সময়।

রাসূল ﷺ অল্পই খেতেন, কিন্তু তা খেতেন উপভোগ করে। খাবার নষ্ট করতেন না কখনো। বড়ো থালা ব্যবহার করতেন, যেন খাবার মাটিতে না পড়ে। কোনো কারণে খাবার পড়ে গেলে তা পরিচ্ছন্ন অবস্থায় তুলে খাওয়ার জন্য ব্যবহার করতেন চামড়ার দস্তরখান। থালায় কোনো খাবার ফেলে রাখতেন না; এমনকী আঙুলে লেগে থাকা খাবারের অবশিষ্ট অংশও চেটে খেতেন। আনাস (রা.) বর্ণনা করেন—

> 'নবিজি খাবার খেলে তাঁর তিন আঙুল চেটে খেতেন। আর বলতেন—"তোমাদের কারও নলা পড়ে গেলে সে যেন তা শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে; বরং ধুয়ে খেয়ে ফেলে। আর চেটে খায় যেন থালাটিও। কারণ, তোমরা তো জানো না, খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।"' (মুসিলম : ৬০৮)

খাবার শেষে আঙুল চেটে খাওয়ার সুন্নত থেকে চিকিৎসাবিদগণ একটি চমৎকার তথ্য বের করেছেন। এ সময় মুখের ভেতর সেলিভারি গ্ল্যান্ড (Salivary Gland) থেকে টায়ালিন (Ptyalin) নামক একপ্রকার পাচক রস বের হয়। পাকস্থলী থেকে শিষণ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই এটি প্রায় সব খাবার অর্ধেক হজম করে ফেলে।

রাসূল ﷺ খুবই পরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার গ্রহণ করতেন। খাওয়ার পূর্বে দুই হাতের কবজি পর্যন্ত ধুয়ে নিতেন। সর্বদা খাবার গ্রহণ করতেন ডান হাত দিয়ে। কারণ, ডান হাত বাম হাত অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র ও উত্তম। তা ছাড়া ডান হাতে খাওয়া রুচিসম্মতও বটে। তিনি খাবারে কখনো ফুঁ দিতেন না। এটা ছিল তাঁর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানও খাবারে ফুঁ দিতে নিষেধ করে। কারণ, ফুঁ দিলে মুখ থেকে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড খাবারে মিশে যায়, যা শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

Scanned by CamScanner

কোনো কিছুর ওপর হেলান দিয়ে খাবার খেতে তিনি নিষেধ করেছেন। হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণের ফলে পেট বড়ো হয়ে যায়। এতে খাবার গলায় আটকে যেতে পারে অথবা শ্বাসনালিতে ঢুকে যেতে পারে। তা ছাড়া এটা দাম্ভিকতার আলামতও বটে। আবু হুজাইফা (রা.) বর্ণনা করেন—

> 'আমি রাসূল ﷺ-এর দরবারে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন—"আমি ঠেস লাগানো অবস্থায় কোনো কিছু ভক্ষণ করি না।"' (বুখারি : ৫১৯০, তিরমিজি : ১৯৮৬)

নবি করিম ﷺ বালিশে বিশ্রাম নেওয়া অবস্থায়ও কখনো খাবার খেতেন না। তিনি তিন আঙুল দিয়ে খাবার উঠিয়ে ছোটো ছোটো লোকমায় খাবার খেতেন। একদমই তাড়াহুড়ো করতেন না। এতে ভালো করে চিবিয়ে খাওয়ার সুযোগ পেতেন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে—উত্তমরূপে চিবিয়ে খেলে খাবার ভালোভাবে চূর্ণ হয়। ফলে খাবারের যাবতীয় পুষ্টি শরীর সহজেই শোষণ করতে পারে। তা ছাড়া চিবিয়ে খেলে খাবার অপেক্ষাকৃত বেশি সময় মুখে থাকে। এতে খাবারের মধ্যকার স্নেহ ও চর্বিজাতীয় পদার্থ দ্রুত হজম হওয়ার সুযোগ পায়। খাবার দীর্ঘক্ষণ চিবিয়ে খেলে মস্তিষ্ক অল্পতেই তৃপ্ত হয়। ফলে অতি ভোজনের সম্ভাবনাও কমে যায়।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন—ভালোভাবে চিবিয়ে খেলে খাবার মুখের লালার সাথে মিশ্রিত হয়। মানুষের মুখের লালায় 'সালিভারি অ্যামায়লেস' নামক একধরনের অ্যানজাইম থাকে, যা খাবার ভালোভাবে হজম করতে সাহায্য করে। এতে গ্যাসট্রিকসহ পেটের বিভিন্ন সমস্যা থেকে নিরাপদ থাকা যায়। অন্যদিকে ভালো করে চিবিয়ে না খেলে খাবার লালার সঙ্গে ভালোভাবে মেশার সুযোগ পায় না। ফলে শরীরে অপ্রয়োজনীয় বায়ু প্রবেশ করে এবং গ্যাসট্রিক ও হজমে সমস্যা তৈরি হয়।

ডেন্টিস্টরা বলেন—খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে খেলে দাঁত ও দাঁতের মাড়ি শক্ত হয়। সঠিকভাবে চিবানোর ফলে মুখ থেকে নিঃসৃত স্যালাইভা দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাদ্যাংশ পরিষ্কার করে। এতে দাঁতের সমস্যা কমে যায়, দাঁত হয় মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

রাসূল ﷺ সাধারণত একা খেতেন না; কখনো পরিবারের লোকজন, কখনো আহলে সুফফা বা অন্য সাহাবিগণ তাঁকে সঙ্গ দিতেন। এতে আনন্দঘন ও বৈঠকি পরিবেশে তাঁর খাদ্য গ্রহণ সম্পন্ন হতো। তিনি কখনো খাবারের দোষত্রুটি ধরতেন না। পছন্দ হলে খেতেন, নচেৎ এড়িয়ে যেতেন নিঃশব্দে।

Scanned by CamScanner

রাসূল ﷺ রুটিন মেনে খাদ্য গ্রহণ করতেন। প্রতিদিন ফজরের নামাজান্তে সূর্যোদয়ের পর বাড়িতে ফিরে স্ত্রীদের জিজ্ঞেস করতেন—কোনো খাবার আছে কি না। থাকলে খেতেন, না থাকলে বলতেন—'আমি রোজার নিয়্যাত করলাম।' দুপুরের খাবার গ্রহণ করতেন জোহরের নামাজের পূর্বে। খাবার শেষে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে জোহরের সালাত আদায় করতেন। আসরের সালাতের পর তিনি স্ত্রীদের ঘরে যেতেন এবং মধু ও মিষ্টান্নজাতীয় খাবার খেতেন। আর রাতের খাবার খেতেন এশার সালাতের পূর্বে। এরপর এশার সালাত ও কিয়ামুল লাইল করে ঘুমিয়ে যেতেন।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান রাসূল ﷺ-এর অনুরূপ সময়ে খাদ্যগ্রহণের পরামর্শ দেয়। রাসূল ﷺ রাতে খেয়েই শুয়ে পড়তেন না; বরং কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করতেন। এতে খাবার হজম হয়ে যেত সহজেই। চিকিৎসাবিজ্ঞানও এই পদ্ধতি অনুসরণের পরামর্শ দেয়। চিকিৎসকগণ বলেন—রাতে খাওয়ার পরপরই শুয়ে পড়লে খাবারের অ্যাসিডিটি পরিপাকতন্ত্রের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে হজমে বিঘ্নতা ঘটে; দেখা দেয় ক্ষুধামন্দা, বদহজম, গ্যাস্ট্রিকসহ পরিপাকতন্ত্রের নানাবিধ জটিলতা।

বিশ্বনবির খাবার

রাসূল ﷺ মোটামুটি তিন ধরনের খাবার খেতেন—

১. সাধারণ বা সহজাত খাবার, যা তিনি নিয়মিত খেতেন। এর মধ্যে ছিল খেজুর, দুধ, গোশত, লাউ, যবের ছাতু ও বার্লি দিয়ে তৈরি রুটি। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বর্ণনা করেন—

> 'আমি রাসূল ﷺ-কে বার্লির এক টুকরো রুটির ওপর একটি খেজুর রাখতে দেখেছি। তারপর বলেছেন—"এটিই সালন-মসলা।"' (আবু দাউদ : ৩৮৩০)

২. রাসূল ﷺ এমন কিছু দুর্লভ খাবার খেয়েছেন, যা সচারচর পাওয়া যেত না। এই ধরনের খাবার নবিজি খুব কম সময়ই খেয়েছেন। যেমন : খরগোসের গোশত, সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি।

৩. বিশ্বনবি ﷺ কিছু কিছু খাবার একটু বেশি পছন্দ করতেন। যেমন : মধু, মিষ্টান্ন, সারিদ, খাশির সামনের রান ইত্যাদি।

রাসূল ﷺ যে সমস্ত খাবার গ্রহণ করতেন বা জীবনে একবার হলেও খেয়েছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার একটি সামগ্রিক তালিকা দেখে নেওয়া যাক—

Scanned by CamScanner

ফলজাতীয় খাবার : রাসূল ﷺ নানা সময়ে নানা ধরনের ফলজাতীয় খাবার গ্রহণ করতেন বলে জানা যায়। এর মধ্যে কিছু ছিল নিয়মিত খাবারের অন্তর্ভুক্ত, কিছু খুবই পছন্দনীয় এবং কিছু কিছু তিনি কদাচিৎ খেতেন। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো—

ক. খেজুর : বিশ্বনবি ﷺ জীবনে সবচেয়ে বেশি যে খাবারটি খেয়েছেন, তার নাম খেজুর। মরুময় আরবে খেজুর অন্যতম প্রধান খাদ্য। খেজুর সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন—

> 'যে বাড়িতে খেজুর নেই, সে বাড়ির অধিবাসীরা অভুক্ত।'
> (আবু দাউদ : ৩৮৩১)

খেজুর ছাড়া যেন আরবদের ক্ষুধাই নিবৃত হতো না। অন্যভাবে বলা যায়—যার বাড়িতে কিছুই থাকত না, তার বাড়িতেও অন্তত খেজুর থাকত। সুতরাং যার ঘরে খেজুর ছিল না, বুঝতে হতো—তার ঘরে কোনো খাবারই নেই।

খেজুরের রয়েছে বহুমুখী পুষ্টি ও ঔষধিগুণ। এটি শরীরের ক্যালসিয়াম, আয়রন ও ভিটামিনের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি পানিশূন্যতা পূরণেও সহায়তা করে। বাড়তি চর্বি ও কোলেস্টরেল না থাকায় খেজুর খেলে বাড়তি ওজন হয় না। খেজুরে যেমন ক্ষুধা মেটে, তেমনই এর আঁটি চুষলে তৃষ্ণাও নিবারণ হয়। রাসূল ﷺ সন্তান প্রসবের পর প্রসূতি মাকে খেজুর খাওয়ার পরামর্শ দিতেন এবং নবজাতকের মুখে তাহনিক বা খেজুরের থেতলানো টুকরো তুলে দিতেন।

খ. কিশমিশ : রাসূল ﷺ ভেজা কিশমিশ পছন্দ করতেন এবং এটা তিনি নিয়মিত খেতেন। সাফিয়্যা বিনতে আতিয়্যা (রা.) বর্ণনা করেন—

> 'আমি বনি আবদুল কায়েসের রমণীদের সাথে আয়িশা (রা.)-এর কাছে গমন করলাম। আমরা তাঁর কাছে খেজুর ও কিশমিশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন—"আমি এক মুষ্টি খেজুর ও এক মুষ্টি কিশমিশ একটি পাত্রে ভিজিয়ে নরম করতাম। এরপর তা নবিজিকে খাওয়াতাম।"' (আবু দাউদ : ৩৬৯৯)

গ. তরমুজ : রাসূল ﷺ মরুভূমিতে উৎপন্ন তরমুজ খেতেন। আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন—

Scanned by CamScanner

'রাসূল ﷺ তরমুজের সঙ্গে "রোতাব" (তাজা-পাকা খেজুর) খেতেন।' (বুখারি : ৫১৩৪, তিরমিজি : ১৮৪৪)

ঘ. জয়তুন : জয়তুন একটি ঔষধিগুণসমৃদ্ধ ফল। এর নানান পুষ্টিগুণ ও উপকারিতা রয়েছে। রাসূল ﷺ জয়তুন খেতেন এবং এর তেল ব্যবহারের পরামর্শ দিতেন। তিনি বলেন—

'তোমরা জয়তুন খাও এবং জয়তুনের তেল গায়ে মাখো। কেননা, এটি একটি মোবারক বৃক্ষ থেকে তৈরি।' (ইবনে মাজাহ : ১০০৩)

মিষ্টান্ন ও মধু : রাসূল ﷺ মিষ্টিজাতীয় খাবারও খেতে খুব পছন্দ করতেন। প্রাকৃতিক মধু ও প্রক্রিয়াজাত মিষ্টি ছিল এর মধ্যে অন্যতম। আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন—

'রাসূল ﷺ মিষ্টান্ন ও মধু পছন্দ করতেন।' (বুখারি : ৫১১৫)

রাসূল ﷺ প্রতিদিন বিকেলে স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ এবং মধুপান করতেন। তিনি মধুকে অভিহিত করেছেন উত্তম ওষুধ হিসেবে। একে তিনি শেফা বা আরোগ্য লাভের উপকরণ বলেও ঘোষণা করেছেন। ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

'তোমাদের উচিত দুটি জিনিসের শেফা গ্রহণ করা; মধু ও কুরআন।' (ইবনে মাজাহ : ৩৪৫২)

দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার : রাসূল ﷺ দুধ খেতে পছন্দ করতেন। এটি ছিল তাঁর সহজাত খাবারগুলোর মধ্যে একটি। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন—

'মিরাজের রাতে বাইতুল মাকদিসে আমি দুই রাকাত নামাজ পড়ে বের হলে জিবরাইল (আ.) আমার সম্মুখে শরাব ও দুধের দুটি পৃথক পাত্র রাখলেন। আমি দুধের পাত্রটি নির্বাচন করলাম। জিবরাইল (আ.) বললেন—"আপনি প্রকৃত ও স্বভাবজাত খাবারই নির্বাচন করেছেন।"' (বুখারি : ৩১৬৪, তিরমিজি : ২১৩)

দুগ্ধজাত খাবারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

ক. মাখন : নবিজি মাখন ও খেজুর একসাথে করে খেতে পছন্দ করতেন। ইবনে বিসর আল মুসলিমাইন (রা.) বর্ণনা করেন—

Scanned by CamScanner

'একবার আমাদের ঘরে রাসূল ﷺ আগমন করলেন। আমরা তাঁর সম্মুখে মাখন ও খেজুর পরিবেশন করলাম। তিনি মাখন ও খেজুর পছন্দ করতেন।' (তিরমিজি : ১৮৪৩)

খ. পনির : রাসূল ﷺ একদিন পনির খেয়েছেন বলে হাদিস থেকে জানা যায়। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন—

'তাবুকের যুদ্ধে রাসূল ﷺ-এর সামনে কিছু পনির উপস্থাপন করা হলো। রাসূল ﷺ বিসমিল্লাহ পড়ে একটি চাকু দিয়ে সেগুলো কাটলেন এবং কিছু খেলেন।' (আবু দাউদ : ৩৮১৯)

গ. ঘি মাখা রুটি : নবিজি ঘিয়ে মাখা রুটি খেতে পছন্দ করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ একদিন বললেন—

'যদি আমাদের কাছে বাদামি গম দিয়ে তৈরি এবং ঘিয়ে সিক্ত সাদা রুটি থাকত, তাহলে সেগুলো খেতাম। আনসারি এক সাহাবি এই কথা শুনে এ ধরনের রুটি বানিয়ে রাসূলের সামনে পেশ করলেন।' (ইবনে মাজাহ : ৩৩৪০)

গোশতজাতীয় খাবার : রাসূল ﷺ গোশত খেতে পছন্দ করতেন; যদিও তাঁর ঘরে গোশত খুব কমই রান্না হতো। তিনি যে সমস্ত পশু বা পাখির গোশত খেয়েছেন বলে হাদিসে পাওয়া যায়, তা তুলে ধরছি—

ক. খাসির পায়া : গোশতের মধ্যে রাসূল ﷺ খাসির সামনের রানের অংশ বেশি পছন্দ করতেন। তিনি মূলত এই গোশত রুটি দিয়ে খেতে ভালোবাসতেন। আয়িশা (রা.) বলেন—

'আমরা ছোটো খাসির পায়া রান্না করতাম। রাসূল ﷺ কুরবানির ১৫ দিন পরও সেগুলো খেতেন।' (বুখারি : ৫১২২)

খ. মোরগ : রাসূল ﷺ মোরগের গোশত খেয়েছিলেন বলে কয়েকটি হাদিস থেকে জানা যায়। জাহদাম (রা.) বর্ণনা করেন—

'একদিন আবু মুসা একটি মোরগ নিয়ে এলেন। এতে উপস্থিত একজন গলার স্বর ভিন্ন করে আওয়াজ করল। আবু মুসা জিজ্ঞেস করলেন—"কী হলো তোমার?" লোকটি বলল—"মোরগকে বিভিন্ন খাবার খেতে দেখে আমার অপছন্দ হওয়ায় শপথ করেছি। কোনোদিন মোরগ খাব না।" আবু মুসা তাঁকে বললেন—

Scanned by CamScanner

"কাছে আসো এবং ভোজনে অংশগ্রহণ করো। কারণ, আমি রাসূল ﷺ-কে মোরগ খেতে দেখেছি। আর তুমি তোমার শপথ ভঙ্গের কাফফারা আদায় করে নেবে।"' (বুখারি : ৫১৯৮)

গ. **খরগোশ** : একটি হাদিসে পাওয়া যায়, আল্লাহর রাসূল ﷺ একবার খরগোশ খেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদেম আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন—

'মাররুজ-জাহরান নামক স্থানে আমাদের পাশ দিয়ে একটি খরগোশ লাফিয়ে পড়ল। এই দৃশ্য দেখে আমাদের সঙ্গীরা খরগোশটিকে ধাওয়া করল, কিন্তু তারা সেটিকে পাকড়াও করতে না পেরে ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। তবে আমি ধাওয়া করে এর নাগাল পেয়ে গেলাম এবং ধরে আবু তালহার নিকট নিয়ে এলাম। তিনি মারওয়া নামক স্থানে সেটি জবাই করলেন। এরপর আমাকে দিয়ে খরগোশটির উরু ও নিতম্ব রাসূল ﷺ-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রাসূল ﷺ সেগুলো ভক্ষণ করলেন। আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো—"রাসূল কি তা খেয়েছিলেন?" তিনি জবাব দিলেন—"হ্যাঁ।"' (বুখারি : ২৪৩৩)

সামুদ্রিক মাছ : মহানবি ﷺ সাগরের মাছ পছন্দ করতেন। এ বিষয়ে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনায় একটি দীর্ঘ হাদিস রয়েছে। সেখানে তিনি বলেন—

'রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদের একটি কাফেলার ওপর সুযোগমতো আক্রমণ চালানোর জন্য আমাদের ৩০০ সদস্যের একটি সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) ছিলেন আমাদের সেনাপতি। আমরা অর্ধমাস সমুদ্রতীরে অবস্থান করলাম। একপর্যায়ে ভয়ানক ক্ষুধা আমাদের পেয়ে বসল। ক্ষুধার জ্বালায় গাছের পাতা খেতে থাকলাম। এজন্যই পরবর্তী সময়ে এ সৈন্যবাহিনীর নাম রাখা হয়েছে "জায়শুল খাবাত" বা পাতাওয়ালা সৈন্যদল।

এরপর সমুদ্র আমাদের জন্য আম্বর নামক একটি প্রাণী (মাছ) নিক্ষেপ করল। আমরা অর্ধমাস ধরে তা খেলাম। এর চর্বি শরীরে লাগালাম। ফলে আমাদের শরীর পূর্বের মতো হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল। একবার আবু উবায়দা (রা.) মাছটির শরীর থেকে

Scanned by CamScanner

একটি পাঁজর ধরে খাড়া করালেন। এরপর তাঁর সাথিদের মধ্যকার সবচেয়ে লম্বা লোকটিকে আসতে বললেন। লোকটিকে উটের পিঠে বসিয়ে হাড়টির নিচ দিয়ে অতিক্রম করালেন।

এরপর আমরা মদিনায় ফিরে এলে রাসূল ﷺ-কে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন—"খাও। এটি তোমাদের জন্য রিজিক হিসেবে আল্লাহই পাঠিয়েছেন। আর তোমাদের কাছে কিছু অবশিষ্ট থাকলে আমাদেরও খাওয়াও।" এরপর মাছটির কিছু অংশ রাসূল ﷺ-কে দেওয়া হলো। তিনি তা খেলেন।' (বুখারি : ৪৩৬১, ৪৩৬২)

সারিদ : সারিদ নামে আরবে একটি প্রসিদ্ধ খাবার পাওয়া যায়। এটি মূলত গোশতের ঝোলে ভেজানো টুকরো টুকরো রুটি দিয়ে তৈরি বিশেষ খাদ্য। বিশ্বনবি এই খাবারটিও পছন্দ করতেন। তিনি বলেছেন—

'খাবারের মধ্যে যেমন সারিদ সেরা, তেমনই নারীদের মধ্যে সেরা আয়িশা।' (বুখারি : ৩৪১১)

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন—

'রাসূল ﷺ-এর কাছে রুটির সারিদ ও হায়সের সারিদ অত্যন্ত প্রিয় ছিল।' (আবু দাউদ : ৩৭৮৩)

সবজি জাতীয় খাবার : মরুভূমিতে সবজি কম পাওয়া গেলেও আল্লাহর রাসূল ﷺ কিছু সবজি খেতে খুব পছন্দ করতেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

ক. লাউ : সবজির মধ্যে লাউ রাসূল ﷺ-এর অন্যতম প্রিয় খাদ্য ছিল বলে জানা যায়। আনাস (রা.) বর্ণনা করেন—

'একবার একজন দরজি মহানবি ﷺ-কে খাবারের দাওয়াত দিলো। আমিও রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সেই খাবারে অংশ নিলাম। রাসূল ﷺ-এর সামনে বার্লির রুটি, গোশতের টুকরা ও লাউ মেশানো ঝোল পরিবেশন করা হলো। দেখলাম—তিনি লাউয়ের টুকরো থালা থেকে খুঁজে খুঁজে নিয়ে খাচ্ছেন। আমিও সেদিন থেকে লাউয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লাম।' (বুখারি : ৫০৬৪, মুসলিম : ২০৬১)

Scanned by CamScanner

খ. শসা : রাসূল ﷺ সবজির মধ্যে শসাও খেতেন। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) বর্ণনা করেন—

> 'আমি রাসূল ﷺ-কে শসার সঙ্গে "রোতাব" (তাজা খেজুর) খেতে দেখেছি।' (মুসলিম : ৩৮০৬)

পানীয় : পানীয় খাদ্যের মধ্যে নবিজি পানি ও মধু তো খেতেনই। এর সাথে বিভিন্ন ঔষধি শরবতও খেতেন। যেমন : সিরকা। রাসূল ﷺ সিরকা পছন্দ করতেন। ইংরেজিতে এটাকে বলা হয় ভিনেগার (Vinegar)। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলতেন—

> 'অবিশ্বাসীরা যেমন মদ খায়, তেমনই আমাদের জন্য প্রিয় শিরকা।'[১]

জাবের (রা.) বলেন—

> 'রাসূল ﷺ তাঁর পরিবারের কাছে "সালন" চাইলেন। তাঁরা বললেন—"আমাদের কাছে তো সিরকা ছাড়া আর কিছুই নেই।" এরপর মহানবি ﷺ-এর কাছে সেগুলো নিয়ে আসা হলো। তিনি তা খেতে শুরু করলেন। তারপর বললেন—"সিরকা কতই-না উত্তম সালন! সিরকা কতই-না উত্তম সালন!" সেদিন থেকে আমি সিরকা পছন্দ করতে শুরু করলাম।' (মুসলিম : ২০৫১)

২. রোজা (Autophagy)

রাসূল ﷺ-এর সুস্থতার আরেকটি বড়ো কারণ ছিল রোজা। তিনি নিয়মিত রোজা রাখতেন। আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এই রোজা রাখার পদ্ধতিকে 'অটোফেজি' বলে অভিহিত করে থাকে। রোজা মূলত শরীর থেকে যাবতীয় ক্ষতিকর বস্তু এবং অতিরিক্ত মেদ-চর্বি ইত্যাদি অপসারণ করে শরীরকে ঝরঝরে করে তোলে। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'প্রতিটি বস্তুর জাকাত আছে। আর শরীরের জাকাত হলো রোজা।' (ইবনে মাজাহ : ১৭৪৫)

আল্লার রাসূল ﷺ নিয়ম করে সপ্তাহে দুদিন—সোমবার ও বৃহস্পতিার রোজা রাখতেন। এ ছাড়া প্রত্যেক চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোজা

---

[১] আল হিদায়া ফি শরহি বিদায়াতিল মুবতাদি : খ. ৪, পৃ.-৩০৫

Scanned by CamScanner

রাখতেন তিনি। এই তিনটি রোজাকে বলা হয় আইয়ামে বিজের রোজা। আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন।' (আলবানি, *ইরওয়াউল গালিল* : ১/১০৫)

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> 'প্রতি বৃহস্পতি ও সোমবার আল্লাহ তায়ালার কাছে বান্দার আমলসমূহ পেশ করা হয়। সুতরাং আমার পছন্দ হলো—আমার আমলসমূহ যেন রোজা রাখা অবস্থায় পেশ করা হয়।' (তিরমিজি : ৭৪৭; ইবনে মাজাহ : ১৭৪০)

প্রতি সপ্তাহ ও মাসের এই নিয়মিত রোজার পাশাপাশি বিশেষ বিশেষ মাসে নবিজি অতিরিক্ত সিয়াম পালন করতেন। যেমন : মুহাররম মাসের ১০ তারিখকে ঘিরে তিনি দুটি রোজা রাখতেন। এই ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> 'রমজানের পর সর্বোত্তম রোজা হলো আল্লাহর মাস মুহাররমের রোজা।' (মুসলিম : ১১৬৩)

রমজানের প্রস্তুতি হিসেবে শাবান মাসের প্রায় পুরো সময়জুড়ে নবিজি রোজা রাখতেন। আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'শাবানের তুলনায় অন্য কোনো মাসে আমি তাঁকে এত অধিক হারে রোজা রাখতে দেখিনি। তিনি শাবান মাসের কয়েকদিন ব্যতীত প্রায় পুরো মাসই রোজা রাখতেন।' (মুসলিম : ২৭৭৭)

এ ছাড়া শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছয়টি রোজা রাখতেন। এই ছয়টি রোজা পালন করলে সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব হয়। নিয়মিত এই রোজা রাখার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে প্রশান্তি অর্জনের পাশাপাশি শারীরিকভাবেও ফিট থাকতেন রাসূল ﷺ। আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) বর্ণনা করেন, নবিজি বলেছেন—

> 'যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখল এবং রমজানের পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখল, সে যেন সারা বছর রোজা রাখল।' (মুসলিম : ২৮১৫)

Scanned by CamScanner

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে—রোজার মাধ্যমে মানুষের শরীরের কোষ পরিষ্কার হয়, নতুন করে রিসাইকেল হয় প্রোটিন। রোজা রোগ প্রক্রিয়াকে পূর্বের সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনে; লিভার, ব্রেন ও কোষের মধ্যে জমে থাকা বিষাক্ত ও ক্ষতিকর পদার্থ অপসারণ করে। ফলে রোজাদার ব্যক্তি খুব সহজেই চর্বি ও প্রদাহজনিত বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

৩. কায়িক শ্রম (Physical Work/Excercise)

সুস্থতার জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত হলো—শারীরিক বা কায়িক পরিশ্রম। পরিশ্রম না করলে শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমে। কমে যায় দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। পরিশ্রমহীন শরীরে নানা ধরনের রোগ বাসা বাঁধে সহজেই। তাই সুস্থতার জন্য শারীরিক পরিশ্রমের দিকে অধিকতর গুরুত্বারোপ করেছে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান।

রাসূল ﷺ সব সময় পরিশ্রমের মধ্যে থাকতেন। তিনি মদিনার রাস্তায় হেঁটে হেঁটে মানুষের খোঁজখবর নিতেন, দেখা-সাক্ষাৎ করতেন আত্মীয়স্বজনের সাথে। হাঁটার সময় নবিজি দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটতেন। এতে তাঁর শরীরের ক্যালোরি বা শক্তি ক্ষয় হতো। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন—

> 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে দ্রুত চলতে আর কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি। যেন তাঁর জন্য জমিনকে গোটানো হতো। তাঁর সঙ্গে পথ চলতে আমাদের বেগ পেতে হতো; অথচ তিনি অনায়াসে চলতে পারতেন।' (সহিহ ইবনে হিব্বান : ৬৩০৯)

নবুয়তি ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন শেষে রাসূল ﷺ বাড়িতে এসে স্ত্রীদের রান্নার কাজে সহায়তা করতেন। একবার উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.)-কে প্রশ্ন করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে থাকলে কী করতেন? জবাবে আয়িশা (রা.) বললেন—

> 'তিনি ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং আজান হলে নামাজে চলে যেতেন।' (বুখারি : ৬৭৬)

রাসূল ﷺ সর্বদা নিজের কাজ নিজে করতেন। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.) বলেন—

Scanned by CamScanner

> 'রাসূল ﷺ নিজের কাপড়ের উকুন পরিষ্কার করতেন, বকরির দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করতেন।'
> (মুসনাদে আহমদ : ২৬১৯৪)

অন্য বর্ণনায় বলেন—

> 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কাপড় সেলাই করতেন এবং নিজের জুতা নিজেই ঠিক করতেন।' (সহিহ ইবনে হিব্বান : ৫৬৭৭)

রাসূল ﷺ যুবক বয়সে ব্যাবসা করেছেন। তারও আগে মেষ চরিয়েছেন মরু প্রান্তরে। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, নবিজি বলেছেন—

> 'আল্লাহ তায়ালা এমন কোনো নবি প্রেরণ করেননি, যিনি মেষ চরাননি।' তখন সাহাবিরা প্রশ্ন করেন—'আপনিও?' তিনি বলেন—'হ্যাঁ, আমি কয়েক কিরাতের (মুদ্রা) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম।' (বুখারি : ২১১৯)

মদিনায় হিজরতের পর মসজিদে নববি নির্মাণের সময় রাসূল ﷺ নিজ হাতে মাটি বহন করেছেন, সরাসরি খনন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন খন্দক যুদ্ধে। এ ছাড়াও যুদ্ধের ময়দানে সরাসরি মাঠে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই সমস্ত কর্মকাণ্ড নবিজির কায়িক পরিশ্রমের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত বহন করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু নিজেই পরিশ্রম করতেন না; বরং উম্মতকেও পরিশ্রমী হতে এবং স্বহস্তে উপার্জন করতে তাগিদ দিতেন। তিনি বলেন—

> 'আল্লাহ ওই শ্রমিককে ভালোবাসেন, যে সুন্দরভাবে নিজের কাজ সমাধা করে।' (তিরমিজি : ১৮৯১)
>
> 'নিজের হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম খাবার বা জীবিকা আর নেই। আল্লাহর নবি দাউদ (আ.) স্বহস্তে জীবিকা নির্বাহ করতেন।'
> (বুখারি : ২৭৫৯)

অন্য হাদিসে নবিজি বলেন—

> 'নিশ্চয়ই তোমার ওপর তোমার শরীরের হক রয়েছে।'
> (বুখারি : ৫৭০৩, তিরমিজি : ২৩৫০)

Scanned by CamScanner

৪. পরিমিত ঘুম (Rest & Relax)

সুস্থতার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত ঘুম। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র বলে—একজন মানুষের সুস্থতার জন্য অন্তত ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন। আর ঘুমের জন্য সর্বোত্তম সময় হলো রাত। কথায় আছে—Early to bed and early to rise. রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে ভোর ভোর জেগে ওঠাই অধিকতর উত্তম। এতে রাতভর যেমন আরামে ঘুমানো যায়, তেমনই ভোরের মনোরম পরিবেশেও নিশ্বাস নেওয়া যায় প্রাণভরে। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস খুবই উপকারী।

চিকিৎসাশাস্ত্রের এই মূলনীতি যেন রাসূল ﷺ-এর লাইফস্টাইলেরই প্রতিফলন। রাসূল ﷺ এশার সালাত শেষে ঘুমিয়ে পড়তেন। প্রয়োজন ছাড়া এশার পর কারও সাথে কথাবার্তা বা গল্পগুজব করতেন না। ঘুম থেকে জেগে উঠতেন রাতের শেষ অংশে। এরপর অজু করে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। ফজর পর্যন্ত আবার একটু হালকা ঘুমাতেন (Snap)। ফজরের আজান হলে মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে সালাতে নেতৃত্ব দিতেন। নামাজান্তে দীর্ঘ সময় ধরে তাসবিহ পড়তেন, কুশলাদি বিনিময় করতেন সাহাবিদের সাথে। অতঃপর ইশরাকের সালাত আদায় শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে মদিনার রাস্তায় হাঁটতেন। সবশেষে ঘরে ফিরে স্ত্রীদের সময় দিতেন।

ঘুমানোর ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ আল্লাহ তায়ালার এই নির্দেশনার অনুসরণ করতেন—

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا- وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا- وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا-

'আমি তোমাদের বিশ্রামের জন্য নিদ্রা দিয়েছি। তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছি আবরণস্বরূপ আর দিনকে করেছি তোমাদের জীবিকা আহরণের সময়।' (সূরা নাবা : ৯-১১)

প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ দেরি করে ঘুমানো অপছন্দ করতেন। তিনি কখনোই ফজরের পর ঘুমাতেন না; বরং এই সময়টা ব্যয় করতেন কুরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজকার ও ব্যক্তিগত কাজে। সাহাবিদের ভোরবেলায় কাজ শুরু করতে উৎসাহ দিতেন সব সময়। উৎসাহের অংশ হিসেবে তিনি দুআ করেছেন—

Scanned by CamScanner

'হে আল্লাহ, আমার উম্মাহর জন্য দিনের শুরুকে বরকতময় করুন।' (আবু দাউদ : ২৬০৬)

রাসূল ﷺ কোনো যুদ্ধাভিযানে বাহিনী পাঠালে সাধারণত দিনের শুরুতেই পাঠাতেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন সাহাবির খোঁজখবর নিতেন, তাঁদের দ্বীনের শিক্ষা দিতেন, কারও প্রশ্ন থাকলে উত্তর দিতেন এবং লোকজনের স্বপ্নের তাবির বা ব্যাখ্যা করতেন।

আধুনিক বিজ্ঞান বলে—কাজ করার সর্বোত্তম সময় হলো ভোরবেলা; বিশেষত পড়াশোনার জন্য। এই সময় মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত সতেজ থাকে এবং মানসিক চাপ কাউকে ঘিরে ধরে না; মনোযোগ থাকে একদিকে নিবদ্ধ। ফলে যা-ই পড়া হোক না কেন, স্মৃতিতে গেঁথে যায় সহজেই। সুতরাং ভোরবেলা কোনো কাজ করা হলে তা অন্য সময়ের তুলনায় দ্রুত সম্পন্ন হয়।

৫. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (Hygiene)

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুস্থতার অন্যতম বড়ো হাতিয়ার। তিনি সব সময়ই পরিচ্ছন্ন থাকতেন এবং অন্যকেও পরিচ্ছন্ন থাকার নির্দেশ দিতেন।

পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা দুটি কাছাকাছি বিষয়। ঈমান ও নিয়্যাতের সাথে নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচ্ছন্নতা অর্জনকে পবিত্রতা বলে। সুতরাং পবিত্রতা অর্জন করলেই পরিচ্ছন্নতা অর্জন হয়। রাসূল ﷺ এই পবিত্রতা অর্জনকে ঈমানের অর্ধেক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আবু মালেক হারেস ইবনে আসেম আশআরি (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন—

'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।' (মুসলিম : ২২৩)

পবিত্রতা অর্জনকারীকে আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ۭ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ-

'সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে বেশি ভালোবাসে। আর আল্লাহও পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা তাওবা : ১০৮)

Scanned by CamScanner

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি কর্মনীতি ছিল—যে কাজটির ওপর তিনি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করতে ইচ্ছা করতেন, সেটিকে আল্লাহর ইচ্ছায় ঈমান ও ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত করতেন এবং অনিবার্যভাবেই ফজিলত ঘোষণা করতেন, সেই আমলটির বিপরীতে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারটিও অনুরূপ। এই বিষয়টিকে তিনি এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, একে সাব্যস্ত করেছেন ঈমানের অঙ্গ হিসেবে। শুধু তা-ই নয়, রাসূল ﷺ পবিত্রতাকে নামাজ আদায়ের পূর্বশর্ত হিসেবেও নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং নামাজ কবুলের জন্য একজন মুসলিমকে অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে হবে।

পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম হলো অজু-গোসল ও তায়াম্মুম। অজু-গোসলের জন্য আবার পানি প্রয়োজন। পানি না পাওয়া গেলে বা পানি ব্যবহারে অপারগ হলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে হবে। আর এটি মূলত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্রতা অর্জনের একটি প্রতীকী পদ্ধতি। কঠিন সময়েও যেন বান্দার মধ্যে পবিত্রতা অর্জনের অভ্যাস ও তাড়না বজায় থাকে এবং অন্তরের অস্বস্তিবোধ দূর হয়, সেটা নিশ্চিত করাটাই তায়াম্মুমের প্রধান উদ্দেশ্য।

যে অঙ্গসমূহ সাধারণত উন্মুক্ত থাকে এবং স্বাভাবিক কাজকর্মে আমরা নিয়মিত ব্যবহার করি, অজু করার জন্য শরীরের সে অঙ্গসমূহকেই ধৌত করতে হয়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে—মানুষের অসুস্থ হওয়ার অন্যতম কারণ শরীরে ক্ষতিকর জীবাণুর প্রবেশ। এই জীবাণুগুলো প্রধানত নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মানুষের হাতে, আঙুল ও নখের ফাঁকে জীবাণু আটকে থাকে। খাবার গ্রহণ বা অন্য কোনো কারণে মুখে হাত দেওয়ার সময় এগুলো দেহাভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। এই জন্য চিকিৎসকগণ সর্বদা হাত ও বাহ্যিক অঙ্গসমূহ পরিষ্কার রাখার পরামর্শ দেন।

অজুর মাধ্যমে এই পরিষ্কারের কাজটি সম্পন্ন হয়। কারণ, অজুর জন্য প্রথমে হাতের কবজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করতে হয়। আঙুলের ফাঁকগুলো খিলাল করতে হয় ভালোভাবে। এরপর তিনবার ধৌত করতে হয় হাতের কনুই পর্যন্ত। এতে হাতে জমে থাকা জীবাণু ধ্বংস হয়। পরবর্তী ধাপে তিনবার গড়গড়ার সাথে কুলি করার মাধ্যমে মুখগহ্বরে জমে থাকা জীবাণুগুলোও অপসারিত হয়ে যায়।

নিশ্বাসের সাথে কিছু ময়লা আমাদের নাকে জমে থাকে। এ ছাড়া বাইরের ধুলোবালি শরীরের ভেতরে ঢুকে ফুসফুসসহ বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ অঙ্গকে আক্রান্ত করে। অজু করার জন্য একজন ব্যক্তিকে নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত

Scanned by CamScanner

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি কর্মনীতি ছিল—যে কাজটির ওপর তিনি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করতে ইচ্ছা করতেন, সেটিকে আল্লাহর ইচ্ছায় ঈমান ও ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত করতেন এবং অনিবার্যভাবেই ফজিলত ঘোষণা করতেন, সেই আমলটির বিপরীতে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারটিও অনুরূপ। এই বিষয়টিকে তিনি এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, একে সাব্যস্ত করেছেন ঈমানের অঙ্গ হিসেবে। শুধু তা-ই নয়, রাসূল ﷺ পবিত্রতাকে নামাজ আদায়ের পূর্বশর্ত হিসেবেও নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং নামাজ কবুলের জন্য একজন মুসলিমকে অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে হবে।

পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম হলো অজু-গোসল ও তায়াম্মুম। অজু-গোসলের জন্য আবার পানি প্রয়োজন। পানি না পাওয়া গেলে বা পানি ব্যবহারে অপারগ হলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে হবে। আর এটি মূলত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্রতা অর্জনের একটি প্রতীকী পদ্ধতি। কঠিন সময়েও যেন বান্দার মধ্যে পবিত্রতা অর্জনের অভ্যাস ও তাড়না বজায় থাকে এবং অন্তরের অস্বস্তিবোধ দূর হয়, সেটা নিশ্চিত করাটাই তায়াম্মুমের প্রধান উদ্দেশ্য।

যে অঙ্গসমূহ সাধারণত উন্মুক্ত থাকে এবং স্বাভাবিক কাজকর্মে আমরা নিয়মিত ব্যবহার করি, অজু করার জন্য শরীরের সে অঙ্গসমূহকেই ধৌত করতে হয়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে—মানুষের অসুস্থ হওয়ার অন্যতম কারণ শরীরে ক্ষতিকর জীবাণুর প্রবেশ। এই জীবাণুগুলো প্রধানত নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মানুষের হাতে, আঙুল ও নখের ফাঁকে জীবাণু আটকে থাকে। খাবার গ্রহণ বা অন্য কোনো কারণে মুখে হাত দেওয়ার সময় এগুলো দেহাভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। এই জন্য চিকিৎসকগণ সর্বদা হাত ও বাহ্যিক অঙ্গসমূহ পরিষ্কার রাখার পরামর্শ দেন।

অজুর মাধ্যমে এই পরিষ্কারের কাজটি সম্পন্ন হয়। কারণ, অজুর জন্য প্রথমে হাতের কবজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করতে হয়। আঙুলের ফাঁকগুলো খিলাল করতে হয় ভালোভাবে। এরপর তিনবার ধৌত করতে হয় হাতের কনুই পর্যন্ত। এতে হাতে জমে থাকা জীবাণু ধ্বংস হয়। পরবর্তী ধাপে তিনবার গড়গড়ার সাথে কুলি করার মাধ্যমে মুখগহ্বরে জমে থাকা জীবাণুগুলোও অপসারিত হয়ে যায়।

নিশ্বাসের সাথে কিছু ময়লা আমাদের নাকে জমে থাকে। এ ছাড়া বাইরের ধুলোবালি শরীরের ভেতরে ঢুকে ফুসফুসসহ বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ অঙ্গকে আক্রান্ত করে। অজু করার জন্য একজন ব্যক্তিকে নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত

Scanned by CamScanner

ভালো করে তিনবার পানি পৌছাতে হয়। এতে নাকে জমে থাকা সমস্ত ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়। এভাবে অজুর মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি সর্বোত্তম উপায়ে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে।

রাসূল ﷺ সার্বক্ষণিক অজু অবস্থায় থাকতেন এবং প্রত্যেক সালাতের পূর্বে নতুন করে অজু করতেন। উম্মতকেও তিনি প্রতি সালাতের পূর্বে অজু করতে উৎসাহ দিতেন, যাতে তারা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে সর্বাবস্থায়। অজুকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি একে অবিহিত করেছেন সালাতের চাবি হিসেবে। বলেছেন—

> 'সালাত বেহেশতের চাবি; আর অজু (পবিত্রতা) সালাতের চাবি।' (তিরমিজি : ৪)

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জনের দ্বিতীয় মাধ্যম গোসল। রাসূল ﷺ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অংশ হিসেবে গোসল করতেন এবং উম্মতকেও উৎসাহ দিতেন। কিছু ক্ষেত্রে গোসলকে তিনি বাধ্যতামূলক করেছেন। যেমন : দাম্পত্যজীবনে শারীরিক মিলনের পর এবং নারীদের ঋতুকালীন অবস্থা শেষ হওয়া পর গোসল করা ফরজ। আর স্বাভাবিক সময়ে প্রতিদিন গোসল করা মুস্তাহাব। নিদেনপক্ষে প্রত্যেকে যেন সপ্তাহে অন্তত একবার গোসল করে, তা নিশ্চিতের জন্য নবিজি জুমার দিন গোসল করার প্রতি অধিক জোর দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> 'সব মুসলমানের ওপর আল্লাহর অধিকার হলো—প্রতি সপ্তাহে সে গোসল করবে এবং মাথা ও শরীর ধুয়ে নেবে।' (বুখারি : ৮৯৭)

আবু হুরায়রা (রা.)-এর অন্য বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেন—

> 'আল্লাহ তায়ালার জন্য প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হলো (অন্তত) প্রতি সাত দিনের মাথায় নিজের মাথা ও শরীর ধৌত করা।' (বুখারি : ৮৯৭, মুসলিম : ৮৪৯)

আবু সাইদ খুদরি (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'জুমার দিন গোসল করা প্রতিটি সাবালক ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব।' (বুখারি : ৪৭৯)

অজু-গোসলের বাইরেও রাসূল ﷺ শরীরের নিয়মিত পরিচ্ছন্নতার দিকে যত্নশীল ছিলেন। তিনি মুখের পরিচ্ছন্নতার ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করতেন;

Scanned by CamScanner

দিনের কার্জক্রম শুরু করতেন মেসওয়াক করার মধ্য দিয়ে। যেকোনো সোশ্যাল ইন্টারেকশন এমনকী স্ত্রীদের কাছে যাওয়ার আগেও মেসওয়াক করতেন। বাইরে থেকে ঘরে প্রবেশ করেই প্রথমে মেসওয়াক করে নিতেন। হুজাইফা (রা.) বলেন—

> 'রাসূল ﷺ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে মেসওয়াক করতেন।'
> (আবু দাউদ : ৫৭)

শুধু ভোরেই নয়, নবিজি প্রতি সালাতের পূর্বে দৈনিক পাঁচবার মেসওয়াক করতেন। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন—

> 'আমার উম্মতের ওপর যদি কষ্টসাধ্য না হতো, তাহলে প্রত্যেক নামাজের অজুর সঙ্গে মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।'
> (মুসলিম : ৪৮২)

উম্মাহকে মেসওয়াকের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য রাসূল ﷺ মেসওয়াককে 'মুখের জন্য পবিত্রতা' বলে ঈমানি পরিভাষায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। একই সঙ্গে একে ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম বলে। তিনি বলেন—

> 'মেসওয়াক মুখের জন্য পবিত্রতা এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।' (নাসায়ি : ৫)

এর বাইরে নবিজি প্রতি সপ্তাহান্তে বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবার হাত-পায়ের নখ কাটতেন এবং গোঁফ ছোটো করতেন। বগল ও নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করতেন ৪০ দিন অতিবাহিত হওয়ার আগেই। পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-দুয়ার ও পরিবেশের পরিচ্ছন্নতার প্রতিও নবিজি ছিলেন অত্যন্ত যত্নশীল। এ ব্যাপারে তিনি মানুষকে সর্বক্ষণ সচেতন করতেন। বলতেন—

> 'তোমাদের বাড়ির আঙিনার চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখ। ইহুদিদের অনুকরণ করো না। কেননা, ইহুদিরা তাদের বাড়ির আঙিনা পরিষ্কার করে না। তারা বাড়িতে আবর্জনা জমা করে রাখে।' (মাজমাউজ-জাওয়াইদ : ১/২৮৬)

আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন—

> 'রাসূলুল্লাহ ﷺ পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করতে এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।' (আবু দাউদ : ৪৫৫)

Scanned by CamScanner

মন প্রফুল্ল রাখার জন্য রাসূল ﷺ নিয়মিত সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। হাতের তালুতে ও চুলের সিঁথির মাঝখানে এই সুগন্ধি লাগাতেন। ফলে যারাই রাসূল ﷺ-এর সাথে মুসাফাহা করতেন, তাদের প্রত্যেকের হাতে আতরের ঘ্রাণ লেগে থাকত। রাসূল ﷺ-এর শরীর থেকে দুর্গন্ধ পেয়েছেন, মর্মে কেউ কোনোদিন অভিযোগ করতে পারেননি। কেননা, তাঁর ঘাম মোবারক থেকেও আল্লাহ প্রদত্ত সুগন্ধ ছড়াত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এসব অনুশীলন থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে তিনি কতটা গুরুত্ব দিতেন।

৬. মানসিক ক্রিয়া (Means of Mental Peace)

সুস্থতার জন্য শারীরিক ক্রিয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই মানসিক ক্রিয়াও অত্যন্ত জরুরি। মূলত সুস্থতা বলতে শরীর-মন উভয়ের সুস্থতাকেই বোঝায়। অতিরিক্ত বিষণ্নতা ও দুশ্চিন্তা মনে বাড়তি চাপ তৈরি করে। ফলে শরীরে বাসা বাঁধে নানাবিধ রোগব্যাধি। যেমন : মারাত্মক মাথাব্যথা, হার্টের সমস্যা ইত্যাদি। তাই সুস্থতার জন্য দুশ্চিন্তামুক্ত ও প্রফুল্ল থাকা, মনকে সর্বদা ইতিবাচক ভাবনায় নিয়োজিত রাখার গুরুত্ব অপরিসীম। এ ছাড়া প্রতিদিন কিছু সময় নিজেকে নির্দিষ্ট ধ্যানে মগ্ন রাখাও জরুরি। এগুলো অতিরিক্ত চাপ কমিয়ে মনকে রাখে সতেজ ও চাপমুক্ত।

রাসূল ﷺ সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল মেজাজে থাকতেন, মিষ্টি হেসে কথা বলতেন সবার সাথে। কারও সাথে দেখা হওয়ামাত্রই চারিত্রিক মুগ্ধতার গুণে কাছে টেনে নিতেন। খুব সহজেই মানুষকে আপন করে নেওয়ার এক সম্মোহনী ক্ষমতা ছিল তাঁর।

রাসূল ﷺ মানসিক শক্তিতে ছিলেন পাহাড়ের মতো অটল। হতাশা-অনিশ্চয়তা তাঁকে আক্রান্ত করতে পারত না কখনোই; বরং তাঁর সাথে কথা বলে মনকে প্রশান্ত করত সবাই। তাঁর কাছেই মানুষ দুঃখ-বেদনার অনল নিবারণ করত, হতাশা ভুলে গিয়ে উজ্জীবিত হতো নতুন স্বপ্নের উদ্দীপনায়। নবিজির এই মানসিক সুস্থতা ও শক্তির পেছনে যেসব কর্ম প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে, সেগুলো হলো—

সালাত : সালাত হলো মনকে দুনিয়ার সমস্ত ব্যস্ততা থেকে মুক্ত করে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন রাখার ঐশী পন্থা, আল্লাহর সাথে কথোপকথনের

Scanned by CamScanner

আনুষ্ঠানিক আয়োজন। সালাত আদায়কারী বিশ্বাস করেন—আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছি এবং আল্লাহ আমাকে দেখছেন। এই ভাবনা তার মনকে তৎক্ষণাৎ যাবতীয় দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করে, হৃদয়ে সঞ্চার করে ইলাহি দিদারের সম্ভ্রান্ত অনুভূতি।

সালাত আদায়কারী সালাতে কিরাত পড়ার সময় ভাবেন—আমি আল্লাহর বাণী তিলাওয়াত করছি এবং তাঁর কাছেই প্রার্থনা করছি। আর পরম করুণাময় রব আমার কথা শুনছেন এবং জবাব দিচ্ছেন। শুধু এই ভাবনাই মন থেকে যাবতীয় অনিশ্চয়তা, হতাশা ও একাকিত্ব দূর করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। মুমিন তখন অনুভব করে—মহান মালিক আমার আরজি শুনেছেন। সুতরাং আর চিন্তা কীসের?

নামাজ মুমিনের জন্য অপরিহার্য ইবাদত। দিনে পাঁচবার সালাত আদায় করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরজ। রাসূল ﷺ এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বাইরেও অতিরিক্ত নফল সালাত আদায় করতেন, তাহাজ্জুদে রত হতেন রাতের শেষ ভাগে। দীর্ঘক্ষণ ধরে সিজদায় পড়ে থাকতেন। মন খুলে কথা বলতেন রবের সাথে। ফলে তিনি মানসিক দিক থেকে থাকতেন অবিচল, প্রশান্ত ও প্রফুল্ল।

দুআ ও জিকির : দুআ ও জিকির মনকে আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত রাখে। ফলে মন থাকে নির্ভার-নিশ্চিন্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوۡبُهُمۡ بِذِكۡرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكۡرِ اللّٰهِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ-

> 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রাখো! আল্লাহর জিকির দ্বারা অন্তরে স্থিরতা ও শান্তি আসে।' (সূরা রা'দ : ২৮)

রাসূল ﷺ সর্বক্ষণ দুআ ও জিকিরে রত থাকতেন। ফলে তাঁর মন ও মননে সর্বদা প্রবাহিত হতো প্রশান্তির সুবাতাস। এই সুবাতাস বয়ে আনত চিন্তার পরিশুদ্ধতা। কখনো দুঃখ-কষ্ট দ্বারা সাময়িক আক্রান্ত হলে সাথে সাথেই তিনি সালাত, দুআ ও জিকিরে মগ্ন হতেন। মন থেকে অনুভব করতেন—এক মহাশক্তিধর সত্তার সাথে আমি সংযুক্ত। তিনি আমার সার্বক্ষণিক অবস্থান, পরিস্থিতি এবং প্রয়োজন পর্যবেক্ষণ করছেন। আমার গোপন ও

Scanned by CamScanner

প্রকাশ্য সবই তাঁর জানা। তিনি ছাড়া আমাকে সাহায্যের জন্য আর দ্বিতীয় কেউ নেই। অন্তর্গত এই চিন্তা ও অনুভূতি সব সময় রাসূল ﷺ-কে চাঙা রাখত। ফলে কঠিন বিপদের মুহূর্তেও তিনি থাকতেন নির্ভার ও অবিচল। আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো দুঃখ-কষ্ট কিংবা চিন্তা-অস্থিরতায় পতিত হলে বলতেন—

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ, أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ
إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ-

'হে চিরঞ্জীব-অবিনশ্বর! আমি তোমার কাছে রহমতপূর্ণ সাহায্য প্রার্থনা করছি। তুমি আমার যাবতীয় বিষয় ঠিক করে দাও। আর চোখের পলকের জন্যও আমাকে আমার হাতের সোপর্দ করে দিয়ো না।' (মুসতাদরাকে হাকিম : ৫৪৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ চিন্তা ও পেরেশানির সময় নিচের দুআটি বেশি বেশি পড়তেন—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ, وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ,
وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ, وَضَلَعِ الدَّيْنِ, وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ-

'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই—দুশ্চিন্তা, পেরেশানি, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণভার ও মানুষের প্রভাবাধীন হওয়া থেকে।' (বুখারি : ৬৩৬৯)

কবর জিয়ারত : কবর জিয়ারতে মনের অস্থিরতা ও অশান্তি দূর হয়, অন্তরে কৃতজ্ঞতা জন্মায় আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি। যারা কবরে শায়িত আছে, তাদের তুলনায় নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে হয়। স্মরণ হয় নিজের অনিবার্য পরিণতি মৃত্যুর কথা। ফলে মন থেকে লোভ-লালসা, অতৃপ্তি, হিংসা-অহংকারের যাবতীয় অশান্তি দূরীভূত হয়ে যায়। এজন্য বিশ্বনবি ﷺ ঘনঘন কবর জিয়ারত করতেন। মাঝেমধ্যেই তিনি রাতের বেলা একাকী এসে জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে শায়িত লোকদের মাগফিরাতের জন্য দুআ করতেন। আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা সেদিকেই ইঙ্গিত দেয়। হাদিসে বলা হয়েছে—

'রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাতে আয়িশা (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। গভীর রাতে উঠে তিনি বাকী কবরস্থানে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে দুআ করতে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে

Scanned by CamScanner

না পেয়ে আয়িশা (রা.) খুঁজতে বের হলেন এবং অবশেষে বাকী কবরস্থানে দুআরত অবস্থায় দেখতে পেলেন তাঁকে। আয়িশা (রা.) এ বিষয়ে জানতে চাইলে মহানবি ﷺ জানালেন—"জিবরাইল (আ.) আমাকে বললেন, আপনার রব হুকুম করছেন, যেন আপনি বাকীবাসীদের কাছে যান এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করেন।"' (মুসলিম : ৯৭৩)

অন্য হাদিসে আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন—

'রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষ রাতে জান্নাতুল বাকীর দিকে বেরিয়ে যেতেন এবং বলতেন—"হে (কবরের) মুমিন সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের নিকট তা এসেছে, যার ব্যাপারে তোমাদের ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। কাল কিয়ামত পর্যন্ত তোমরা অবশিষ্ট থাকবে এবং নিশ্চয় আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব, ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ! তুমি বাকিউল গারদবাসীদের ক্ষমা করে দাও।"' (মুসলিম : ৫৮১)

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন—

'তোমরা কবর জিয়ারত করো। কেননা, তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।' (মুসলিম : ৯৭৭)

অসুস্থদের পরিদর্শন : অসুস্থ লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করলেও মন থেকে অহংকার ও অতৃপ্তি দূর হয়। পাশাপাশি নিজের সুস্থতার কথা উপলব্ধ হয়ে আল্লাহ তায়ালার প্রতি শুকরিয়াবোধ বাড়ে। আর নিঃসন্দেহে মানসিক অসুস্থতার অন্যতম কারণ—অহংকার, অতৃপ্তি ও অকৃতজ্ঞতা। তা ছাড়া অসুস্থকে দেখতে যাওয়ার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় হয়। এজন্য রাসূল ﷺ নিয়মিত রোগীদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং অন্যদেরও উৎসাহ দিতেন; এমনকী অসুস্থদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাদের সেবা-শুশ্রূষার বিপরীতে নানা ধরেনের ফজিলত বা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন তিনি। বলেছেন—

'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোনো অসুস্থ মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, জাহান্নাম থেকে ৬০ বছরের দূরত্বে রাখা হবে তাকে।' (আবু দাউদ : ৩০৯৭)

Scanned by CamScanner

রোগীকে পূর্ণ শুশ্রূষার সুযোগ না থাকলে মুমিন যেন অন্তত মাথায় বা কপালে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়, সেদিকে গুরুত্ব দিয়ে রাসূল ﷺ বলেন—

> 'শুশ্রূষার পূর্ণতা হলো রোগীর কপালে বা শরীরে হাত রেখে জিজ্ঞেস করা, "কেমন আছেন?" এবং এভাবে বলা—"ভয় নেই, আল্লাহর মেহেরবানিতে আরোগ্যলাভ করবেন, ইনশাআল্লাহ।"'
> (তিরমিজি : ৩৩৪, বুখারি : ৫৬৬২)

সাদামাটা জীবনযাপন : হাদিসের নানা অধ্যায়ে ও সিরাতগ্রন্থগুলোর পাতায় পাতায় আমরা জেনেছি, রাসূল ﷺ অত্যন্ত সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। যে জীবনে ছিল না সম্পদের প্রাচুর্যতা, বিলাসিতার ছিটেফোঁটা; ছিল না কোনো অপব্যয় কিংবা অপচয়। সম্পদের প্রতি তিনি ছিলেন শতভাগ নির্মোহ। মাঝে মাঝে মাদুরের চাটাইয়ের ওপরও ঘুমাতেন। চাটাইয়ের দাগ পড়ত তাঁর পিঠে। তিনি বালি আর কাদামাটির ওপর সিজদা দিয়েছেন অহরহ।

খাবারের অভাবে কখনো কখনো অভুক্ত থেকেছেন। খাবার নিয়ে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না কখনোই। নিমন্ত্রণ পেলে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার দাওয়াতই কবুল করতেন। কেউ উপহার দিলেও তা সানন্দে গ্রহণ করতেন। সামর্থ্যানুযায়ী অন্যকে উপহারও দিতেন। মুক্তহস্তে দান করতেন অভাবী-অসহায়দের। যেকোনো ব্যাপার সহজ করে বলতেন, সবার সাথে মিশতে পারতেন প্রাণবন্তভাবে। এভাবেই নিরহংকারী সাদামাটা জীবনযাপন করতেন তিনি।

হিংসা-বিদ্বেষ ও গিবত থেকে দূরে থাকা : রাসূল ﷺ বলেছেন—'হিংসা ও গিবত মানুষের মানসিক অশান্তির কারণ।' কেউ যখন হিংসা করে, তখন তার ভেতরে অন্যের ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করার একটা প্রবণতা তৈরি হয়। ফলে তার ভেতরে জন্ম নেয় অস্থিরতা। এই অস্থিরতা মন থেকে সংক্রমিত হয় সমগ্র শরীরে। গিবতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাই রাসূল ﷺ হিংসা থেকে দূরে থাকতেন এবং উম্মাহকে হিংসা থেকে বিরত থাকতে বলতেন কঠোরভাবে। অন্যকে নিয়ে পড়ে না থেকে সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী হতে রাসূল ﷺ সব সময় উৎসাহ দিতেন। বলতেন—'দ্বীন হচ্ছে নাসিহা বা অন্যের কল্যাণ কামনা করা।'

হিংসা একটি সুন্দর সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করে। পরিবারের মধ্যে ডেকে আনে অহেতুক বিশৃঙ্খলা। আমরা অনেকেই আমাদের জীবনের একটা

Scanned by CamScanner

উল্লেখযোগ্য সময় কাটিয়ে দিই অন্যকে হিংসা করতে করতে। এটা নিছক বোকামি বই কিছুই নয়। সুতরাং অন্যের সফলতাকে গ্রহণ করার মানসিকতা অর্জন করুন, নিজের সুখ অনুসন্ধান করুন অন্যের কল্যাণ কামনায়। অন্যের জন্য দুআ করলে সেটা আপনার জন্যও কাজে লাগবে। কারণ, কারও অনুপস্থিতিতে তার জন্য দুআ করলে, আল্লাহর ফেরেশতারা বলতে থাকে—'তোমার জন্যও অনুরূপ।'

অন্যের ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করা থেকে রাসূল ﷺ সাহাবিদের সাবধান করতেন। অন্যকে কাঠগড়ায় দাঁড় করা কিংবা কারও পিছু লেগে থাকা থেকে রাসূল ﷺ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতেন সব সময়। ফলে রাসূল ﷺ-এর জীবন ছিল হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত ও নির্ভার। এগুলোই ছিল তাঁর ভালো ও সুস্থ থাকার লাইফ হ্যাকস।

উপরিউক্ত জীবনকৌশলসমূহ সার্বিকভাবে সমন্বয় করলে এটা স্পষ্ট হয়, সুস্থতার জন্য রাসূল ﷺ-এর কর্মপন্থা ছিল পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন। এগুলো অনুসরণ করলে একজন মুসলিম তো বটেই; এমনকী অমুসলিমরাও একটি স্বাস্থ্যকর জীবন উপভোগ করতে পারেন। রাসূল ﷺ-এর নীতি ও কর্মপন্থা শুধু মুসলিমদের জন্যই উপকারী নয়; বরং সমগ্র মানবজাতির জন্যই অনন্য সমাধান। কারণ, তিনি তো শুধু মুসলিমদের পথ দেখাতে বা আলোকিত করতে আসেননি; এসেছেন গোটা বিশ্ববাসীকে আলোকিত করতে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন—

وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ-

'আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য শুধু রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।' (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

Scanned by CamScanner

দেহাবরণ

পরিবার মানুষের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র বন্ধনের মধ্য দিয়েই এর সূচনা। এই বন্ধন সুদৃঢ় হলে দাম্পত্য সম্পর্কে প্রবাহিত হয় প্রশান্তির নির্মল বাতাস, পরিবার পরিণত হয় শান্তির নীড়ে। অন্যদিকে এই বন্ধন ঢিলে হলে পুরো পরিবারই এলোমেলো হয়ে যায়। তাই দাম্পত্যজীবনকে প্রশান্তিদায়ক ও উপভোগ্য রাখার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেছে ইসলাম। দাম্পত্য সম্পর্কের জন্য ইসলাম এমন সব নীতিমালা উপহার দিয়েছে, যার পূর্ণ অনুসরণে স্বামী-স্ত্রী দুজনের সম্পর্ক হয়ে উঠবে গভীর ও হৃদ্যতাপূর্ণ।

স্বামী-স্ত্রী একটি অঙ্কুরিত চারাগাছের জোড়া পল্লবের মতো; যার অস্তিত্ব ভিন্ন, কিন্তু মূল এক ও অভিন্ন। এই দুই কিশলয়ের ঘনিষ্ঠ যাত্রায় একদিন তা পরিণত হয় শত পল্লববিশিষ্ট বৃহৎ বৃক্ষে। একসময় তার ঘন ছায়ায় আশ্রয় নেয় পরবর্তী প্রজন্মের খালিদ, উমর ও সুমাইয়ারা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ-

‘তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।’
(সূরা রূম : ২১)

Scanned by CamScanner

الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا-

'তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর সেই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া।' (সূরা নিসা : ১)

মানবেতিহাসের প্রথম নারী হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল তাঁর স্বামী আদম (আ.)-এর পাঁজরের হাড় থেকে। অর্থাৎ, সৃষ্টিসূত্রেই তাঁরা একে অপরের দেহাংশ। এজন্যই স্ত্রীকে বলা হয় অর্ধাঙ্গিনী, আর স্বামীকে অর্ধাঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে জীবনসঙ্গিনীকে ছাড়া একজন ব্যক্তির দ্বীনও অপূর্ণ থেকে যায়। রাসূল ﷺ বলেছেন—

'বান্দা যখন বিবাহ করে, তখন সে নিজের অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে। অতএব, বাকি অর্ধেকাংশে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।' (আল জামিউস-সগির : ৬১৪৮)

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এতটাই নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ যে, এর উপমায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে বলেন—

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ-

'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরাও তাদের পোশাক।' (সূরা বাকারা : ১৮৬)

সুবহানাল্লাহ! এর চেয়ে সুন্দর ও যৌক্তিক উপমা আর কী হতে পারে! এটি শুধু স্বামী-স্ত্রীর সৌন্দর্যকেই প্রকাশ করে না; বরং তাদের অন্তরঙ্গতা, অপরিহার্যতা, গুরুত্ব, দায়িত্ব ইত্যাদিকেও ফুটিয়ে তোলে চমৎকারভাবে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য ঠিক কেন পোশাকের মতোই অপরিহার্য অনুষঙ্গ, পোশাকের গুণাবলি ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করলেই সেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

সৌন্দর্যবর্ধনকারী : পোশাক মানুষের সৌন্দর্যবর্ধন করে, ব্যক্তির রুচিবোধ ও চারিত্রিক মর্যাদাকে ফুটিয়ে তোলে সকলের সামনে। একইভাবে যোগ্য দাম্পত্যসঙ্গী জীবনে এনে দিতে পারে বর্ণিল রঙের ছটা। ভালোবাসার আবিরে রাঙিয়ে দেয় হৃদয়ের জমিন। সঙ্গিনী যোগ্য, কর্মঠ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও পরহেজগার হলে অন্যের নিকট তার মর্যাদা বেড়ে যায় বহুগুণে। সঙ্গীর হৃদয়ে প্রবাহিত হয় সুখানুভূতির মৃদুমন্দ হাওয়া। আর মনের এই সৌন্দর্যই একসময় প্রতিফলিত হয় তার চিন্তা ও কর্মে।

Scanned by CamScanner

নিকটতম বস্তু : পোশাক মানুষের সবচেয়ে কাছের বস্তু। সর্বদা শরীরের সাথে লেগে থাকায় দেহ আর পোশাকের মধ্যে কোনো আড়াল বা পর্দা অবশিষ্ট থাকে না। পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, মানুষ চেষ্টা করে নিজেকে সর্বদা পোশাকের সাথে জড়িয়ে রাখতে। অসাবধানতায় পোশাক আপন জায়গা থেকে সরে গেলে তা ঠিক করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যায়। আদর্শ স্বামী-স্ত্রীও অনুরূপ। তারা পরস্পরের সবচেয়ে নিকটজন। উভয়ের মাঝে নেই কোনো পর্দা, নেই কোনো ব্যবধান। শত বাধা-বিপত্তি মাড়িয়ে তারা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে থাকে। বেখেয়ালে যদি কখনো দূরত্ব তৈরি হয়েই যায়, গোচর হওয়ামাত্রই সঙ্গীকে কাছে টেনে নেয় পরম আদরে। বেঁধে নেয় ভালোবাসার মিষ্টি-মধুর অনুরাগে।

দুর্বলতা আচ্ছাদনকারী : পোশাক মানুষের যাবতীয় অসুন্দর ও কুৎসিত রূপ ঢেকে রাখে। গোপন রাখে দৃশ্যমান সকল শারীরিক দুর্বলতা। নিশ্চিত করে লজ্জাস্থানের নিরাপত্তা। স্বামী-স্ত্রীর জন্যও অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তারা পরস্পরের যাবতীয় গোপনীয়তাকে রক্ষা করবে। দোষত্রুটি ঢেকে রাখবে। সঙ্গীর রূপ-সৌন্দর্য অপরের নিকট বলে বেড়ানো থেকে বিরত রাখবে নিজেকে। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে এটা জঘন্য অপরাধ। রাসূল ﷺ বলেন—

> ‘কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়ো খেয়ানতকারী ও নিকৃষ্টতম বিবেচিত হবে ওই ব্যক্তি, যে নিজ স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর স্ত্রীর গোপনীয়তা অন্যের নিকট ফাঁস করে দেয়।’ (মুসলিম : ১৪৩৭)

আদর্শ যুগল আপন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর চারিত্রিক দুর্বলতাকে গোপন রাখবে এবং আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে তা শুধরে ফেলার। একই সঙ্গে বৈধ উপায়ে একে অন্যের যাবতীয় চাহিদা মিটিয়ে লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত রাখবে সকল প্রকার পাপাচার থেকে।

ক্ষতিকর বস্তু থেকে হেফাজতকারী : পোশাক মানুষকে বাইরের বিভিন্ন ক্ষতিকর বস্তু থেকে রক্ষা করে। দেহকে পরিচ্ছন্ন রাখে ধুলো-বালি-ময়লা থেকে। ঠান্ডা আবহাওয়ায় উষ্ণতা দেয়, প্রখর খরতাপে দেয় সুরক্ষা। একইভাবে স্বামী-স্ত্রীও আপন সঙ্গীকে চোখের পাপ থেকে হেফাজতে রাখে। নফসের লাগাম টেনে দমন করে কুপ্রবৃত্তির অদম্য চাহিদা।

Scanned by CamScanner

ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক : পোশাক অনেক সময় ব্যক্তির জাতীয় ও পেশাগত পরিচয় বহন করে। পোশাকের ধরন দেখলেই টের পাওয়া যায়, ব্যক্তি কোন পেশা ও ধর্মকে ধারণ করে। যেমন : ইউনিফর্ম দেখলেই বোঝা যায়—ব্যক্তি ডাক্তার, আইনজীবী, পুলিশ নাকি আলিম। পোশাক ব্যক্তির পরিচয় ও মর্যাদা সম্পর্কে অন্যের নিকট সুস্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দেয়। দম্পতি যুগলের অবস্থাও অনুরূপ। তারা পরস্পরের পরিচয় ও ইজ্জতের প্রতিনিধিত্ব করে। স্ত্রীর নেতিবাচক গুণ বা আচরণের কারণে স্বামীর সম্মানহানি হয়; আবার স্বামীর মন্দ কর্মকাণ্ড আঁচড় ফেলে স্ত্রীর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বে। অনুরূপ একজনের মহৎ গুণ ও সাফল্যে দুজনেরই মুখ উজ্জ্বল হয়।

পর্দার বিধান নাজিলের পূর্বে রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ কখনো কখনো মদিনার আর দশজন সাধারণ মহিলার মতোই ঘরের পোশাকে বাইরে বের হতেন; কিন্তু রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদের জন্য এটা মোটেই মানানসই ছিল না। ফলে আল্লাহ তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন—'তোমরা রাসূলের স্ত্রী। সাধারণ নারীদের মতো এভাবে বের হওয়া তোমাদের মর্যাদার বিপরীত।' পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا- وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى-

'হে নবির স্ত্রীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও। যদি আল্লাহকে ভয় করে থাকো, তাহলে তোমরা কোমল স্বরে কথা বলো না, যাতে অন্তরে ব্যাধি রয়েছে—এমন কোনো ব্যক্তি প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে; বরং পরিষ্কার, সোজা ও স্বাভাবিকভাবে কথা বলো। নিজেদের গৃহের মধ্যে অবস্থান করো এবং পূর্বের জাহেলি যুগের মতো সাজসজ্জা দেখিয়ে বেড়িয়ো না।'
(সূরা আহজাব : ৩২-৩৩)

মানুষ স্বভাবতই প্রত্যাশা করে, ব্যক্তির মর্যাদা তার সঙ্গিনী বা সঙ্গীর ওপরও পড়ুক। তাই দম্পত্তির কর্তব্য হলো—পরস্পরের উত্তম গুণাবলি ও মর্যাদা রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট থাকা।

Scanned by CamScanner

পোশাকের মর্যাদা

আল্লাহ তায়ালা স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের পোশাক বলে অবিহিত করেছেন। তিনি বলেননি কেবল স্বামীর পোশাক স্ত্রী কিংবা স্ত্রীর পোশাক স্বামী; বরং বলেছেন, দুজনই দুজনের একান্ত ভূষণ। কেননা, পোশাক যেমন মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, তেমনই স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মর্যাদা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে তাদের পারস্পরিক কর্মকাণ্ড।

পৃথিবীর যত মানুষ বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশের পেছনেই রয়েছে জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীর অবদান; হোক সে প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন। রাসূল ﷺ-এর নবুয়তের কঠিন দায়িত্ব পালনে যে মানুষগুলো পাশে থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন—উম্মুল মুমিনিন খাদিজা, আয়িশা ও উম্মে সালামা (রা.)সহ তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ। খাদিজা (রা.) নিজের সমস্ত সম্পত্তি স্বামীর মহান দায়িত্ব পালনে অর্পণ করেছেন; কাছে থেকে সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন আজীবন। স্বামীর জন্য নিয়মিত খাবার বহন করে নিয়ে গেছেন প্রায় দুই হাজার ফুট উঁচু হেরা পর্বতের গুহায়। প্রথম ওহি নাজিলের সময় নবিজি নিজেই যখন ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, এই মহীয়সী নারীই তখন সাহসের মশাল জ্বেলে স্বামীকে বলেছিলেন—

> 'আপনি বিচলিত হবেন না। আল্লাহ কখনোই আপনাকে অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনের চেষ্টা করেন। অসহায়দের আশ্রয় প্রদান করেন। মেহমানদের আদর-আপ্যায়ন করেন এবং ঋণগ্রস্তদের ঋণ মোচনে সাহায্য করেন। নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবেন না।' (বুখারি : ৬৯৮২)

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আপাত পরাজয় বিবেচনায় সাহাবিদের মন যখন বিষাদের কালো মেঘে আচ্ছন্ন, তখন রাসূল ﷺ প্রত্যেককে বললেন মাথা মুণ্ডন করতে; কিন্তু কেউ-ই সম্মত হতে পারছিলেন না তাতে। এমন থমথমে ও গম্ভীর পরিবেশে আম্মাজান উম্মে সালামা (রা.) রাসূল ﷺ-কে পরামর্শ দিলেন—'আপনি নিজে আগে মাথা মুণ্ডন করুন, তাহলে আপনার দেখাদেখি সবাই সেটা করবে।' প্রিয়তমা স্ত্রীর পরামর্শে নবিজি নিজের মাথা মুণ্ডন করলেন। এতে কাজও হলো দারুণ। এ দৃশ্য দেখে কেউ আর বসে থাকতে পারলেন না। নবিজির দেখাদেখি একে একে সবাই মাথা মুণ্ডন করে ফেললেন। হতাশার বরফ গলিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলেন প্রত্যেকে।

Scanned by CamScanner

কোনো জটিল সমস্যায় পতিত হওয়ার পর রাসূল ﷺ যদি কোনো উপায় খুঁজে না পেতেন, তবে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়িশা (রা.)-এর ঘরে যেতেন। আয়িশা (রা.)-এর ঘরে গেলেই আল্লাহর ইচ্ছায় ওহি নাজিল হতো আর তিনি খুঁজে পেতেন কার্যকর সমাধান। এভাবেই উম্মুল মুমিনিনগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তের দায়িত্ব পালনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। কবি কাজী নজরুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন—

'কোনো কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারী,
শক্তি দিয়াছে, প্রেরণা দিয়াছে বিজয় লক্ষ্মী নারী।'

স্বামীর সফলতার পেছনে যেমন স্ত্রীর অবদান রয়েছে, তেমনই স্ত্রীদের সুখ্যাতির পেছনেও রয়েছে স্বামীর অবদান। রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের খ্যাতির পেছনে মূল প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছেন। খাদিজা (রা.)-এর বিশাল ব্যাবসা তদারকি করেছেন অসামান্য দক্ষতার সাথে। আয়িশা (রা.)-এর জ্ঞানের জোছনার পেছনে রাসূল ﷺ-এর অবদান ছিল সূর্যের মতো। অন্যান্য বিখ্যাত নারীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বাংলাদেশের নারী জাগরণের অগ্রদূত বলে যাকে অবিহিত করা হয়, সেই বেগম রোকেয়ার বিখ্যাত হওয়ার পেছনেও রয়েছে তাঁর স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা।

এই জন্য প্রত্যেক স্বামীর উচিত স্ত্রীকে গুরুত্ব দেওয়া, তার মানবিক মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ন হয়—এমন আচরণ থেকে বিরত থাকা। একজন সচ্চরিত্রা স্ত্রীর মর্যাদা অনেক বেশি। সচ্চরিত্র স্ত্রী গোটা পরিবারের জন্যই রহমত ও প্রশান্তির উৎস, আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এজন্য রাসূল ﷺ সচ্চরিত্র স্ত্রীকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে অবিহিত করেছেন। তিনি বলেন—

> 'এই পৃথিবীর সকল বস্তুই মূল্যবান। তবে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো—একজন নেককার বা সৎকর্মপরায়ণ স্ত্রী।'
> (নাসায়ি : ৩২৩২)

তিনি আরও বলেন—

> 'চারটি বস্তু সৌভাগ্যের নিদর্শন : পুণ্যবতী স্ত্রী, প্রশস্ত বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন। আর চারটি বস্তু দুর্ভাগ্যের নিদর্শন : মন্দ স্ত্রী, সংকীর্ণ বাড়ি, মন্দ প্রতিবেশী ও মন্দ বাহন।
> (সহিহ ইবনে হিব্বান : ৪০৩২)

Scanned by CamScanner

রাসূল ﷺ স্ত্রীদের কাচের গ্লাসের সাথে তুলনা করেছেন, তাদের আগলে রাখতে বলেছেন মায়ার বাঁধনে। কাচের সামগ্রীকে সব সময় একটু নিরাপদ জায়গায় রাখতে হয়। একটু বেশিই যত্ন করতে হয়। নাড়াচাড়া করতে হয় খুব সতর্কতার সাথে, যাতে অসাবধানতাবশত পড়ে গিয়ে চুরমার না হয়ে যায়। নারীরাও কাচের মতো ভঙ্গুর। পলিমাটির মতো কোমল তাদের হৃদয়। একটু এদিক-সেদিক হলেই তারা ভীষণ আঘাত পায়। দুষ্ট লোকের বদনজরও সদা নিবদ্ধ থাকে তাদের ওপর। তাই নারীদের জন্য একটু নিরাপদ জায়গার ব্যবস্থা করতে হয়, কথা বলতে হয় অনুচ্চস্বরে, বিগলিত হৃদয়ে। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। আমি আমার স্ত্রীদের নিকট উত্তম।' (ইবনে মাজাহ : ১৯৭৭)

এই হাদিস আমাদের দুটো বিষয় সম্পর্কে অবগত করে। প্রথমত, ইসলাম স্ত্রীদেরকে এত বেশি মর্যাদা দিয়েছে যে, তাদের বক্তব্য বা স্বীকৃতিকেই বিবেচনা করা হয়েছে স্বামীর চারিত্রিক সনদ হিসেবে। কারণ, স্বামীর স্বভাব-চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে সাধারণত স্ত্রীরাই বেশি অবগত। দ্বিতীয়ত, স্বামীর উচিত স্ত্রীদের সাথে এমন উত্তম আচরণ করা, যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বামীকে উত্তম বলে স্বীকৃতি দেয়। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, স্ত্রীর কাছে ভালো হতে গিয়ে যেন মা-বাবা এবং অন্যদের প্রতি জুলুম না হয়ে যায়। পরিবার বা আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্‌ব্যবহার ও সুসম্পর্ক বজায় রাখাও সমরূপ জরুরি। আর এ দুইয়ের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করাই একজন মুমিনের কাজ।

অন্যদিকে স্ত্রীদেরও কর্তব্য হলো—স্বামীকে যথাযথ সম্মান দেওয়া এবং তার আত্মমর্যাদাকে সমুন্নত রাখা। সৃষ্টিগতভাবেই পুরুষ মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে মর্যাদাকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তারা অধিক চাপ ও দায়িত্ব বহন করে বলে মর্যাদাটা তাদের যৌক্তিক প্রাপ্যও বটে। তাই আল্লাহ তায়ালাও স্বামীকে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলেন—

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ
وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ۔

> 'পুরুষ নারীর তত্ত্বাবধায়ক এজন্য যে, আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কারণ, পুরুষ নিজের ধনসম্পদ ব্যয় করে।' (সূরা নিসা : ৩৪)

Scanned by CamScanner

স্বামীকে সম্মান ও মর্যাদা না দেওয়ার অর্থ দাঁড়ায়—স্ত্রী স্বামীকে চরম অবজ্ঞা করছে। এই অবজ্ঞা স্বামীর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটায়। ফলে অনিবার্যভাবেই স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসা কমে যায়। দাম্পত্য সম্পর্কে নেমে আসে ভালোবাসাহীন এক যান্ত্রিক শুষ্কতা। তাই প্রতিটি স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর হৃদয়ে নিজের জন্য একটি জায়গা পোক্ত করে নেওয়া এবং স্বামীর মনকে সর্বদা সতেজ ও সুরভিত রাখা। কিন্তু স্বামীর মর্যাদাহানি করে এগুলো অর্জন কখনোই সম্ভব নয়। এই জন্যই রাসুলুল্লাহ ﷺ এক নারী সাহাবিকে স্বামীর মর্যাদা জানিয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন—

> ‘খেয়াল রেখ, তুমি স্বামীর হৃদয়ের কোথায় অবস্থান করছ। কেননা, সে-ই তোমার জান্নাত এবং সে-ই তোমার জাহান্নাম।’ (মুসনাদে আহমদ : ১৯৫১৯)

কোনো স্ত্রী যদি অন্যায়ভাবে স্বামীকে অসম্মান করে, সংগত কারণ ছাড়াই স্বামীর থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে দূরত্ব বজায় রাখে, তাকে তুচ্ছ কারণে কষ্ট দেয়, স্বামীর স্বাভাবিক হক পূরণ থেকে বিরত থাকে এবং তার ন্যায়সংগত নির্দেশকে অমান্য করে, তবে স্বামীর প্রতি এই আচরণই হবে তার জাহান্নামের কারণ। অন্যদিকে স্ত্রী যদি আপন গুণ ও আচরণ দ্বারা স্বামীর হৃদয়ে জায়গা করে নেয়, স্বামীকে যথাযথ মর্যাদা দেয় এবং তার প্রাপ্য হক পূর্ণ করে, স্বামীর চাওয়া ও আল্লাহর হুকুমের মধ্যে সমন্বয় করে, তবে স্বামীর প্রতি এই আচরণ তাকে পৌঁছে দেবে পরম শান্তির আবাস জান্নাতে। স্বামীর মর্যাদার প্রতি জোর দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়াজ (রা.)-কে বলেন—

> ‘যদি কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম, যেন তারা নিজ স্বামীকে সিজদা করে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের বিশেষ অধিকার দিয়েছেন।’ (আবু দাউদ : ২১৪০)

স্বামীকে স্বতঃস্ফূর্ত মনে সঙ্গ দেওয়াও স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য। স্ত্রী যখন স্বামীর আশেপাশে থাকে, তার সাথে খোশগল্প করে, প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখে এবং স্বামীর সাহায্যে এগিয়ে যায়, তখন স্বামী অন্তর থেকে অনেক বেশি মর্যাদা ও প্রশান্তিবোধ করেন। ফলে স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসা বেড়ে যায় বহুগুণ। স্ত্রীর নিকট থেকে এতটুকু সঙ্গ ও সহযোগিতা পাওয়া স্বামীর মৌলিক অধিকার। তাই রাসূল ﷺ নারীদের নির্দেশ দিয়েছেন স্বামীকে সর্বোচ্চ সঙ্গ দেওয়ার জন্য। তিনি বলেন—

Scanned by CamScanner

> ‘নারীরা যদি নিজ স্বামীর হক (যথার্থভাবে) জানত, তাহলে স্বামীর দুপুর অথবা রাতের খাবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা (স্বামীর পাশে) দাঁড়িয়ে থাকত।’ (জামিউল আহাদিস : ১৯০০২)

ওপরে বর্ণিত বিভিন্ন কুরআন-হাদিসের বর্ণনাগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে, স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই কর্তব্য হলো পরস্পরকে মর্যাদা দেওয়া। পরস্পরের সম্মান-ইজ্জত-আব্রু ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। একে অন্যের মানসিক অবস্থার দিকে খেয়াল রাখা। সর্বোপরি সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে সব সময় পাশে থাকা।

পোশাকের যত্ন

আমরা শখের পোশাককে সব সময় চকচকে-ঝকঝকে রাখতে পছন্দ করি। সামান্য ময়লা লাগলে দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলি। চেষ্টা করি সাধ্যের মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর উপাদানটি বেছে নিতে। দাম্পত্য সম্পর্কের সজীবতা ধরে রাখার জন্যও এমন মনোভাব প্রয়োজন। আমাদের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর মাঝে কোনো প্রকার মনোমালিন্য সৃষ্টি হলে দ্রুততার সাথে এবং অধিকতর কার্যকর উপায়ে তা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। দাম্পত্য সম্পর্কে অজান্তেই কোনো আবর্জনা প্রবেশ করল কি না, সেই ব্যাপারেও প্রত্যেকের সচেতনতা জরুরি।

পুরুষ ও নারী সৃষ্টিগতভাবেই ভিন্ন প্রকৃতির। তাদের মানসিক অবস্থা ও চাওয়া-পাওয়াও ভিন্ন। ফলে এই দুই ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ যখন একই বাহনে সহযাত্রী হয়ে পথ চলতে চায়, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের বোঝাপড়াকে নিত্য ঝালিয়ে নিতে হয়, খেয়াল রাখতে হয় পরস্পরের সুযোগ-সুবিধার প্রতি। সম্পর্কের কোথাও ভঙ্গুরতা দেখা দিলে সেটাকে তৎক্ষণাৎ মেরামত করতে হয় আন্তরিক যত্ন ও ভালোবাসা দিয়ে।

ভিন্ন প্রকৃতির দুটি মনকে একই ধ্যানে পরিচালিত করতে কিছু নিয়ম অনুসরণ খুবই জরুরি। এগুলো সম্পর্কের মাঝে অনুরক্তির পবিত্র জোয়ার আনে। বর্ষিত করে মোহনীয় অনুভূতির ঝিরিঝিরি বারিধারা। সম্পর্ককে করে তোলে আরও উপভোগ্য ও প্রাণবন্ত। দাম্পত্যজীবনে নিয়ে আসে শান্তির বার্তা। সেই সর্বজনীন নিয়মগুলো এবার জেনে নেওয়া যাক—

Scanned by CamScanner

সমঝোতা : দাম্পত্য সম্পর্ক জীবনব্যাপী এক যুগপৎ পরিভ্রমণের নাম। নিত্যনতুন বিভিন্ন সংকটের মুখোমুখি হতে হয় এ সফরযাত্রায়। জয় করতে হয় অসংখ্য পাওয়া না পাওয়ার টানাপোড়েন। বিবাহের মাধ্যমে দুজন অজানা-অচেনা মানুষ যুগলবন্দি হয়ে এক নতুন সম্পর্কের সূচনা করে। তাদের মধ্যে থাকে পছন্দ, অভ্যাস, চিন্তা ও মতের ভিন্নতা। থাকে ব্যবহারিক বিষয়াদি ও রীতিনীতির পার্থক্য।

ভিন্ন পরিবারের, ভিন্ন এলাকার; এমনকী ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন সংস্কৃতির দুজন স্বাধীন মানুষ যখন একই বিন্দুতে একীভূত হতে চায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই আবশ্যক হয়ে পড়ে পারস্পরিক সমঝোতা। তা না হলে অসন্তোষের কালো মেঘ জমে ওঠে দাম্পত্যজীবনে। নষ্ট হয়ে যায় সংসারের রৌদ্রোজ্জ্বল পরিবেশ। সুতরাং দাম্পত্যজীবন মাধুর্যতা ধরে রাখার জন্য সমঝোতার বিকল্প নেই।

স্ত্রীর সব আচরণ ও বৈশিষ্ট্য স্বামীর নিকট পছন্দনীয় হবে কিংবা স্বামীর সব অভ্যাস স্ত্রীর নিকট ভালো লাগবে—এমনটা হওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ, মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ভিন্ন পছন্দ ও বৈশিষ্ট্য দিয়েই তৈরি করেছেন। এই ভিন্নতার মাঝে সমন্বয় করাই সঙ্গীর কাজ। কোনো মানুষই নির্ভুল ও সর্বেসর্বা নয়। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু ঘাটতি ও মন্দ স্বভাব রয়েছে। আছে ভালো গুণের সমাবেশও; ভালো-মন্দ মিলেই তো মানুষ। আদর্শ দম্পতির কাজ হলো—সঙ্গীর ভালো গুণকে নিজের মধ্যে ধারণ করে মন্দগুণ অপসারণে প্রচেষ্টা চালানো। সেইসাথে বিভিন্ন সমস্যা-সংকটকে সহজভাবে নেওয়া এবং ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা রাখা। সমঝোতার সংজ্ঞা মোটামুটি এমনই।

সমঝোতার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই একগুঁয়েমি মনোভাবের ঊর্ধ্বে ওঠা জরুরি। বিপরীত সঙ্গীর কাছে যা অপছন্দনীয়, তা যদি সত্যিই মন্দ হয়ে থাকে, তবে সংশোধনের প্রচেষ্টা শুরু করতে হবে। গোঁ ধরে বসে থেকে উলটো সঙ্গীকেই সেই বদগুণে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য চাপ দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আর যদি সেটা মন্দ না হয়ে নিছক পছন্দের ভিন্নতা হয়ে থাকে, তবে দাম্পত্যসঙ্গীকে পছন্দের কারণ ব্যাখ্যা করে বোঝানো উচিত। সঙ্গীরও উচিত বিপরীতজনের পছন্দকে সম্মান জানিয়ে তা মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা; যদি তা ক্ষতিকারক না হয়।

Scanned by CamScanner

ধরুন, স্ত্রী মেকআপ করে বাইরে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পছন্দ করেন। এটা তার খুবই প্রিয় শখ, কিন্তু স্বামী এতে আপত্তি তুললেন। এক্ষেত্রে স্ত্রীকে বিবেচনা করতে হবে, স্বামীর আপত্তির বিষয়টি সত্যিই মন্দ কর্ম কি না। ইসলামের দৃষ্টিতে অবশ্যই এটি মন্দ কর্ম। কারণ, আল্লাহ কুরআনে সুস্পষ্টভাবে নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশ করে বাইরে চলাফেরা করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং স্ত্রীকে নিজের এই অভ্যাস ও মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে। একইভাবে ধরুন, স্বামী ধূমপান করেন এবং এটা তার পছন্দের বিষয়। স্ত্রী এতে আপত্তি তুললেন। এক্ষেত্রে স্বামীরও কর্তব্য হলো—আসলেই বিষয়টি খারাপ কি না, তা যাচাই করে দেখা। যেহেতু ধূমপান ক্ষতিকর, তাই তাকে এই অভ্যাস পরিবর্তনের প্রচেষ্টা শুরু করতে হবে। আর সঙ্গী আপত্তি না তুললেও মন্দ কাজ তো এমনিতেই পরিত্যাজ্য।

যদি এমন হয়, সঙ্গীর আপত্তির বিষয়টি বৈধ; কিন্তু তা অপরজনের অধিকার হরণ করে, তবে আপাত দৃষ্টিতে ভালো কর্ম বিবেচিত হলেও সেটি পরিহার করা উচিত। ধরুন, স্ত্রী সারাক্ষণ তার বান্ধবীদের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে বা চ্যাটিং করতে পছন্দ করেন; এমনকী স্বামী ঘরে এলেও। স্বামী এতে আপত্তি তুললেন। স্বাভাবিকভাবে বান্ধবীদের সাথে ফোনে কথা বলা অবৈধ নয়, কিন্তু সারাক্ষণ এই কাজে মগ্ন থাকলে স্বামীর অধিকারে আঁচড় পড়ে। স্বামীর মৌলিক অধিকার হলো—তিনি স্ত্রীর সাথে আনন্দঘন সময় কাটাবেন, খোশগল্প, হাসি-ঠাট্টা করবেন; কিন্তু স্ত্রী অন্যের সাথে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকলে স্বামী এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। তাই এক্ষেত্রে স্ত্রীর কর্তব্য হলো—নিজের বৈধ অভ্যাসটিকেও পরিবর্তন করে স্বামীর সময়কে সার্থক করে তোলা। স্বামীও যদি এরূপ কর্মে অভ্যস্ত হন, যা স্ত্রীর মৌলিক অধিকার হরণ করে, তবে তার জন্যও নিজের অভ্যাস পরিবর্তন করে ফেলা জরুরি।

কখনো যদি এমন হয় যে, সঙ্গীর আপত্তির বিষয়টি বৈধ কর্ম; কিন্তু তা উত্তম বা প্রশংসনীয় নয়, তবে দুজনকে আলোচনার ভিত্তিতে একটি যৌক্তিক সমাঝোতায় পৌঁছাতে হবে। এমতাবস্থায় ব্যক্তি যদি শুধু সঙ্গীর পছন্দকে সম্মান করে নিজের অভ্যাসকে পরিবর্তন করেন, তবে অবশ্যই তা প্রশংসনীয় কাজ। ধরুন, স্বামী জোরে জোরে নাক ডেকে ঘুমাতে পছন্দ করেন কিংবা উচ্চৈঃস্বরে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন; এটা স্ত্রীর অপছন্দ। এমতাবস্থায় কাজটি বৈধ হলেও স্ত্রীর পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে নিজের অভ্যাসকে পরিবর্তন করা জরুরি।

Scanned by CamScanner

এর বাইরে সঙ্গীর অন্যান্য পছন্দের বিষয়গুলোকেও পরস্পরের সম্মান করা উচিত। যেমন : স্বামী আলু ভর্তা পছন্দ করেন, অন্যদিকে স্ত্রীর পছন্দ শাক। একজন সাদা রং পছন্দ করেন, তো অন্যজন গোলাপি। একজন গল্প করতে পছন্দ করেন, অন্যজন চুপ থাকতে। এই ধরনের বিষয়গুলোতে পরস্পরকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। একই সঙ্গে এই স্বাধীনতা যেন অন্যের বিরক্তির কারণ না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখা সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এগুলোর বাইরেও কিছু অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক বিষয় থাকে; যেগুলোতে সাধারণত মতপার্থক্য তৈরি হয় এবং পাওয়া না-পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে। এসব ক্ষেত্রেও সমঝোতা ও মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতা থাকা আবশ্যক। নয়তো দাম্পত্য কলহ অনিবার্য হয়ে পড়ে। দুজনেই যদি সংশোধনের মানসিকতা লালন করে একগুঁয়েমি মনোভাব পরিহার করেন, তবে অবশ্যই তারা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে একটি সুন্দর ও সন্তোষজনক সমঝোতায় পৌঁছাতে পারবেন।

যেকোনো বৈধ কাজে স্ত্রীকে বাধ্য করার অধিকার স্বামীর রয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে—আপসে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা হয়, বাধ্য করার মাধ্যমে তা অর্জন করা অসাধ্য। এজন্য এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, যার মাধ্যমে সঙ্গী নিজে থেকেই পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

অল্পে তুষ্টি : বিবাহের পূর্বে কিংবা পরে আমরা জীবনসঙ্গীকে নিয়ে অনেকটা আকাশকুসুম কল্পনায় বিভোর থাকি। সিনেমা ও নাটকে যেমনটা দেখে অভ্যস্ত, বাস্তব জীবনের সঙ্গীর ব্যাপারেও ঠিক তেমনটাই আশা করি। স্ত্রীর ব্যাপারে আমাদের প্রত্যাশা থাকে আকাশসম। স্বপ্নের রানি হবে পরির মতো সুন্দর, কথায় ছড়াবে মিষ্টতা, মুক্তো ঝরে পড়বে তার হাসিতে। পুরুষ আশা করে, তার স্ত্রী হবে খুবই পর্দানশীন, জ্ঞান-বুদ্ধিতে পণ্ডিতসম, কাজে-কর্মে পাকা এবং রান্নায় সবার সেরা। আর পরিবার ধনী হলে তো কোনো কথাই নেই। বিস্তর সম্পদের ভাগ পাওয়া যাবে স্ত্রীর বরাতে। এসবই নীচু মনের পরিচায়ক এবং আত্মমর্যাদাহীনতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

নারীদের মনেও স্বামীর ব্যাপারে প্রত্যাশা থাকে আকাশচুম্বী। তারা সিনেমার নায়ক বা সেলিব্রেটিদের সাথে স্বামীকে মেলানোর চেষ্টা করে। কামনা করে— স্বামী হবে সুদর্শন, ভদ্র ও চনমনে। উচ্চপদের চাকরি থাকবে তার, থাকবে যথেষ্ট অর্থকড়িও। চরিত্রবান ও ঈমানদার হলে আরও ভালো।

Scanned by CamScanner

কেউ কেউ তো এককাঠি বেশি সরেস। স্বামী দুর্নীতিগ্রস্ত হলেও তাদের সমস্যা নেই। স্বামী তাদের সারাক্ষণ সময় দেবে, তাদের নিয়ে নিয়মিত ঘুরতে যাবে, শপিং করে দেবে চাহিদা ও পছন্দমাফিক। শ্বশুর-শাশুড়ির ঝামেলা থাকবে না। থাকবে না কোনো আত্মীয়স্বজনের আসা-যাওয়াও।

এত সব কল্পনার ভিড়ে তারা ভুলেই যায়, জীবনসঙ্গী একজন মানুষ। আর মানুষের পক্ষে একসাথে এতগুলো গুণের অধিকারী হওয়া প্রায় অসম্ভব। দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালা একেক মানুষকে একেক গুণ দিয়েছেন; কিন্তু কাউকেই সর্বেসর্বা করেননি। তাই একজন মানুষের পক্ষে সব গুণে গুণান্বিত হওয়া কল্পনাবিলাস বই অন্য কিছু নয়। আর গল্প-উপন্যাস বা নাটক-সিনেমায় যা দেখানো হয়, তা নেহায়েতই লেখক ও পরিচালকের কল্পনার প্রতিফলন। পর্দার নায়ক-নায়িকারাও বাস্তব জীবনে নায়ক-নায়িকা নয়। কিন্তু মানুষ কল্পনার ফানুস উড়িয়ে ভাবে—যদি সিনেপর্দার মতো জীবন হতো তার!

দুনিয়ার এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে আমাদের উচিত সঙ্গীর ব্যাপারে অল্পে তুষ্ট থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা। একজন প্রকৃত মানুষ হিসেবে যে সমস্ত মৌলিক গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন, সেগুলোর দিকে খেয়াল রাখা। নিজের ও সঙ্গীর মাঝে কোনো দিকে ঘাটতি থেকে গেলে তা পূরণে পরস্পরকে সহযোগিতা করা। মনে রাখতে হবে, দুনিয়াতে মানুষের চাওয়া কখনো ফুরাবে না। যত পাবে, ততই চাইবে। এই জন্য সবার আগে নিজের সীমাহীন চাহিদার মুখে লাগাম টানতে হবে। দমন করতে হবে প্রবৃত্তির তাড়নাকে।

দম্পতির উচিত, সঙ্গীর উত্তম গুণগুলো খুঁজে নেওয়া এবং সেগুলোকে সামনে রেখে ঘাটতিগুলোকে এড়িয়ে চলা। সুযোগ থাকলে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা, না থাকলে বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে সেটাকে উপভোগ করতে শেখা কিংবা ধৈর্যধারণ করা। একই সঙ্গে নিজের ঘাটতিগুলোকেও বিবেচনায় রাখা। মনে এই উপলব্ধি নিয়ে আসা—শুধু সঙ্গীর মাঝেই ঘাটতি নেই; আমার মধ্যেও অনেক ঘাটতি রয়েছে। তাহলে অল্পে তুষ্ট থাকা সহজ হবে। এই ব্যাপারে রাসূল ﷺ আমাদের একটি চমৎকার দুআ শিখিয়েছেন—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ شَكُوْرًا وَاجْعَلْنِيْ صَبُوْرًا وَاجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ صَغِيْرًا

وَفِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا-

Scanned by CamScanner

'হে আল্লাহ! আমাকে সবরকারী বানাও; আমাকে শুকরিয়াকারী বানাও; আমাকে আমার চোখে ছোটো বানাও; মানুষের চোখে আমাকে বড়ো বানাও।' (মাজমাউজ জাওয়াইদ : ১৭৪১২)

বিশ্বাস : দাম্পত্যজীবন সুখময় ও স্থায়ী হওয়ার জন্য বিশ্বাস অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ব্যতীত দাম্পত্যবন্ধন দৃঢ় হতে পারে না। সঙ্গীর প্রতি বিশ্বাস মনকে প্রশান্ত ও নির্ভার রাখে, উদ্‌বুদ্ধ করে সম্মান-মর্যাদা ও ভালোবাসার চাদরে সঙ্গীকে জড়িয়ে রাখতে। একই সঙ্গে ব্যক্তি যখন বোঝে—বিপরীত সঙ্গীও তাকে বিশ্বাস করছে, তখন তার মনে তৈরি হয় আত্মমর্যাদার অনুভূতি। অন্যদিকে অবিশ্বাস দাম্পত্য সুখকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়। নষ্ট করে দেয় যাবতীয় মানবিক প্রশান্তি। সুতরাং দাম্পত্য সুখ বজায় রাখার জন্য পারস্পরিক বিশ্বাস অর্জন ও রক্ষায় স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

প্রত্যেক দম্পতির উচিত এমন কর্মনীতি গ্রহণ করা, যাতে বিপরীত সঙ্গীর মনে নিজের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নেয়। দাম্পত্য সম্পর্ক এমন, যেখানে সঙ্গীর গোপন বলতে কিছুই থাকে না। সবকিছুই আস্তে আস্তে বিপরীতজনের নিকট প্রকাশিত হয়। তাই সঙ্গীর বিশ্বাস পেতে হলে শুধু বাইরে পরিপাটি হয়ে লাভ নেই; বরং ভালো হতে হবে ভেতর থেকে। চরিত্র ও অভ্যাসে পরিবর্তন আনতে হবে। স্বামী বা স্ত্রী যখন বুঝবে—তার জীবনসঙ্গী সত্যি সত্যিই ভালো, তখন সে মন থেকে এমন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে, যার ভিত্তি ভাঙা প্রায় দুঃসাধ্য। এর বিপরীতটা হলে আবার সঙ্গীর মন থেকে যাবতীয় বিশ্বাস ও আস্থা উবে যাবে।

উম্মুল মুমিনিন খাদিজা (রা.)-এর সহায়-সম্পত্তি ছিল অঢেল। এই পুরো সম্পদ তিনি তুলে দিয়েছিলেন স্বামী মুহাম্মাদ ﷺ-এর হাতে। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন, রাসূল ﷺ কখনো বিপথে এই সম্পদ খরচ করবেন না। নবিজি যখন নবুয়তপ্রাপ্তির ঘোষণা দেন, তখন কোনো প্রশ্ন ছাড়াই তাঁর প্রতি ঈমান আনেন খাদিজা (রা.)। স্বয়ং রাসূলকেই তিনি সান্ত্বনা দেন, আশ্বস্ত করেন স্বামীর সচ্চরিত্রের সাক্ষ্য দিয়ে। তিনি বিশ্বাস করতেন—তাঁর স্বামীর যে চরিত্র, তা কেবল নবির সাথেই মানানসই।

ভালোবাসা : ভালোবাসাকে কোনো শব্দমালায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না। কোনো নিয়মের ফ্রেমেও বাঁধা যায় না তাকে। এটি একান্ত উপলব্ধির বিষয়।

Scanned by CamScanner

স্বামী-স্ত্রীর মাধুর্যময় সম্পর্কের মূল চালিকাশক্তি এই ভালোবাসা। সম্পর্কের মাঝে যখন কোনো ভালোবাসা থাকে না, তখন সেটি পরিণত হয় যান্ত্রিক অভ্যাসে। বিপরীতে দাম্পত্যজীবনে ভালোবাসার পবিত্র বাতাস প্রবাহিত হলে তাতে আর কোনো কিছুরই দরকার হয় না। পাওয়া না-পাওয়ার বেদনা সেখানে তুচ্ছ বলে বিবেচিত হয়। ধনীর দুলালি স্বামীর প্রেমে ভাঙা ঘরেও খুঁজে নেয় স্বপ্নের ঠিকানা। রাজপুত্র স্ত্রীর প্রেমে মশগুল হয়ে ছেড়ে দেয় রাজত্বের উত্তরাধিকার। দাম্পত্যজীবনকে সার্থক করতে এমন নিখাদ ও অকৃত্রিম ভালোবাসার বিকল্প নেই।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসার সম্পর্ক হবে চোখ আর হাতের মতো। হাত ব্যথা পেলে চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে, আর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরলে হাত সেটা মুছে দেয়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে মন থেকে ভালোবাসতে হবে এবং তা প্রকাশও করতে হবে দ্বিধাহীনচিত্তে। অনেক স্বামী আছেন—যারা স্ত্রীদের ভালোবাসে ঠিকই, কিন্তু কখনোই তা মুখে প্রকাশ করেন না। এতে কোনো কোনো স্ত্রী ভাবে—স্বামী বুঝি ভালোই বাসে না তাকে। ফলে মনে মনে সে কষ্ট পায়। নারীদের মনস্তত্ত্ব এমন যে, তারা স্বামীর কাছ থেকে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখতে চান। খুনসুটি করতে পছন্দ করেন। রোমান্স কামনা করেন। কিন্তু স্বামী যখন এসব করেন না, স্ত্রী ভেবে নেন—জীবনসঙ্গী তাকে ভালোই বাসছেন না। এই জন্য স্বামীর উচিত, স্ত্রীদের সাথে বসে মন খুলে কথা বলা। স্বামীর পক্ষ থেকে ছোট্ট একটু প্রশংসা কিংবা কোন আকস্মিক উপহারই স্ত্রীর জন্য হয়ে উঠতে পারে অঢেল সুখের উৎস।

অন্যদিকে পুরুষরা স্ত্রীর থেকে আশা করেন—একাগ্রতা, আগ্রহ, সম্মান, আনুগত্য ও আবেদনময়ী উপস্থাপন। স্ত্রীর থেকে এসব না পেলে স্বামী ভাবেন, স্ত্রী তাকে ভালোবাসেন না কিংবা উপেক্ষা করছেন। এই জন্য স্ত্রীর কর্তব্য, স্বামীকে মন থেকে ভালোবাসার পাশাপাশি তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে উপরিউক্ত কাজগুলো সম্পাদন করা। রাসূল ﷺ একজন আদর্শ স্ত্রীর কাজ সম্পর্কে বলেন—

> 'শ্রেষ্ঠ রমণী সেই, যার প্রতি তার স্বামী দৃষ্টিপাত করলে সে তাকে খুশি করে দেয়, কোনো আদেশ করলে তা পালন করে এবং তার জীবন ও সম্পদে স্বামীর অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।' (নাসায়ি : ৩২৩১)

Scanned by CamScanner

পরস্পরকে গুরুত্ব প্রদান : প্রতিটি মানুষেরই ব্যক্তিত্ববোধ রয়েছে। মানুষমাত্রই চায়—আপনজন তার ব্যক্তিত্ববোধ রক্ষা করে চলুক, তাকে গুরুত্ব দিক। দাম্পত্য সঙ্গী সবচেয়ে কাছের মানুষ। তাই সঙ্গীর ব্যক্তিত্ব রক্ষার গুরুদায়িত্ব তার ওপরই বর্তায়। সবচেয়ে কাছের মানুষের নিকটই যখন কেউ গুরুত্ব পায় না, তখন নিজেকে সে খুবই অসহায় বোধ করে। আস্তে আস্তে তার ভেতর হীনম্মন্যতা তৈরি হয় এবং ক্রমান্বয়ে সে ঝুঁকে পড়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের দিকে। এই জন্য দম্পতির উচিত পরস্পরের ব্যক্তিত্ব, কথা, চিন্তা ও অবদানকে গুরুত্ব দেওয়া। সঙ্গীর কোনো বিষয়কে তাচ্ছিল্য বা বালখিল্য না ভাবা। অন্যের কাছে সঙ্গীকে মর্যাদার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের ব্যক্তিত্বকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। মানুষের সামনে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিতেন যথাযথ মর্যাদার সাথে। রাসূল ﷺ-এর একজন ইরানি প্রতিবেশী ছিল, যে খুব ভালো রান্না করতে পারত। একদিন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ইরানি খাবার তৈরি করে তাঁকে দাওয়াত করতে লোক পাঠাল। নবিজি তখন আয়িশা (রা.)-এর ঘরে ছিলেন। তাই আয়িশা (রা.)-এর দিকে ইশারা করে বললেন—'এই দাওয়াতে কি আয়িশাও আছে?' লোকটি বলল—'না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন—'(তাহলে আমিও) না।' লোকটি চলে গেল। এরপর সে পুনরায় নবিজিকে দাওয়াত করতে এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন—'সেও কি?' লোকটি এবার বলল—'হ্যাঁ।' এবার নবিজি দাওয়াত কবুল করলেন এবং দুজনে মিলে ইরানি খাবার উপভোগ করলেন।[২]

এই ঘটনায় বোঝা যায়—স্ত্রীকে রাসূল ﷺ কত বেশি গুরুত্ব দিতেন। আয়িশা (রা.)-এর হয়তো নতুন বা বিদেশি খাবারের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল, যেমনটি মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই থাকে। রাসূল ﷺ যদি একাই বিদেশি খাবারের দাওয়াত গ্রহণ করতেন, তাহলে হয়তো আয়িশা (রা.)-এর মনে একটা সুপ্ত আফসোস থেকে যেত। এজন্য তিনি স্ত্রীকে সাথে নিয়েই দাওয়াত গ্রহণে অনড় রইলেন। অনেকটা এমন—'খেলে স্ত্রীকে নিয়েই খাব; না খেলে কেউ-ই খাব না।' এর মাধ্যমে মেজবানও বুঝে নিলেন, রাসূল ﷺ-এর নিকট তাঁর স্ত্রীর গুরুত্ব কত বেশি! ফলে তারাও পরবর্তী সময়ে ঠিক করে নেবে, উম্মুল মুমিনিনকে কত বেশি মর্যাদা দেওয়া উচিত।

---

[২] মুসলিম : ৫৪৩৩

Scanned by CamScanner

সঙ্গীর মানসিক অবস্থা বোঝা : উপভোগ্য দাম্পত্য সম্পর্ক লাভের জন্য সঙ্গীর মানসিক অবস্থা বোঝা অপরিহার্য। মানব মন সব সময় এক থাকে না। সব সময় সবকিছু ভালোও লাগে না। একই কাজ কখনো ভালো লাগে, আবার কখনো বিরক্তিকর ঠেকে। এর কারণ হলো—মানসিক অবস্থার তারতম্য। এই জন্য স্বামী-স্ত্রীর উচিত, তার সঙ্গীর মানসিক অবস্থার দিকে খেয়াল রাখা। সঙ্গী যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, রাগান্বিত কিংবা বিষাদগ্রস্ত থাকে, তখন তার কাছে রোমান্টিক কথা বলা কিংবা মধুর আচরণ প্রত্যাশা করা বোকামি। এতে সঙ্গীর বিরক্তি ও রাগ আরও বেড়ে যায়।

একইভাবে আনন্দঘন মুহূর্তে হতাশামূলক কথা বলাও একধরনের অপরিণামদর্শিতা। এতে সঙ্গীর মনে বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং সে স্বপ্ন দেখতে ভয় পায়। যদি সঙ্গীর মানসিকতাই হয় নেতিবাচক, তাহলে সবার আগে তার মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করা কর্তব্য। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ মানসিক চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

নারী-পুরুষ দুজন দুই প্রকৃতির। নারীরা চায় সবকিছু শেয়ার করতে, বেশি বেশি কথা বলতে এবং আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটাতে। অন্যদিকে পুরুষরা চায় চুপচাপ থাকতে, গোপনীয়তা রক্ষা করতে এবং সমস্যা চেপে রাখতে। অতি আবেগ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করাকে তারা অনেক সময় ব্যক্তিত্বের সংকট বলে মনে করে। নারীদের মন খারাপ হলে তারা চায়, কেউ তার সাথে নরম স্বরে কথা বলুক, মান ভাঙিয়ে হালকা করুক তাকে। অন্যদিকে পুরুষদের মন খারাপ হলে তারা পছন্দ করে চুপ থেকে সমাধান খুঁজতে। এ সময় অধিক কথাবার্তা তাদের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। কঠিন সময়ে একাকী থাকতেই তারা পছন্দ করে। এগুলো নারী-পুরুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ই যদি সঙ্গীর এই মানসিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে আচরণ করে, প্রত্যাশা উপস্থাপন করে, তাহলে ভুল বোঝাবুঝির পরিমাণ কমে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক : দাম্পত্য সম্পর্ক এমন হওয়া উচিত, যেখানে উভয়ে উভয়ের নিকট যেকোনো কথা বা বিষয় শেয়ার করতে পারে নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে। এমন সম্পর্ক কখনোই কাম্য নয়, যেখানে একজন আরেকজনের

Scanned by CamScanner

নিকট প্রয়োজনীয় কথা বলতেও ভয় পায়। এ রকম দমবন্ধ পরিবেশে ভালোবাসা কখনো সৌরভ ছড়ায় না। সেখানে বিরাজ করে কেবলই মনিব-দাসীর দাপ্তরিক আচরণ।

রাসূল ﷺ স্ত্রীদের সঙ্গে খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তিনি এতটাই মিশুক ছিলেন যে, স্ত্রীরা তাঁর সাথে রাগের স্বরেও কথা বলতেন অনেক সময়। একদিন আবু বকর (রা.) উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.)-এর ঘরে গিয়ে দেখলেন—আয়িশা (রা.) নবিজির সাথে রাগতস্বরে নিজের ক্ষোভ ঝাড়ছেন! আর নবিজি চুপ করে শুনছেন। মেয়ের এমন আচরণে আবু বকর (রা.) অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। মেয়েকে শাসিয়ে বললেন—'এত বড়ো স্পর্ধা তোমার, নবিজির সাথে রাগের স্বরে কথা বলছ!' এ কথা বলেই মেয়ের ওপর হাত তুলতে উদ্যত হলেন তিনি। এমন পরিস্থিতিতে রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন বাবা-মেয়ের মাঝখানে। রাসূল ﷺ-কে রক্ষাকবচ হতে দেখে আবু বকর (রা.) নিজেকে সংবরণ করলেন এবং মেয়ের ওপর ক্ষোভ নিয়েই প্রস্থান করলেন। আবু বকর (রা.) চলে যাওয়ার পর নবিজি আয়িশা (রা.)-কে বললেন—'দেখেছ, কীভাবে লোকটার হাত থেকে তোমাকে বাঁচালাম!' নবিজির কথা শুনে আয়িশা (রা.) হেসে দিলেন। কারণ, নবিজি আবু বকর (রা.)-এর সম্বোধনে 'তোমার বাবা' না বলে 'লোকটা' বলেছেন। যেহেতু আবু বকর (রা.) আয়িশা (রা.)-কে মারতে উদ্যত হয়েছিলেন, তাই আয়িশা (রা.)-কে খুশি করার জন্য নবিজি এই অপরিচিতবোধক শব্দ ব্যবহার করেন। অথচ এই আয়িশা (রা.)-ই কিছুক্ষণ আগে নবিজির ওপর রাগ ঝাড়ছিলেন।

কিছুক্ষণ পর আবু বকর (রা.) পুনরায় মেয়ের ঘরে এসে দেখলেন, আয়িশা (রা.) ও নবিজি হাসি-ঠাট্টা করছেন। তাঁদের এমন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দেখে আবু বকর (রা.) মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বললেন—'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাদের এই প্রশান্তির বলয়ে আমাকেও শামিল করুন; যেমনটা করেছিলেন কিছুক্ষণ আগের বিবাদে।' বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছাড়া এমন প্রফুল্ল পরিবেশ কখনোই সম্ভব নয়।

অর্থবহ সময় দান : স্ত্রীদের সাথে সময় কাটানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি ছাড়া পারস্পরিক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না। বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে আমরা যেন যান্ত্রিক জীবনে প্রবেশ করেছি। সারাদিন কাজ নিয়েই পড়ে থাকি। রাতের বেলা বাসায় ফিরে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিই। স্ত্রীদের সাথে কথা

Scanned by CamScanner

বলার কিংবা তাদের অনুভূতির দিকে মনোযোগ দেওয়ার ফুরসতই যেন আমাদের নেই। অথচ তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে আমরা চাইলেই কিন্তু পারি—অফিসে বসেও স্ত্রীর খোঁজ নিতে। কাজের ফাঁকে তাকে ছোট্ট করে একটা ম্যাসেজ দিয়ে রাখতে। শত ব্যস্ততার মাঝেও তাকে ভালোবাসার কথা জানাতে।

রাসূল ﷺ প্রতিদিন সকালে স্ত্রীদের সাথে দেখা করতেন। তাঁদের খোঁজখবর নিতেন। সারাদিন রাষ্ট্রীয় ও নবুয়তি দায়িত্ব পালন শেষে আসরের পর আবার প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে যেতেন এবং তাঁদের সাথে আনন্দঘন সময় কাটাতেন। রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী ছিলেন সর্বমোট ১১ জন। তাঁদের মধ্যে দুজন রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই মারা গিয়েছিলেন। বাকি নয়জন স্ত্রীর সাথে তিনি দিন ভাগ করে থাকতেন। এ ব্যাপারে কখনো অবিচার করতেন না। একজন স্ত্রী প্রতি নয় দিন পর নবিজির সাথে থাকার সুযোগ পেতেন। যদি নয় দিন পরপর তিনি স্ত্রীদের সাথে দেখা করতেন, তবে সেটা তাঁদের জন্য অনেক কষ্টকর হতো। তাই রাসূল ﷺ স্ত্রীদের সাথে প্রতিদিনই দুইবার করে সাক্ষাৎ করতেন এবং উপভোগ্য সময় কাটাতেন। স্ত্রীরা তাই ভাবতেন—রাসূল ﷺ তো সব সময় তাঁদের সাথেই আছেন।

সঙ্গিনীর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা : আগেই বলেছি, নারীরা সাধারণত বলতে পছন্দ করে। তারা খুব করে চায়, কেউ তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুক। এই জন্য স্বামীর উচিত, স্ত্রী কিছু বললে তা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তার প্রশংসা করা; এমনকী তার কথা কম গুরুত্বপূর্ণ কিংবা গুরুত্বহীন হলেও। এতে স্ত্রীর মন হালকা হয় এবং পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। স্ত্রী যদি বাচাল প্রকৃতির হয়, তবে অন্য সময়ে উত্তম উপায়ে তাকে সংশোধনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

বিনোদন ও রোমান্টিসিজম : জমিনে পানির যেমন প্রয়োজন, দাম্পত্য সম্পর্কে বিনোদন ও রোমান্টিকতা তেমনই প্রয়োজন। বিনোদন ছাড়া দাম্পত্য সম্পর্ক শুষ্ক মরুভূমির রূপ ধারণ করে। সেখানে ফলে না কোনো সবুজ তরু কিংবা উপকারী ফসল। বিনোদনের সাথে স্ত্রীর মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য স্ত্রীর ভরণ-পোষণ যেমন স্বামীর দায়িত্ব, তেমনই তার মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখাও স্বামীর একান্ত কর্তব্য।

শরিয়াহর নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকেই যতদূর সম্ভব বিনোদন গ্রহণ করা উচিত। যেমন : স্ত্রী কোনো বৈধ কাজ করতে পছন্দ করলে তাকে সে

Scanned by CamScanner

কাজ করতে সুযোগ করে দেওয়া। প্রতিদিন কিছু সময় তার সাথে হাসি-ঠাট্টা ও নির্জনে বৈধ খেলাধুলা করা। তাকে নিয়ে বাড়ির ছাদে বা ঘরের আঙিনায় পায়চারি করা। সমুদ্রসৈকত, চিড়িয়াখানা, জাদুঘর বা কোনো দর্শনীয় স্থানে নিয়ে যাওয়া। সামর্থ্য থাকলে উমরা বা বিদেশ ভ্রমণের সঙ্গী করা।

নবি ﷺ স্ত্রীদের সাথে নিয়মিত গল্প-কৌতুক ও খেলাধুলা করতেন। স্ত্রীর কাছে যাওয়ার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। রাসূল ﷺ অনেক সময় আয়িশা (রা.)-এর সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গল্প করতেন এবং খুনসুটি করতেন। আয়িশা (রা.) যে মশক পানি পান করতেন, রাসূল ﷺ ঠিক সেই মশকের একই স্থানে ঠোঁট লাগিয়ে পানি পান করতেন। আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন—

> 'এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। তখন আমি কিশোরী। রাসূল ﷺ সঙ্গীদের বললেন—"তোমরা এগিয়ে যাও।" অতঃপর তিনি আমাকে বললেন—"এসো দৌড় প্রতিযোগিতা করি।" আমি তাঁর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম এবং দৌড়ে তাঁর চেয়ে এগিয়ে গেলাম। পরবর্তী সময়ে আমি যখন কিছুটা মোটা হয়ে গেলাম, তখন কোনো এক রাতে রাসূল ﷺ-এর সাথে আবারও দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম। কিন্তু এবার তিনি বিজয়ী হয়ে আমাকে বললেন—"আয়িশা, ওই দিনের সমান করে নিলাম।"' (আবু দাউদ : ২৫৭৮)

অপর একটি বর্ণনায় আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'ঈদের দিনে হাবশি লোকেরা ঢাল ও বর্শা নিয়ে খেলা করত। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিলাম কিংবা তিনিই আমাকে বলেছিলেন—"তুমি কি দেখতে আগ্রহী?" আমি বললাম—"হ্যাঁ।" তারপর তিনি আমাকে তাঁর পেছনে দাঁড় করালেন। আমার গাল তাঁর গালের ওপর ছিল। তিনি বলছিলেন—"হে বনু আরফিদা! চালিয়ে যাও।" যখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তিনি আমাকে বললেন—"যথেষ্ট হয়েছে?" বললাম—"হ্যাঁ।" তিনি বললেন—"এখন যাও।" অর্থাৎ, একসময় আমি নিজেই ধৈর্য হারিয়ে ফেললাম এবং সেখান থেকে চলে যেতে চাইলাম, কিন্তু রাসূল ﷺ ধৈর্যহারা হলেন না।' (বুখারি : ২৯০৬)

Scanned by CamScanner

পারস্পরিক সহযোগিতা : স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কাজে সহায়তার চর্চা সম্পর্কের মাঝে আস্থা ও সহমর্মিতা তৈরি করে। বৈবাহিক জীবনের প্রথম দিকে স্বামীর তুলনায় স্ত্রীর ত্যাগটাই বেশি থাকে। কারণ, বিয়ের পর একটি মেয়ে সবকিছু ছেড়ে নতুন একটি পরিবারে যোগ দেয়। সম্পূর্ণ নতুন এক পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয় নিজেকে। বিপরীতে স্বামীকে প্রায় কিছুই ছাড়তে হয় না। না পরিবার, না আত্মীয়স্বজন। তাই নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীকে সহযোগিতা করা স্বামীর কর্তব্য।

এ ছাড়াও তারা সন্তান লালন-পালনের প্রধান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সারাদিন সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকে। পুরো সংসার তদারকি করে। খেয়াল রাখে কার কী প্রয়োজন। কোনো সাপ্তাহিক ছুটিও তাদের থাকে না। একটানা কাজ করে যেতে হয় জীবনভর। স্বামীর উচিত—যত দূর পারা যায়, স্ত্রীকে সাংসারিক কাজে সাহায্য করা। সামর্থ্য থাকলে কাজের লোকের ব্যবস্থা করা। বাড়ি ফিরে অহেতুক টিভির স্ক্রিন কিংবা মোবাইলে ব্যস্ত না থেকে স্ত্রীর সাথে গল্প করতে করতেও কাজে সহযোগিতা করা যায় কিংবা বাচ্চাদের দেখে রাখা, তাদের পড়ানো যায়। এগুলো রাসূল ﷺ-এর সুন্নত।

আল্লাহর রাসূল ﷺ যতটুকু সময় ঘরে থাকতেন, স্ত্রীদেরকে ঘরের কাজে ও রান্নাবান্নায় সহযোগিতা করতেন। আসওয়াদ (রা.) বর্ণনা করেন—

> 'একবার আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো—"রাসূল ﷺ ঘরে থাকাকালে কী করতেন?" জবাবে আয়িশা (রা.) বললেন—"তিনি স্ত্রীদের সাংসারিক কাজে সহযোগিতা করতেন। আর যখন নামাজের সময় হতো, নামাজে যেতেন।"' (বুখারি : ৬৭৬)

আয়িশা (রা.) আরও বলেন—

> 'রাসূল ﷺ জুতা ঠিক করতেন, কাপড় সেলাই করতেন এবং তোমরা যেমন ঘরে কাজ করো, তেমনই কাজ করতেন।' (মুসনাদে আহমদ : ২৫৩৮০)

কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়ানো : জীবনে উত্থান-পতন খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। শারীরিক-অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন দিক থেকে সংসারে কঠিন সময় আসতে পারে। হতে পারে স্ত্রী অসুস্থ কিংবা স্বামীর চাকরি-ব্যবসায় বা কৃষিক্ষেত্রে চরম ধস। সঙ্গীর এই কঠিন সময়ে পাশে থাকা স্বামী-স্ত্রীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কথায় আছে, বিপদেই বন্ধু চেনা যায়। দাম্পত্য সঙ্গীর

Scanned by CamScanner

কঠিন সময়ে যদি অপরজন চলে যায় বা পাশে না থাকে, তবে এর চেয়ে অকৃতজ্ঞতা আর হতে পারে না।

রাসূল ﷺ-এর কঠিন দুর্দিনে তাঁর পবিত্রা স্ত্রী খাদিজা (রা.) সার্বিক দিক থেকে পাশে ছিলেন। অর্থ দিয়ে, সময় দিয়ে; এমনকী শ্রম দিয়েও তাঁর পাশে ছায়ার মতো ছিলেন। রাসূল ﷺ নিজেই তাঁর সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন—

> 'আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম কাউকে বিকল্প হিসেবে দেননি। যখন সবাই আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে, তখন সে বলেছে সত্যবাদী। যখন সবাই আমাকে বঞ্চিত করেছে, তখন সে আমাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে। আর তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেছেন।' (মুসলিম : ২৪৩৭)

রাসূল ﷺ-এর মেয়ে জয়নাব (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেও স্বামীর ভালোবাসায় মক্কাতেই ছিলেন। তাঁর স্বামী 'আবুল আস ইবনে রাবি' তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবে তিনি ইসলামের বিরোধিতাও করতেন না। বদর যুদ্ধের সময় আবুল আস মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দি হন। এই খবর শুনে জয়নাব (রা.) স্বামীর মুক্তিপণ হিসেবে নিজের গলার হার মদিনায় পাঠিয়ে দেন। হারটি জয়নাব (রা.)-এর বিয়ের সময় তাঁর মা খাদিজা (রা.) নিজ গলা থেকে খুলে উপহার দিয়েছিলেন। রাসূল ﷺ এই হার দেখে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না। অশ্রুতে ভরে উঠল তাঁর চোখ। তিনি সাহাবিদের বললেন—'তোমরা যদি রাজি থাকো, তাহলে এ হার ফিরিয়ে দাও এবং বন্দিকে মুক্তিপণ ব্যতীতই মুক্ত করে দাও।'

এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়, নবিজির মেয়ে তাঁর স্বামীকে কতটা ভালোবাসতেন। পরলোকগত মায়ের শেষ স্মৃতি, নিজের গলার হার সঁপে দিয়েছেন স্বামীর মুক্তির জন্য। স্বামীর দুর্দিনে ও কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

প্রশংসা করা : নিজের প্রশংসা শুনতে কার না ভালো লাগে? সেই প্রশংসা যদি আসে একান্ত প্রিয়জনের মুখ থেকে, তাহলে আর খুশির অন্ত থাকে না। স্বামী-স্ত্রীর উচিত পরস্পরের ভালো গুণ, কাজ, পছন্দ, সৌন্দর্য, রান্না ইত্যাদি নিয়ে প্রশংসা করা। এতে দম্পতিযুগল নিজের ও সঙ্গীর ব্যাপারে আস্থাশীল হয়। নয়তো সে ভাবে, বিপরীতজন তাকে নিয়ে খুশি নয়। তাই তার মাঝে হীনম্মন্যতা কাজ করে। এজন্য স্ত্রীর প্রশংসায় কৌশলে মিথ্যা বলাকেও জায়েজ করেছে ইসলাম। রাসূল ﷺ বলেন—

Scanned by CamScanner

'তিন ক্ষেত্র ছাড়া মিথ্যা বলা বৈধ নয়—স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মিথ্যা বলা, যুদ্ধক্ষেত্রে মিথ্যা বলা এবং মানুষের মধ্যে আপস-মীমাংসার জন্য মিথ্যা বলা।' (আবু দাউদ : ৪৯২১)

রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের প্রশংসা করতেন। আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন—

'আমি রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীগণের মধ্য থেকে খাদিজা (রা.)-এর চেয়ে অন্য কোনো স্ত্রীর প্রতি অধিক হিংসা করিনি। কারণ, রাসূল ﷺ প্রায়ই তাঁর কথা স্মরণ করতেন এবং তাঁর প্রশংসা করতেন।' (বুখারি : ৩৮১৮)

স্ত্রীর কোনো গুণ বা রূপের প্রশংসা করে তাকে আদুরে নামে ডাকা যেতে পারে। এটা বিশ্বনবির সুন্নাহ। তিনি স্ত্রীদের বিভিন্ন আদুরে নামে ডাকতেন। আয়িশা (রা.)-কে আদর করে ডাকতেন 'হুমায়রা'। হুমায়রা অর্থ—সুন্দর চিবুকের অধিকারিণী বা লালচে চেহারার অধিকারিণী। আম্মাজান আয়িশা (রা.) নবিজির ভালোবাসা ও প্রশংসায় কবিতা লিখেছিলেন—

'আমার একটি সূর্য আছে, আকাশেরও একটি সূর্য
আমার সূর্য আকাশের সূর্যের চেয়ে উত্তম।
কেননা, পৃথিবীর সূর্য ফজরের পর উদিত হয়
আমার সূর্য উদিত হয় এশার পর।'[৩]

ইসলামি সীমার মধ্যে থাকা : দাম্পত্যজীবনকে উপভোগ্য করার জন্য শরিয়াহসম্মত অনেক মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ রয়েছে। সুনির্দিষ্ট কিছু সীমারেখা ছাড়া সমগ্র পৃথিবী আমাদের জন্য উপভোগ্য। তবে খেয়াল রাখতে হবে, আমরা যেন বাড়াবাড়ি করে না ফেলি। অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়। ক্ষণিকের আনন্দ পাওয়ার জন্য এমন কোনো কাজ করা যাবে না, যা পরকালীন মুক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রিয় মানুষটিকে খুশি করার জন্য আমরা গল্পগুজব, খুনসুটি করব; কিন্তু কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে যাব না। হালালের সীমার মধ্যে থেকেই দাম্পত্যজীবনকে উপভোগ করব। মহান আল্লাহ বলেন—

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে যাবে, আল্লাহ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে থাকবে অনন্তকাল। আর তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণা ও অপমানজনক শাস্তি।' (সূরা নিসা : ১৪)

---

৩. *আর-রাহিকুল মাখতুম*

Scanned by CamScanner

অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান : আল্লাহ মানুষের দাম্পত্যজীবনকে এমনভাবে সাজিয়েছেন, স্বামীই সেখানে যাবতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব বহন করবে। আর ঘরের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি স্বামীর যাবতীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করবে স্ত্রী। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ-

'পুরুষ নারীর তত্ত্বাবধায়ক। আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কারণ, পুরুষ নিজের ধনসম্পদ ব্যয় করে। কাজেই সতীসাধ্বী স্ত্রীরা আনুগত্যপরায়ণ হয় এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর হেফাজত ও তত্ত্বাবধানে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে।' (সূরা নিসা : ৩৪)

এই জন্য স্বামীর কর্তব্য হলো—স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এটা স্ত্রীর অধিকার। স্ত্রীকে যথাযথভাবে ভরণ-পোষণ না দিলে সংসারে কখনোই শান্তি বজায় থাকতে পারে না। স্বামী নিজের সাধ্যানুযায়ী ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবেন; এটা তার মৌলিক দায়িত্ব। শত চেষ্টা সত্ত্বেও যদি সংসারে টানাপোড়েন বজায় থাকে, সেটি ভিন্ন কথা। কিন্তু আয়-রোজগারের চেষ্টা না করে ঘরে বসে থাকা কিংবা ভবঘুরের মতো জীবনযাপন করা নিশ্চিতভাবেই অধিকার হরণের অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তার পাশাপাশি স্ত্রীর সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাও স্বামীকেই করতে হবে। তার জন্য নিরাপদ ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়িতে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেন তার পর্দা-আব্রু-সম্মান ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রচেষ্টা : ওই দম্পতি সর্বাপেক্ষা উত্তম, যে নিজের চরিত্র হেফাজতের পাশাপাশি সঙ্গীর চারিত্রিক ও আত্মিক উন্নয়নেও বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। ভালোবাসার সৌরভ মেখে তাকে উৎসাহ দেয়। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

Scanned by CamScanner

'সেই ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তায়ালা রহম করুন, যে গভীর রজনিতে উঠে সালাত আদায় করে এবং প্রিয়তমা স্ত্রীকেও জাগিয়ে দেয়। স্ত্রী জেগে উঠতে গড়িমসি করলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়, যাতে সে সজাগ হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা সেই মহিলার প্রতিও রহম করুন, যে গভীর নিশিতে জেগে সালাত আদায় করে এবং প্রিয়তম স্বামীকেও জাগিয়ে দেয়। স্বামী জেগে উঠতে গড়িমসি করলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়, যাতে সে জেগে ওঠে।' (আবু দাউদ : ১৩০৮)

পোশাক মলিন হওয়ার কারণ

কতক কাজ ও অভ্যাস রয়েছে, যেগুলো দাম্পত্য পোশাককে মলিন করে দেয়। বিষিয়ে তোলে স্বামী-স্ত্রীর মনের আবহ। এগুলোর ধারাবাহিক চর্চা একপর্যায়ে দাম্পত্য সম্পর্ককে উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করে। কখনো কখনো সেটা বিচ্ছেদ অবধিও গড়ায়।

আমাদের দেশে বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। সাম্প্রতিক এক জরিপ থেকে জানা যায়, ঢাকায় প্রতিদিন গড়ে ৩৯টি বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে। অথচ এই দম্পতিগুলোই একদিন খোলা আকাশের নিচে বসে হাতে হাত রেখে স্বপ্ন বুনেছে, সুখে-দুঃখে একে অপরকে আগলে রাখার আশ্বাস দিয়েছে, প্রতিজ্ঞা করেছে পরস্পরের আমরণ সঙ্গী হওয়ার।

যে সমস্ত বিষয় ও অভ্যাস দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে নীরব ঘাতকের ন্যায় প্রবেশ করে তাকে চূড়ান্ত ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়, সেগুলো হলো—

সন্দেহ : বিশ্বাসই সুখী দাম্পত্যজীবনের মূল চাবিকাঠি। বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক কংক্রিট অপেক্ষা মজবুত। এটা পরস্পরের মধ্যে এক অদৃশ্য চুক্তিও বটে, কিন্তু এই বিশ্বাসের মাঝে একবার সন্দেহ প্রবেশ করলে তা বিশ্বাসকে চিরতরে বিকল করে দেয়।

বর্তমানে আমাদের অধিকাংশ পরিবারেই দেখা যায়, স্বামী স্ত্রীকে সন্দেহ করে; অনুরূপ স্ত্রী স্বামীকে। প্রত্যেকেই যেন সন্দেহের প্রতিযোগিতায় মত্ত। দম্পতির মাঝে সন্দেহ তৈরিতে তাদের ব্যক্তিগত আচার-আচরণ যেমন দায়ী, তার চেয়েও বেশি দায়ী আমাদের মিডিয়া জগৎ; বিশেষত বিদেশি সিরিয়াল। এগুলো প্রতিনিয়ত মা-বোনদের শৈল্পিক উপায়ে সন্দেহ করতে শেখায়;

Scanned by CamScanner

পুরুষরাও তাদের ভয়ানক থাবা থেকে মুক্ত নয়। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো—কোনো প্রতিষ্ঠিত সত্য সম্পর্কেও যদি প্রতিনিয়ত প্রশ্ন তোলা হয় কিংবা তাতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নেতিবাচক বিষয় খোঁজা হয়, তাহলে সেই সত্য সম্পর্কেও মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। তখন সে আর ওই বিষয়টিকে দৃঢ়চিত্তে সত্য ভাবতে পারে না। আর এই ভাইরাসেই আমরা আজ আক্রান্ত।

দাম্পত্যজীবনে কোনো অস্বাভাবিক অবস্থা দেখলেই আমরা নেতিবাচক ধারণা করে বসি; এমনকী সঠিক তথ্যও জানার চেষ্টা করি না। স্বামীর অফিস থেকে আসতে একটু বিলম্ব হলে কিংবা কয়েকবার ফোন করে তাকে লাইনে পাওয়া না গেলেই হলো, শুরু হয়ে যায় সন্দেহের ফিরিস্তি। যত প্রকার উদ্ভট চিন্তা আছে, দলবেঁধে মাথায় এসে ভর করে। এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে শয়তান। কারণ, সে খুব করে চায়—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব তৈরি হোক। এতে তার দুরভিসন্ধি সফল হয়। ফলে নানা ছুতায় দম্পতির মনে সে সন্দেহের বীজ বপন করে চলে। শয়তানের এই চাল থেকে আমাদের বেঁচে থাকা জরুরি। ঈমানদারদের সুখী সংসার ভেঙে দিতে পারলে শয়তান খুব খুশি হয়। জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'ইবলিস সমুদ্রের পানির ওপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। অতঃপর মানুষের মধ্যে ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার জন্য সেখান থেকে তার বাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। এদের মধ্যে সেই শয়তানই তার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত, যে মানুষকে সবচেয়ে বেশি ফিতনায় নিপতিত করতে পারে। তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বলে—"আমি এরূপ এরূপ ফিতনা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।" তখন সে (ইবলিস) প্রত্যুত্তরে বলে—"তুমি কিছুই করোনি।" অতঃপর এদের অপর একজন এসে বলে—"আমি মানব সন্তানকে ছেড়ে দিইনি; এমনকী দম্পতির মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করে দিয়েছি।" ইবলিস এ কথা শুনে তাকে নিকটে বসায়। বলে—"তুমিই উত্তম কাজ করেছ।"' বর্ণনাকারী আমাশ বলেন—'আমার মনে হয় জাবির (রা.) এটাও বলেছেন, অতঃপর ইবলিস তার সাথে আলিঙ্গন করে।' (মুসলিম : ২৮১৩)

তা ছাড়া স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে অতিরিক্ত সন্দেহ করা গুনাহের কারণও বটে। এই ব্যাপারে আল্লাহ আমাদের সতর্ক করে বলেন—

Scanned by CamScanner

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে—

> ‘যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকেন।’

তবে অবশ্যই স্বামীর কর্তব্য হলো—যৌনমিলনের ক্ষেত্রে স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থাকে আমলে নেওয়া। এসব বিষয়কে উপেক্ষা করা পশুত্বের শামিল।

পরিচ্ছন্ন না থাকা : পরিচ্ছন্ন না রাখলে পোশাক তার জৌলুস হারিয়ে ফেলে। এটাই পোশাকের নিয়ম। দাম্পত্য পোশাকও এই নিয়মের বাইরে নয়। সম্পর্ককে আকর্ষণীয়-মধুময় ও সজীব রাখার জন্য স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের কর্তব্য নিজের শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

ময়লা-আবর্জনা ও নোংরা জিনিসের প্রতি মানুষের একটি স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা রয়েছে। সঙ্গী যখন সর্বদা নিজেকে অপরিষ্কার ও নোংরা অবস্থায় রাখে, তখন বিপরীত সঙ্গী তো অবশ্যই, আল্লাহও তার প্রতি নারাজ হন। কারণ, রাসূল ﷺ বলেছেন—

> ‘পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।’ (মুসলিম : ২২৩)

অপরিচ্ছন্নতা পরস্পরের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে, সম্পর্কে নিয়ে আসে মন্থরতা। বিয়ের প্রথম প্রথম দম্পতিরা পরস্পরের প্রতি যতটা আকর্ষণ বোধ করে, কিছুদিন যাওয়ার পর ততটা আর করে না। এর অন্যতম একটি কারণ হলো—দম্পতিরা প্রথমদিকে নিজের পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের ব্যাপারে যতটা সজাগ থাকে, পরবর্তী সময়ে ব্যস্ততা আর বেখেয়ালিতে ততটাই এলোমেলো হয়ে যায়। বহু পুরুষকে দেখা যায়—চুলগুলো অগোছালো, নাকের লোম বাইরে বেরিয়ে এসেছে, গোঁফগুলো ঠোঁটের নিচ অবধি ঝুলন্ত, শরীরে ঘামের দুর্গন্ধ; অথচ এসবের প্রতি তার কোনো খেয়ালই নেই।

অন্যদিকে এমন অনেক নারী আছে, যারা সারাদিন বাসার কাজ, সন্তান লালন-পালন কিংবা অন্য কোনো কাজে এতটাই ব্যস্ত থাকে যে, সাধারণ পরিচ্ছন্নতাটুকুও অর্জনের ফুরসত পায় না। সন্ধ্যায় এলোমেলো চেহারায় বাসায় ফিরে। ময়লা-ঘর্মাক্ত পোশাক পরে থাকে। স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখে না। মনে হয় যেন কিছুক্ষণ আগেই তার ওপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে। অথচ এরাই যখন বাইরে বা কোনো অনুষ্ঠানে যায়, ঠিকই পরিপাটি ও সেজেগুজে যায়।

Scanned by CamScanner

পুরুষরা বাইরে গেলে দেখে, দুনিয়ার সকল নারীই অনেক পরিপাটি আর পরিচ্ছন্ন; কিন্তু বাড়ি ফিরে দেখে তার স্ত্রী এলোমেলো-অপরিপাটি। তখন সে ভাবতে বাধ্য হয়—সকল নারীই পরিপাটি, সুন্দর; কেবল আমার স্ত্রীই অপরিচ্ছন্ন। এখান থেকেই সৃষ্টি হয় স্ত্রীর প্রতি বিতৃষ্ণা। শুরু হয় পারিবারিক অশান্তি। তাই স্ত্রীর উচিত, সাংসারিক নানা কাজের ভিড়েও নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করা। স্বামী বাড়িতে ফেরার পূর্বেই পরিষ্কার-পরিপাটি হয়ে সাজসজ্জা গ্রহণ করা। এ বিষয়ে বিশ্বনবির সুন্দর একটি হাদিস রয়েছে—

> 'রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের নিয়ে এক যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। কাফেলা মদিনার কাছাকাছি এলে জাবির (রা.) একটু দ্রুতবেগে বাড়ির দিকে ছুটছিলেন। জাবির (রা.) তখন টগবগে যুবক এবং সদ্য বিবাহিত। রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন—"ধীরে যাও। কিছুটা রাত হতে দাও; যেন তোমার স্ত্রী চুলগুলো আঁচড়ে নিতে পারে, গোপনাঙ্গের লোম পরিষ্কারের প্রয়োজন হলে সেটাও সেরে নিতে পারে।"' (বুখারি : ৪৭৯১)

এই হাদিস থেকেই বোঝা যায়, সঙ্গীর জন্য পরিচ্ছন্নতা অর্জন এবং সাজসজ্জা গ্রহণ করাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কতটা গুরুত্ব দিতেন। তিনি নিজেও সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন। দৈনিক পাঁচবার মেসওয়াক করতেন। খুশবু ব্যবহার করতেন। চুল-দাড়ি চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে পরিপাটি করে রাখতেন সব সময়। প্রতি জুমাবার নখ-গোঁফ খাটো করতেন। তিনি খুব দামি জামাকাপড় পরতেন না ঠিক, কিন্তু পরিষ্কার ও রুচিশীল পোশাক পরিধান করতেন। সর্বক্ষণ তিনি নিজেকে সজ্জিত ও উপস্থাপন করে রাখতেন। তিনি বলেন—

> 'আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন।' (মুসলিম : ৯১)

তবে খেয়াল রাখতে হবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যেন কারও অজুহাত না হয়ে যায়। শরীরে ময়লা লাগবে, এই অজুহাতে যেন আমরা হাত গুটিয়ে বসে না থাকি। সংসারের প্রয়োজনীয় কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং সাথে যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, সদিচ্ছা থাকলে কাজ করেও পরিপাটি থাকা যায়।

সঙ্গীর দোষত্রুটি খোঁজা : অপরের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ানো মানুষের এক সহজাত অভ্যাস। এই বদভ্যাসটি আমাদের দাম্পত্যজীবনেও বিরাজমান।

Scanned by CamScanner

স্বামী স্ত্রীর দোষ খুঁজে বেড়ায়, স্ত্রী স্বামীর দোষ। এ যেন অন্তহীন এক প্রতিযোগিতা। এর থেকেই জন্ম নেয় পারস্পরিক অবিশ্বাস, বপিত হয় সন্দেহের বীজ। এই বদভ্যাসে একবার অভ্যস্ত হয়ে পড়লে পারস্পরিক সম্মান ও বিশ্বাস জানালা দিয়ে পালিয়ে যায়। তখন আল্লাহর দেওয়া পোশাক আর শরীরে ফিট হয় না; বরং একে বিরক্তিকর মনে হয়। দাম্পত্য কলহ, ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা অসংগতি তখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তাই দাম্পত্য সম্পর্ককে উপভোগ্য করতে এই বদভ্যাসকে ছুড়ে ফেলা প্রয়োজন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন—

> 'তোমরা একে অন্যের দোষত্রুটি অন্বেষণ করো না এবং পরস্পর গিবত করো না।' (সূরা হুজুরাত : ১২)

আপনি যদি দোষ খুঁজতে শুরু করেন, তবে একজন আল্লাহর ওলিরও অহরহ দোষ খুঁজে পাবেন। দোষ ছাড়া পৃথিবীতে কোনো মানুষ নেই। সঙ্গীর দোষ খোঁজার সময় মনে রাখতে হবে, আপনার নিজের মধ্যেও রয়েছে অবারিত ত্রুটি। তাই দোষ খুঁজতে ইচ্ছে হলে, আগে নিজের দোষ খুঁজুন। যে নিজে নিজের সমালোচনা করতে পারে, সে-ই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান। বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

> 'তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না; অপরের গোয়েন্দাগিরি করো না, অপরের গোপন দোষ খুঁজো না, পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও।' (মুসলিম : ২৫৬৩)

অকৃতজ্ঞতা : অকৃতজ্ঞতা সঙ্গীর সমস্ত অবদান ও ত্যাগকে মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ করে দেয়। সঙ্গীর মনে কঠিন আঘাত দেওয়ার সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র হলো অকৃতজ্ঞতা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের কাজটি আমরা হরহামেশাই করে থাকি। তবে নারীরা এক্ষেত্রে বেশি এগিয়ে। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'নারীদের মধ্যে দুটি মন্দ গুণ আছে, যা তাদের জাহান্নামে নিয়ে যায়। যে নারী এ দুটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে, সে জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে। তা হলো—১. অভিশাপ ও অপবাদ দেওয়া, ২. স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা।' (মুসলিম : ৭৯)

নারীরা কখনো কখনো একে অপরকে তুচ্ছ কারণে অভিশাপ দিয়ে বসে। স্বামী কিছু দিতে অসমর্থ হলেই অনেক স্ত্রী বলে—'তোমার সাথে বিয়ে হয়ে

Scanned by CamScanner

জীবনে কিছুই পেলাম না।' অথবা—'তুমি জীবনে কী দিয়েছ আমাকে?' এ রকম আরও অনেক কথা। এসব মন্তব্য স্পষ্টতই অকৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। স্বামীর মনে এসব কথা কুঠারাঘাত করে। তাই স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই কর্তব্য হলো—অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এমন কথা বলা থেকে বিরত থাকা।

সঙ্গীর পরিবারকে নিয়ে উপহাস ও তাচ্ছিল্য : সঙ্গী বা সঙ্গিনীর পরিবারকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখা, গালিগালাজ ও অসম্মান করা কিংবা তাদের নিয়ে উপহাস করা প্রভৃতি কর্ম স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে মলিন হয়ে যায় সম্পর্কের উজ্জ্বলতা।

পরিবারের সদস্যরা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। জন্মসূত্রেই তারা আমাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার। আমাদের হাজারো স্মৃতি জড়িয়ে থাকে তাদের সাথে। তাদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় আমরা আজ এতদূর এসেছি। তাই মানুষ হিসেবে আমরা সকলেই প্রত্যাশা করি—জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী আমার পরিবারকে সম্মান করুক। কিন্তু সে যখন পরিবারকে নিয়ে উলটো উপহাস, তাচ্ছিল্য কিংবা অপমানকর মন্তব্য করে, তখন তা মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের সমাজে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের পরিবার নিয়ে উপহাস করা খুবই বহুল প্রচলিত একটি ক্ষতিকর প্রবণতা। এ কারণে দেখা যায়—একজন আরেকজনের পরিবারকে সহ্য করতে পারে না।

কাউকে উপহাস বা নিন্দা করা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ। এর শাস্তিও অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে বলেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! কোনো পুরুষ যেন অন্য পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা, হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। আর কোনো নারী যেন অপর নারীকে উপহাস না করে। কেননা, হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অপরের বিদ্রুপ করো না

Scanned by CamScanner

> এবং পরস্পরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। যারা এ আচরণ পরিত্যাগ করেনি, তারাই জালিম।' (সূরা হুজুরাত : ১১)

আমাদের সমাজে প্রায়ই দেখা যায়—স্ত্রীরা মেহমানদারির ক্ষেত্রে স্বামীর আত্মীয়স্বজনকে ততটা গুরুত্ব দেন না, যতটা দেন নিজের আত্মীয়স্বজনকে। এমনটা করা খুবই গর্হিত কাজ। স্ত্রীর উচিত স্বামীর আত্মীয়স্বজনকে সম্মান করা, মর্যাদা দেওয়া। তারা বাড়িতে এলে যথাযথ পন্থায় মেহমানদারি করা, তাদের আগমনে মুখ গোমড়া না করা। কোনোভাবেই তাদের প্রতি খিটখিটে মনোভাব কিংবা বিরক্তি প্রকাশ করা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে—স্বামীর পরিবার ও আত্মীয়স্বজনকে অসম্মান করার অর্থ স্বামীকেই অপমান করা। আর তাদের সম্মান করার অর্থ স্বামীর মর্যাদাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, মেহমানদারি করতে গিয়ে যেন ফরজ পর্দার বিধান লঙ্ঘন না হয়। আবার পর্দাকে অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করেও যেন সঙ্গীর পরিবারকে অসম্মান ও অবহেলা করা না হয়ে যায়। এক্ষেত্রে স্বামীর উচিত নয় স্ত্রীকে পরপুরুষের সামনে যেতে বাধ্য করা; বরং মেহমান এলে ঘরের কাজে স্ত্রীকে যথাসম্ভব সাহায্য করা উচিত।

একই সঙ্গে স্ত্রীর পরিবার ও আত্মীয়স্বজনকে মর্যাদার সাথে সম্বোধন করা স্বামীর কর্তব্য। রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা.)-এর পরিবারকে যারপরনাই সম্মান করতেন; এমনকী খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পরও যখনই কোনো পশু জবাই করতেন, কিছু মাংস খাদিজা (রা.)-এর বান্ধবীদের বাড়িতে উপহারস্বরূপ পাঠিয়ে দিতেন। যদি বান্ধবী না পেতেন, তবে মদিনার পথে পথে খুঁজে বেড়াতেন—এমন কেউ আছে কি না, যে খাদিজা (রা.)-কে পছন্দ করত।

হারাম সম্পর্ক : পরকীয়া বা হারাম সম্পর্ক যেকোনো দাম্পত্যজীবনকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দেয়, ধূলিসাৎ করে দেয় মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও শান্তি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বৈদেশিক নোংরা সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের দেশে আজ পরকীয়ার সয়লাব অবস্থা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা এই বিষবাষ্পকে মহামারির মতো ছড়িয়ে দিচ্ছে। নারী-পুরুষ উভয়ই এই ধ্বংসাত্মক ভাইরাসে আক্রান্ত। এই ভাইরাস শুধু দাম্পত্য সম্পর্ককেই ধ্বংস করে না; বরং তিন-তিনটি পরিবারকেও ধ্বংস করে দেয়। এটা নিশ্চিতভাবেই মানবতা বিধ্বংসী অপরাধ।

Scanned by CamScanner

পরকীয়ার সূচনা হয় খুবই ধীরগতিতে এবং অঘোষিতভাবে। মানুষ প্রথমে হেঁয়ালি মনে ঠাট্টাচ্ছলে পরনারী-পরপুরুষের সাথে যোগাযোগ শুরু করে। এরপর মনের অজান্তেই আস্তে আস্তে আটকা পড়ে এই ভয়ানক ফাঁদে। পুরুষরা সাধারণত পরনারীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য প্রথমে তার রূপ-গুণের ভূয়সী প্রশংসা করে এবং চেষ্টা করে তার হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠতে। নারীকে বোঝায়—'আপনি বর্তমান স্বামীর থেকে আরও উত্তম কাউকে পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন। আপনি স্বামীর থেকে আরও বেশি ভালোবাসা, যত্ন ও উত্তম আচরণ পাওয়ার প্রাপ্য। আপনার মতো কাউকে পেলে তো আমি মাথায় তুলে রাখতাম! সারাদিন পাশে পড়ে থাকতাম' ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে বিভিন্ন অপ্রাপ্তির কথা স্মরণ করিয়ে ফন্দিবাজ পুরুষরা নারীর মনে কৃত্রিম হতাশা তৈরি করে। অতঃপর তার দুঃখ ও অপ্রাপ্তির গল্প শোনার ফাঁদ পেতে কথা বলার পথ তৈরি করে। মিথ্যা সান্ত্বনা ও চটকদার বুলি শুনিয়ে নিজেকে উপস্থাপন করে শুভাকাঙ্ক্ষী ও সম্ভাব্য নায়ক হিসেবে। এভাবেই সুগম হয় হারাম সম্পর্কের পথ এবং এগিয়ে চলে নিষিদ্ধ কথোপকথন। একপর্যায়ে তা রূপ নেয় একান্ত ব্যক্তিগত আলাপনে।

পরকীয়াবাজ নারী-পুরুষ উভয়ই প্রথমে ভাবে—একটু সময়ই তো কাটাচ্ছি! এতে আর কী এমন ক্ষতি! কিন্তু একসময় এই চিন্তাই তাদেরকে ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে দেয়। সময়ের আবর্তনে তারা এমন সব ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি ও ভিডিও আদান-প্রদান করে বসে, যার ফলে পরস্পর পরস্পরের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে। এর অনিবার্য পরিণামে নিজ স্বামী বা স্ত্রী; এমনকী সন্তানকেও হত্যা করতে বাধ্য হয় তারা। এমন ভয়াবহতার কারণে ইসলাম এই ধরনের অনৈতিক সম্পর্ককে সমূলে হারাম ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেন—

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا -

'তোমরা যিনার ধারে কাছেও যেয়ো না। নিঃসন্দেহে এটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এবং খুবই জঘন্য পথ।'
(সূরা বনি ইসরাইল : ৩২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

'হে মুসলমানগণ! তোমরা ব্যভিচার পরিত্যাগ করো। কেননা, এর ছয়টি শাস্তি রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি দুনিয়াতে এবং

Scanned by CamScanner

তিনটি আখিরাতে প্রকাশ পাবে। দুনিয়ার তিন শাস্তি হলো—১. চেহারার উজ্জ্বলতা বিনষ্ট হয় ২. আয়ুষ্কাল সংকীর্ণ হয় এবং ৩. তার দরিদ্রতা চিরস্থায়ী হয়। আর যে তিনটি শাস্তি আখিরাতে প্রকাশ পাবে, তা হলো—সে আল্লাহর অসন্তুষ্টি, কঠিন হিসাব ও জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।' (বায়হাকি : ৫৬৪)

জীবনকে সুন্দর ও স্বাভাবিক রাখার জন্য আমাদের যেকোনো ধরনের হারাম সম্পর্ক; এমনকী যেসব কাজ হারাম সম্পর্কের দিকে ধাবিত করে, তা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। আল্লাহর সীমারেখার ব্যাপারে সতর্ক থাকলে দাম্পত্যজীবন মধুময় ও উপভোগ্য হবে, পাশাপাশি নিরাপদ থাকবে আল্লাহর দেওয়া পোশাক।

ইসলামি অনুশাসন না মানা : ইসলাম শান্তির অপর নাম। যেখানে ইসলামি অনুশাসন নেই, সেখানে শান্তি নেই। দাম্পত্যজীবনও এর বাইরে নয়। সুখী দাম্পত্যজীবনের জন্য পরিপূর্ণভাবে ইসলামি অনুশাসন মেনে চলতে হবে। কারণ, ইসলাম আমাদের শেখায় স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে। কেমন হবে তাদের আচার-আচরণ, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য। ইসলাম শেখায় স্ত্রীদের প্রতি নমনীয় হতে, ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে তর্কে না জড়াতে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسٰى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا-

'তোমরা তাদের (স্ত্রী) সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। যদি তারা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়, তবে হতে পারে আল্লাহ তোমার অপছন্দনীয় বিষয়টিতেই তোমার জন্য সীমাহীন কল্যাণ রেখেছেন।' (সূরা নিসা : ১৯)

আল্লাহর শিক্ষা কতই-না মহান! স্ত্রীকে পছন্দ না হলেও তার সাথে উত্তম ও নমনীয় আচরণ করতে বলেছেন। সুবহানাল্লাহ! ইসলামি অনুশাসনেই দাম্পত্যজীবনকে সহজ, সতেজ, নিরাপদ ও মধুময় করে। নিশ্চিত করে পারস্পরিক সম্মান, অধিকার ও মর্যাদা।

আমাদের পারিবারিক কলহের অন্যতম কারণ হলো আমরা দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছি, দূরে সরে গেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে। যদি জীবনের সমস্ত বিষয়কে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের নিকট সমর্পণ করি, তবে শান্তি ফিরে আসবেই আসবে।

Scanned by CamScanner

শেষ কথা

একটি দাম্পত্যজীবন সুখময় করার জন্য স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সহযোদ্ধা হতে হয়, সেক্রিফাইস করতে হয় জীবনের পরতে পরতে। ক্ষেত্রবিশেষে অনেক ছাড় দিতে হয়। ভাগাভাগি করতে হয় সুখ-দুঃখ, ভালোলাগা-ভালোবাসা। একটু মানিয়ে চলা, দুজন দুজনকে একটু বোঝার চেষ্টা করা, এটুকুই এনে দিতে পারে প্রেমময় দাম্পত্যজীবন। দাম্পত্য সম্পর্কের রসায়নটাই যে এমন—কখনো রোদ, কখনো বৃষ্টি; কখনো কান্না, কখনো হাসি; কখনো রাগ, কখনো রোমান্স। সবটাই যেন ভাগাভাগি করে নেওয়ার অনিন্দ্য আয়োজন। দুজনে যখন মিলেমিশে একাকার, দেহাবরণই তখন এ সম্পর্কের জুতসই উপমা।

Scanned by CamScanner

স্বপ্নকথা

মানুষমাত্রই স্বপ্ন দেখে: কেউ জেগে আবার কেউ ঘুমের রাজ্যে। মানুষের চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণে যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে, তেমনই তাদের স্বপ্নেও রয়েছে ভিন্নতা। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মানুষের দৈনিক আট ঘণ্টা ঘুমের মধ্যে প্রায় দেড় ঘণ্টাই স্বপ্নের দখলে থাকে বলে অভিমত প্রকাশ করেছে ফ্রান্সের একটি বিশেষজ্ঞ দল। বস্তুবাদীরা বলে—'স্বপ্ন সম্পূর্ণরূপে মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াতেই ঘটে থাকে; বাস্তবে এর প্রভাব নেই বললেই চলে। এটি অবচেতন মনের চলমান কাহিনিধারা বা চলচ্চিত্র মাত্র।' কিন্তু ইসলাম সকল স্বপ্নকে নিছকই মনস্তাত্ত্বিক কল্পছবিতে পর্যবসিত করে না; কিছু কিছু ক্ষেত্রে সত্যায়নও করে। স্বপ্নের মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ বা সতর্কবার্তা পেতে পারেন। এমনকী বিশ্বাসীদের স্বপ্নকে বলা হয়েছে নবুয়তের ৪৬ ভাগের এক ভাগ। আর নবিদের সকল স্বপ্নই ছিল ওহির অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বনবি মুহাম্মাদ ﷺ নবুয়তপ্রাপ্তির আগে বিভিন্ন ধরনের স্বপ্ন দেখতেন। যেমন : আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন—

> 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওহির সূচনা হয় নিদ্রাবস্থায় ভালো স্বপ্ন দেখার মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, (পরবর্তী সময়ে) তা ভোরের আলোর মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।' (বুখারি : ৬৯৮২)

৬ষ্ঠ হিজরিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি মদিনা থেকে মক্কায় গিয়ে হজ করছেন। সেই স্বপ্নকেই আল্লাহর নির্দেশ হিসেবে গণ্য করে সাহাবিদের নিয়ে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিলেন তিনি। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন—

Scanned by CamScanner

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ؕ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا-

'আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তক মুণ্ডিত এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন, যা তোমরা জানো না। এ ছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদের একটি আসন্ন বিজয়।'
(সূরা ফাতহ : ২৭)

এই আয়াত প্রমাণ করে; নবিদের স্বপ্নও ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নির্দেশনা। নইলে ওই সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ এত বড়ো ঝুঁকি নিতেন না! কারণ, কুরাইশরা তখন সদ্য আহজাবের যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে ব্যর্থ মনোরথে মক্কায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। নবিজি ভালো করেই জানতেন, এমন লজ্জাকর পশ্চাদ্‌গমনের বছর খানেক পরে কুরাইশরা নিরস্ত্র মুসলমানদের হাতের কাছে পেলে নিশ্চিত কচুকাটা করবে। কিন্তু সকল ঝুঁকি উপেক্ষা করে রওয়ানা হয়েছিলেন উমরার উদ্দেশ্যে। কেননা, এটা ছিল ওহিয়ে গায়েরে মাতলু—আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। অবশ্য সে বছর উমরা না করেই ফিরে আসতে হয়েছিল তাঁকে। পরবর্তী বছর অর্থাৎ, সপ্তম হিজরিতে তিনি উমরাটি সম্পাদন করেছিলেন।

অনুরূপ ঘটনা আমরা ইবরাহিম (আ.)-এর ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন—একমাত্র পুত্র ইসমাইলকে নিজ হাতে জবেহ করছেন। অতঃপর তিনি এই স্বপ্নকে আল্লাহর ইচ্ছা হিসেবে গণ্য করে পুত্রকে জবেহ করার প্রস্তুতি নিলেন। কুরআন সেই ঘটনা তুলে ধরেছে আমাদের সামনে—

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْۤ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْۤ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ-

'সে পুত্র যখন তাঁর সাথে কাজকর্ম করার বয়সে পৌঁছল, তখন ইবরাহিম তাঁকে বলল—"হে পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখি তোমাকে

Scanned by CamScanner

> আমি জবেহ করছি। এখন তুমি বলো, এই ব্যাপারে তুমি কী মনে করো?" সে বলল—"হে আব্বাজান! আপনাকে যা হুকুম করা হয়েছে, তা-ই করে ফেলুন। আপনি আমাকে ধৈর্যশীল হিসেবেই পাবেন, ইনশাআল্লাহ।"' (সূরা সফফাত : ১০২)

স্বপ্নে প্রাপ্ত আদেশকে বাস্তবায়ন করার এই প্রয়াসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর অনুগত পয়গম্বরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন—

وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰۤاِبْرٰهِيْمُ - قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى

الْمُحْسِنِيْنَ - اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ -

> 'আমি আওয়াজ দিলাম, হে ইবরাহিম! তুমি স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়েছ। আমি সৎকর্মশীলদের এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চিতভাবেই এটি ছিল একটি প্রকাশ্য পরীক্ষা।'
> (সূরা সফফাত : ১০৪-১০৬)

ইবরাহিম (আ.)-এর এই স্বপ্ন যদি নিছকই স্বপ্ন হতো, তাহলে কখনোই তিনি ধারালো ছুরি নিয়ে প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে জবাই করার জন্য অগ্রসর হতেন না। নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্বপ্নের মাধ্যমে ওহি আসার এই ধারাবাহিকতাও শেষ হয়ে গেছে। তবে অনেক সময় আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে ভালোবেসে স্বপ্নযোগে সুসংবাদ বা অর্থবহ ইঙ্গিত প্রদান করেন। আর এজন্যই নবিজি মুমিনের স্বপ্নকে তুলনা করেছেন নবুয়তি রেওয়াজের সঙ্গে। আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন—

> 'ভালো স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬ ভাগের এক ভাগ।' (বুখারি : ৬৫৮৮)

নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেলেও জারি রয়েছে মুবাশশিরাত বা সুসংবাদ। এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক হাদিসে রাসূল ﷺ বলেন—

> 'নবুয়তের আর কিছু অবশিষ্ট নেই, বাকি আছে কেবল মুবাশশিরাত বা সুসংবাদ।' সাহাবিগণ প্রশ্ন করলেন—'মুবাশশিরাত কী?' তিনি বললেন—'ভালো স্বপ্ন।' (বুখারি : ৬৯৯০)

এজন্য মুমিন জীবনে স্বপ্ন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ঘুমের ঘোরে মানুষ যেমন ভালো স্বপ্ন দেখে, তেমনই ভয়ংকর দুঃস্বপ্নও দেখতে পারে কখনো কখনো। সুন্দর স্বপ্ন হৃদয়ে প্রশান্তি ও সুখানুভূতি সঞ্চার করলেও দুঃস্বপ্ন

Scanned by CamScanner

মানুষকে বিচলিত করে তোলে, চরম উৎকণ্ঠায় অস্থির করে রাখে মনোজগৎ। তাই স্বপ্ন দেখার পর আমাদের জন্য কিছু শরয়ি দিকনির্দেশনা মেনে চলা আবশ্যক। কোন স্বপ্ন দেখলে কী করা উচিত, তা বোঝার জন্য সর্বাগ্রে স্বপ্নের প্রকারভেদগুলো জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

স্বপ্নের প্রকারভেদ

স্বপ্নের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিসে রাসূল ﷺ বলেন—

> 'স্বপ্ন তিন প্রকার। **এক.** ভালো স্বপ্ন; যা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ। **দুই.** ভীতিপ্রদ স্বপ্ন; যা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। **তিন.** সাধারণ স্বপ্ন; যা মানুষ চিন্তা-ভাবনা ও ধারণা অনুযায়ী দেখে থাকে।' (আবু দাউদ : ৫০২১)

সুতরাং এই হাদিসের আলোকে স্বপ্নকে তিন প্রকারে শ্রেণিভুক্ত করা যায়—

১. রাহমানি স্বপ্ন : এটি সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিন ব্যক্তিকে দেখানো হয়ে থাকে। আরবিতে এটাকে বলা হয় صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا-(সদ্দাকতার রুইয়া), যেমনটি কুরআনে সূরা ফাতহ-এর ২৭ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

এই ধরনের স্বপ্ন দেখলে মুমিনের উচিত আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করা। চাইলে এ ধরনের স্বপ্নের কথা অন্যের কাছে বর্ণনা করা যেতে পারে। তবে এমন ব্যক্তিকে শোনাবে, যে তাকে ভালোবাসে এবং সর্বাবস্থায় তার কল্যাণকামী। তা না হলে এটি অনেক সময় হিংসার শিকার হতে পারে। আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এমনটিই বলেছেন রাসূল ﷺ—

> 'তোমাদের কেউ যদি এমন স্বপ্ন দেখে যা তার পছন্দনীয়, তাহলে বুঝতে হবে সে স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকেই দেখানো হয়েছে। অতএব, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে।' (বুখারি : ৬৯৮৫)

২. শাইতানি স্বপ্ন : এটি শয়তানের দেখানো প্ররোচনামূলক স্বপ্ন। এ ধরনের স্বপ্ন সাধারণত অশ্লীল, ভীতিকর কিংবা দুশ্চিন্তা উদ্রেককারী হয়ে থাকে। বেশিরভাগ সময়ই এসব দেখে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়, প্রচণ্ড ভয়ে আমরা আঁতকা ঘুম থেকে জেগে উঠি। রাসূল ﷺ বলেন—

Scanned by CamScanner

'ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।' (বুখারি : ৬৯৮৪)

এ ধরনের স্বপ্ন দেখার পর মুমিনের করণীয় ছয়টি। যথা—

ক. মুমিনের প্রথম কর্তব্য হলো—আল্লাহর নিকট দুঃস্বপ্নের ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা। এই জন্য ব্যক্তি তিনবার 'আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতনির রজিম' পড়বে।[৪] সাথে এই দুআটিও পড়া যেতে পারে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مِنْ هٰذِهِ الرُّؤْيَا-

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এই স্বপ্নের অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ চাই।' (মুসলিম : ২২৬২)

খ. বাম দিকে তিনবার থুতু নিক্ষেপ করা।[৫] রাসূল ﷺ বলেন—

'যখন কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে, সে যেন তা থেকে আশ্রয় চায় এবং বাম দিকে থুতু ফেলে। তাহলে স্বপ্ন আর তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' (বুখারি : ৬৯৮৬)

গ. যে কাতে ঘুমিয়ে খারাপ স্বপ্ন দেখেছে, তা পরিবর্তন করে অন্য কাতে শোয়া অথবা স্থান পরিবর্তন করা।[৬] জাবির (রা.)-এর বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেন—

'যদি তোমাদের কেউ এমন স্বপ্ন দেখে, যা সে পছন্দ করে না, তাহলে তিনবার বাম দিকে থুতু দেবে, তিনবার শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং যে পাশে শুয়েছিল, তা পরিবর্তন করবে।' (মুসলিম : ৬০৪১)

ঘ. খারাপ স্বপ্নের কথা কারও কাছে না বলা। স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী না হলে নিজ থেকে এর ব্যাখ্যা দাঁড় করানোও অনুচিত।[৭]

ঙ. স্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভেঙে গেলে উঠে দুই রাকাত নামাজ আদায় করা। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি করিম ﷺ বলেন—

---

[৪] মুসলিম : ২২৬২
[৫] মুসলিম : ২২৬১
[৬] মুসলিম : ২২৬২
[৭] বুখারি : ৬৫৮৩

Scanned by CamScanner

> 'যদি তোমাদের কেউ এমন স্বপ্ন দেখে, যা সে পছন্দ করে না, তাহলে উঠে নামাজ পড়বে এবং মানুষের কাছে তা বলা থেকে বিরত থাকবে।' (মুসলিম : ৬০৪২)

চ. দুঃস্বপ্নে নিদ্রা ভঙ্গের পর পুনরায় ঘুমোতে চাইলে পার্শ্ব পরিবর্তন করে নেওয়া। অর্থাৎ, আপনি ডান কাতে বাজে স্বপ্ন দেখলে পাশ ফিরে বাম কাত হবেন। অথবা জায়গা পরিবর্তন করে অন্যত্র ঘুমাবেন।

৩. নাফসানি স্বপ্ন : মানুষ সারাদিনের কর্মব্যস্ততায় যেসব চিন্তা-ভাবনা ও কাজে মগ্ন থাকে, তারই প্রতিফলন ঘটে নাফসানি স্বপ্নে। এটি মানুষের চিন্তা-চেতনার কল্পচিত্র। এই স্বপ্ন আল্লাহ বা শয়তান কারও নিকট থেকেই আসে না। ব্যক্তি তার নিজের লালিত চিন্তা ও কল্পনাকেই ঘুমের ভেতর স্বপ্ন হিসেবে দেখে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থহীন এবং পরস্পর সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন খণ্ডচিত্রে ঠাসা থাকে এসব স্বপ্ন।

সারাদিন আপনার চিন্তা-ভাবনার মধ্যে যে ব্যাপারগুলো বেশি স্থান পায়, সেগুলোই আপনি রাত্রিবেলা অবচেতনে দেখতে পান। ধরা যাক, দিনের বেলা কেউ যদি খেলাধুলা নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে, তাহলে রাতের বেলা তার স্বপ্নে রোমাঞ্চকর ফুটবল দ্বৈরথ ভেসে ওঠা স্বাভাবিক। আবার দিনের বেলা হয়তো সে বাজারে গিয়ে ব্যাবসা-বাণিজ্য করে; ঘুমের ঘোরে তার পক্ষে জিনিসপত্র দরদাম করাও অসম্ভব নয়। এগুলো খুব সাধারণ স্বপ্ন। এই ধরনের স্বপ্ন দেখলে বিচলিত বা চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। সাধারণত এই স্বপ্নগুলো কোনোই অর্থ বহন করে না। বেশিরভাগই হয় এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত এবং যৌক্তিক ব্যাখ্যার অযোগ্য।

ভালো স্বপ্ন কোনটা

স্বপ্ন দেখার পর কীভাবে বুঝব কোনটা ভালো স্বপ্ন এবং কোনটা খারাপ—এই বিষয়টি নির্ণয়ের জন্য বিশ্বনবি ﷺ একটি চমৎকার সূত্র বলে দিয়েছেন। আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন—

> 'যখন তোমাদের কেউ এমন স্বপ্ন দেখে যা তার ভালো লাগে, সে বুঝে নেবে—এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। এই স্বপ্নের জন্য সে আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং অন্যকে এ ব্যাপারে জানাবে। আর যদি এমন স্বপ্ন দেখে যা সে পছন্দ করে না, তবে বুঝে নেবে—

Scanned by CamScanner

> সেটা শয়তানের পক্ষ থেকে। তখন এ স্বপ্নের ক্ষতি থেকে সে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং বাঁ দিকে তিনবার থুতু নিক্ষেপ করবে এবং কাউকে এ স্বপ্নের কথা বলবে না। মনে রাখবে, এ স্বপ্ন তার ক্ষতি করতে পারবে না।' (বুখারি : ৬৫৮৩)

স্বপ্নের ব্যাপারে এই হাদিসটি একটি কমপ্রিহেন্সিভ গাইডলাইন। এই হাদিসটি স্পষ্টতই বলে দিচ্ছে—কোন ধরনের স্বপ্ন দেখলে আমাদের করণীয় কী হওয়া উচিত।

কোন ধরনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রয়োজন

ইতোমধ্যেই আমরা জেনেছি, সব স্বপ্নের ব্যাখ্যা হয় না। নিজের খেয়াল-খুশি থেকে উদ্ভূত নাফসানি ব্যাখ্যা করা চলে না, ব্যাখ্যার প্রয়োজনও নেই। এই ধরনের স্বপ্ন দেখলে কারও নিকট তা বর্ণনা না করে চুপচাপ থাকাই শ্রেয়। এর ফলে যত বড়ো দুঃস্বপ্নই হোক না কেন, এটি তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ব্যাখ্যার প্রয়োজন শুধু রাহমানি স্বপ্নের, যা আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ দেখিয়ে থাকেন। এ ধরনের স্বপ্ন আবার ব্যাখ্যার দিক থেকে দুই ধরনের—

এক. স্পষ্ট সূত্রের স্বপ্ন : এমন অনেক স্বপ্ন রয়েছে, যা বাস্তবে হুবহু ঘটে যায়। এই ধরনের স্বপ্নের সূত্র অনেকটাই সুস্পষ্ট। এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এমনই কিছু স্বপ্নের ঘটনা হাদিসে এসেছে—

> সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) বর্ণনা করেন—রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই তাঁর সাহাবিদের বলতেন—'তোমাদের কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছ কি?' যাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছা, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করতেন। তিনি একদিন সকালে আমাদের বললেন—
>
> 'গত রাতে আমার কাছে দুজন আগন্তুক এলো। তারা আমাকে উঠিয়ে বলল—"চলুন।" আমি তাঁদের সঙ্গে চললাম। আমরা কাত হয়ে শুয়ে থাকা এক লোকের কাছে এলাম। দেখলাম, অন্য এক লোক তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফেটে যাচ্ছে। আর পাথর নিচে গিয়ে পড়ছে। এরপর আবার সে পাথরটির পিছু পিছু গিয়ে তা নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা আগের

Scanned by CamScanner

মতো আবার ভালো হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে আবার তেমনই আচরণ করছে, যা প্রথমবার করেছিল।

আমি তাদের (সাথিদ্বয়কে) বললাম—"সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?" তারা বলল—"চলুন, চলুন।" আমরা চললাম। এরপর আমরা চিৎ হয়ে শোয়া এক লোকের কাছে এলাম। এখানেও দেখলাম, তার নিকট এক লোক লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটি সেই আঁকড়া দিয়ে শুয়ে থাকা ব্যক্তির মুখমণ্ডল থেকে নাসারন্ধ্র, চোখসহ মাথার পেছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে।

এরপর ওই লোকটি শায়িত লোকটির অপরদিকে যায় এবং প্রথমদিকের সঙ্গে যেমন আচরণ করেছে, অপরদিকের সঙ্গেও তা করে। ওইদিক থেকে অবসর হতে না হতেই প্রথমদিকটি আগের মতো ভালো হয়ে যায়। তারপর আবার প্রথমবারের মতো আচরণ করে। আমি বললাম—"সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?" তারা আমাকে বলল—"চলুন, চলুন।" আমরা চললাম এবং চুলার মতো একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম। উঁকি মেরে দেখলাম, তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আর নিচ থেকে বের হওয়া আগুনের লেলিহান শিখা তাদের স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদের স্পর্শ করে, তখনই তারা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে ওঠে। আমি তাদের বললাম—"এরা কারা?" তারা বলল—"চলুন, চলুন।"

আমরা চললাম এবং একটা নদীর (তীরে) গিয়ে পৌঁছলাম। নদীটি ছিল রক্তের মতো লাল। দেখলাম, এই নদীতে সাঁতার কাটছে এক ব্যক্তি। আর নদীর তীরে অন্য এক লোক অনেকগুলো পাথর একত্রিত করে রেখেছে নিজের কাছে। সাঁতারকারী লোকটি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর পাথরওয়ালা লোকটির নিকট আসে এবং নিজের মুখ খুলে দেয়। আর পাথরওয়ালা লোকটি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দেয়। এরপর সে চলে যায় এবং সাঁতার কাটতে থাকে; আবার তার কাছে ফিরে আসে। এভাবে যখনই সে তার কাছে ফিরে আসে, তখনই নিজের মুখ খুলে দেয় এবং ওই ব্যক্তি তার মুখে একটা পাথর ঢুকিয়ে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম—"এরা কারা?" তারা বলল—"চলুন, চলুন।"

আমরা চললাম এবং এমন একজন কুশ্রী লোকের নিকট এসে পৌঁছলাম—তোমার দৃষ্টিতে যে সবচেয়ে কুশ্রী। দেখলাম, সে নিকটে

Scanned by CamScanner

আগুন জ্বালাচ্ছে আর তার চতুর্দিকে দৌড়াচ্ছে। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম—"এই লোকটি কে?" তারা বলল—"চলুন, চলুন।"

আমরা চললাম এবং একটা সজীব-শ্যামল বাগানে গিয়ে হাজির হলাম, যেখানে বসন্তের হরেক রকম ফুলের কলি ফুটে আছে। আর বাগানের মাঝে আসমানের থেকে অধিক উঁচু দীর্ঘকায় একজন পুরুষ, তার মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছি না। এমনিভাবে তার চারপাশে এত বিপুলসংখ্যক বালক-বালিকা দেখলাম যে, এত অধিক বালক-বালিকা আর কখনো দেখিনি। আমি তাদের বললাম—"উনি কে? এরা কারা?" তারা আমায় বলল—"চলুন, চলুন।"

আমরা চললাম এবং একটা বিরাট বাগানে গিয়ে পৌছলাম। এমন বড়ো ও সুন্দর বাগান আমি আর কখনো দেখিনি। তারা আমাকে বলল—"এর ওপরে উঠুন।" আমরা ওপরে উঠলাম। শেষ পর্যন্ত সোনা-রুপার ইটের তৈরি একটি শহরে গিয়ে হাজির হলাম। শহরের দরজায় পৌছে আমরা দরজা খুলতে বললাম। দরজা খুলে দেওয়া হলো এবং আমরা তাতে প্রবেশ করলাম।

সেখানে আমাদের সঙ্গে এমন কিছু লোক সাক্ষাৎ করল, যাদের শরীরের অর্ধেক খুবই সুন্দর, যা তোমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে সুন্দর। আর বাকি অর্ধেক অত্যন্ত কুশ্রী, তোমার দৃষ্টিতে যা সবচেয়ে কুশ্রী। আমার সাথিদ্বয় ওদের বলল—"যাও ওই নদীতে গিয়ে নেমে পড়ো।" সেই নদীটি ছিল প্রশস্ত ও প্রবাহিত, পানি ছিল দুধের মতো সাদা। ওরা তাতে গিয়ে নেমে পড়ল। অতঃপর আবার আমাদের কাছে ফিরে এলো। দেখা গেল, তাদের যাবতীয় শ্রীহীনতা দূর হয়ে গেছে, বদলে গেছে খুবই সুন্দর আকৃতিতে।

তারা আমাকে বলল—"এটা জান্নাতে আদন, আপনারই বাসস্থান।" আমি অনেকটা ওপরের দিকে তাকালাম। সেখানে ধবধবে সাদা মেঘের মতো একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম। তারা আমাকে বলল—"এটা আপনার বাসগৃহ।" তাদেরকে বললাম—"আল্লাহ তোমাদের মাঝে বরকত দিন! আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এতে প্রবেশ করি।" তারা বলল—"আপনি অবশ্যই এতে প্রবেশ করবেন, তবে এখন নয়।"

Scanned by CamScanner

আমি বললাম—"আমি এ রাতে অনেক বিস্ময়কর বিষয় দেখলাম, এগুলোর তাৎপর্য কী?" তারা জবাব দিলো—"ঠিক আছে, বলছি তাহলে। ওই যে প্রথম ব্যক্তি, যার কাছে আপনি পৌঁছেছিলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল—সে হলো ওই ব্যক্তি, যে কুরআন গ্রহণ করে তা ছেড়ে দিয়েছে। আর ফরজ সালাত ছেড়ে শায়িত থেকেছে নিদ্রায়।

আর ওই ব্যক্তি, যার কাছে গিয়ে দেখেছেন তার মুখের এক ভাগ মাথার পেছন দিক পর্যন্ত (বিস্তৃত) এবং নাসারন্ধ্র ও চোখসহ মাথার পেছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল; সে হলো ওই ব্যক্তি, যে সকালে নিজ ঘর থেকে বেরিয়ে এমন মিথ্যা বলে, যা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে (অর্থাৎ, গুজব ছড়ায়)। চুলা সদৃশ গর্তের ভেতর থাকা ওই সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ হলো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর দল। আর ওই ব্যক্তি, যার নিকট গিয়ে দেখেছিলেন সে নদীতে সাঁতার কাটছে এবং তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সে হলো সুদখোর। এবং ওই কুশ্রী ব্যক্তি, যে আগুনের কাছে থেকে আগুন জ্বালাচ্ছিল আর তার চারপাশে দৌড়াচ্ছিল, সে হলো জাহান্নামের দারোগা। বাগানে থাকা সেই দীর্ঘকায় ব্যক্তি হলেন ইবরাহিম (আ.)। তাঁর আশেপাশের বালক-বালিকারা হলো ওইসব শিশু, যারা ফিতরাতের (স্বভাবধর্মের) ওপর মৃত্যুবরণ করেছে।"

(স্বপ্নের এতটুকু বর্ণনার পর) কিছুসংখ্যক মুসলিম জিজ্ঞেস করলেন—"হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও কি?" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন—"হ্যাঁ, মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও।"

(রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার স্বপ্নের বর্ণনা শুরু করলেন।) আর ওইসব লোক, যাদের অর্ধাংশ অতি সুন্দর ও অর্ধাংশ অতি কুশ্রী, তারা হলো ওই সম্প্রদায়, যারা সৎ-অসৎ উভয় কাজ মিশ্রিতভাবে করেছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।' (বুখারি : ৭০৪৭)

আরও একটি হাদিস থেকে স্পষ্ট স্বপ্নের উদাহরণ পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন—

'আমি রাসূল ﷺ-এর যুগে অবিবাহিত যুবক ছিলাম। মসজিদেই রাত কাটাতাম। আর যারাই স্বপ্নে কিছু দেখত, নবি ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করত সেটা। আমি বললাম—"হে আল্লাহ! যদি

Scanned by CamScanner

> তোমার নিকট আমার জন্য কোনো কল্যাণ থাকে, তাহলে আমাকে কোনো স্বপ্ন দেখাও, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করেন।" আমি ঘুমিয়ে গেলাম। দেখতে পেলাম, দুজন ফেরেশতা এসে আমাকে নিয়ে চলল। এরপর তাদের সঙ্গে অপর একজন ফেরেশতার সাক্ষাৎ ঘটল। সে আমাকে বলল—"তোমার কোনো ভয়ের কারণ নেই। তুমি তো একজন নেককার লোক।" এরপর তাঁরা আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চলল, সেটি যেন কূপের মতো গোলাকার। আর এর মধ্যে বেশ কিছু লোক, তাদের কতককে আমি চিনতে পারলাম। এরপর তারা আমাকে নিয়ে চলল ডান দিকে। যখন সকাল হলো, আমি হাফসা (রা.)-এর নিকট সব ঘটনা উল্লেখ করলাম।' (বুখারি, ই.ফা : ৬৫৫৬)

অপর একটি হাদিসে আবু হুরায়রা (রা.) বলেন—

> 'একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন—"আমি একবার ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। একজন মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে অজু করছে। জিজ্ঞেস করলাম—এই প্রাসাদটি কার? সে বলল—উমরের। আমি তাঁর আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করলাম। অতঃপর ফিরে এলাম।" এ কথা শুনে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কেঁদে ফেললেন। বললেন—"আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক! হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছেও কি আত্মমর্যাদাবোধ প্রদর্শন করব?"' (বুখারি : ৭০২৩)

দুই. অস্পষ্ট সূত্রের স্বপ্ন : এমন স্বপ্ন, যার সূত্র অস্পষ্ট। এই ধরনের স্বপ্ন রূপক বা ইঙ্গিতপূর্ণ হয়ে থাকে। যেমন : শিশু বয়সে ইউসুফ (আ.) স্বপ্নে দেখেছিলেন—এগারোটি তারকা, চন্দ্র ও সূর্য তাঁকে সিজদা করছে। এখানে এগারোটি তারকা দ্বারা ইউসুফ (আ.)-এর এগারো ভাইকে বোঝানো হয়েছিল। চন্দ্র ও সূর্য দ্বারা তাঁর মা-বাবাকে আর সিজদা করার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল আনুগত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের বিষয়টি। বহুকাল পর সত্যে রূপান্তরিত হয়েছিল এই স্বপ্ন। একইভাবে মিশরের বাদশাহ স্বপ্নে দেখেছিলেন—সাতটি মোটাতাজা গাভি সাতটি রোগা গাভিকে খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সতেজ শিষকে গ্রাস করছে সাতটি শুকনো শিষ। কুরআন সেই স্বপ্নের ব্যাপারে বলেছে—

Scanned by CamScanner

وَ قَالَ الْمَلِكُ اِنِّیْۤ اَرٰی سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ یَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ سَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ یٰبِسٰتٍ ؕ یٰۤاَیُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِیْ فِیْ رُءْیَایَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْیَا تَعْبُرُوْنَ-

'একদিন বাদশাহ বলল—"আমি স্বপ্ন দেখেছি, সাতটি মোটা গাভিকে সাতটি পাতলা গাভি খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শিষ ও সাতটি শুকনো শিষ। হে সভাসদবৃন্দ! আমাকে এ স্বপ্নের তাবির বলে দাও, যদি তোমরা স্বপ্নের মানে বুঝে থাকো।"' (সূরা ইউসুফ : ৪৩)

বাদশাহের এই স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যাদানে ব্যর্থ হয়ে ইউসুফ (আ.)-এর শরণাপন্ন হলো রাজমহলের সকল জ্যোতিষী। ইউসুফ (আ.) সব শুনে অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ এক ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁর দেওয়া সেই ব্যাখ্যাকে কুরআন উদ্ধৃত করেছে এভাবে—

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِیْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِیْ سُنْۢبُلِهٖۤ اِلَّا قَلِیْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ- ثُمَّ یَاْتِیْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ یَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِیْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ- ثُمَّ یَاْتِیْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِیْهِ یُغَاثُ النَّاسُ وَ فِیْهِ یَعْصِرُوْنَ-

'ইউসুফ বলল—"তোমরা সাত বছর পর্যন্ত লাগাতার চাষাবাদ করতে থাকবে। এ সময় তোমরা যে ফসল কাটবে, তা থেকে সামান্য পরিমাণ তোমাদের আহারের প্রয়োজনে বের করে নেবে এবং বাদবাকি সব শিষসহ মজুদ করে রাখবে। তারপর সাতটি বছর আসছে বড়োই কঠিন। তোমরা যে শস্য মজুদ করে রেখেছ, তা ওই সময়ে খাবে। যদি কিছু বেঁচে যায়, তবে তা সংরক্ষণ করবে। এরপর আবার এক বছর এমন আসবে—যখন রহমতের বৃষ্টিধারার মাধ্যমে মানুষের আবেদন পূর্ণ করা হবে এবং তারা রস নিংড়াবে।"' (সূরা ইউসুফ : ৪৭-৪৯)

Scanned by CamScanner

ব্যাখ্যা চাইব কার কাছে

স্বপ্নের ব্যাখ্যা খুবই স্পর্শকাতর একটি বিষয়। রাসূল ﷺ-এর ভাষ্যমতে, স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা করা হয়, পরবর্তী সময়ে সেটাই বাস্তবায়িত হয়। তাই ব্যাখ্যা চাওয়ার ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা উচিত, যিনি এ সম্পর্কে প্রাজ্ঞ, কল্যাণকামী এবং তাকওয়ায় পূর্ণ। এর বিপরীতে অজ্ঞ, পাপী, হিংসুক ও পরশ্রীকাতর কোনো ব্যক্তির নিকট স্বপ্নের কথা বললে বা ব্যাখ্যা চাইলে মারাত্মক বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। আবু রাজিন আল উকাইলির বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'স্বপ্ন হলো উড়ন্ত পাখির পায়ের মতো—যা ভালো ও খারাপ উভয়ের সম্ভাবনা রাখে; যতক্ষণ না তার ব্যাখ্যা করা হয়। যখন একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তখন সেটিই বাস্তবায়িত হয়।'
> (আবু দাউদ : ৪৯৩৬)

আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> 'স্বপ্নকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, সেভাবেই তা বাস্তবায়িত হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন স্বপ্ন দেখবে, তখন আলিম অথবা কল্যাণকামী ব্যতীত কারও কাছে তা বর্ণনা করবে না।'
> (সহিহ ইবনে হিব্বান : ৬০৫০)

বিষয়টির গুরুত্ব আয়িশা (রা.) বর্ণিত একটি হাদিস থেকে আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়। আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'মদিনার অধিবাসী এক মহিলার স্বামী ছিল ব্যবসায়ী। ব্যবসায়িক কাজে সে বিভিন্ন দেশে আসা-যাওয়া করত। স্বামী যখনই বিদেশে যেত, মহিলাটি তখনই একটি স্বপ্ন দেখত। আর তার স্বামী সর্বদা তাকে গর্ভবতী রেখে সফরে যেত। একদিন মহিলাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল—"আমার স্বামী সফরে গেছে। আমি গর্ভবতী। স্বপ্নে দেখলাম, আমার ঘরের চৌকাঠ ভেঙে গেছে এবং আমি একটি এক চোখ কানা সন্তান প্রসব করেছি।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন—"ভালো স্বপ্ন দেখেছ। ইনশাআল্লাহ, তোমার স্বামী তোমার কাছে সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসবে আর তুমি একটি সুস্থ-সুন্দর সন্তান প্রসব করবে।" এভাবে সে দুই-তিনবার একই স্বপ্ন দেখল এবং প্রতিবারই

Scanned by CamScanner

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলো। তিনি প্রতিবারই এ রকম ব্যাখ্যাই দিলেন এবং প্রতিবার ঠিক তা-ই ঘটল।

একদিন মহিলাটি পূর্বের ন্যায় নবিজির খোঁজে এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন অনুপস্থিত ছিলেন। এবারও সে স্বপ্ন দেখে এসেছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম—"হে আল্লাহর বান্দি! তুমি রাসূলুল্লাহর নিকট কী জিজ্ঞেস করবে?" সে বলল—"আমি একটি স্বপ্ন প্রায়ই দেখি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসি। তিনি সুন্দর ব্যাখ্যা দেন এবং সেটাই বাস্তবে পরিণত হয়।" বললাম—"আমাকে বলো কী সেই স্বপ্ন?" সে বলল—"রাসূলুল্লাহ ﷺ আসুক, তারপর বলব।" আমি তাকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলাম স্বপ্নটি বলার জন্য, যেমনটি আমার অভ্যাস। অবশেষে সে আমাকে স্বপ্নের কথা বলতে বাধ্য হলো। (স্বপ্নের কথা শুনে) বললাম—"আল্লাহর কসম! তোমার স্বপ্ন যদি সত্যি হয়, তাহলে তোমার স্বামী মারা যাবে। আর তুমি একটি অপূর্ণাঙ্গ বা অসুস্থ ছেলে প্রসব করবে।"

মহিলাটি বসে কাঁদতে লাগল তখন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে বললেন—"হে আয়িশা! এর কী হয়েছে?" আমি পুরো ঘটনা এবং স্বপ্ন সম্পর্কে আমার দেওয়া ব্যাখ্যা নবিজিকে জানালাম। নবিজি বললেন—"হে আয়িশা! এটা কী করলে তুমি? যখন কোনো মুসলমানের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করবে, তখন সুন্দর ও কল্যাণকর ব্যাখ্যা দেবে। মনে রাখবে, স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, বাস্তবে তা-ই সংঘটিত হয়।" আল্লাহ তায়ালার কী ইচ্ছা জানি না, কিছুদিন পর মহিলাটির স্বামী মারা গেল এবং দেখলাম, সে একটি অসুস্থ বা অপূর্ণাঙ্গ ছেলে প্রসব করেছে।' (দারেমি : ২১৬৩)

তা ছাড়া স্বপ্ন না দেখে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলা কিংবা বানোয়াট কোনো স্বপ্নের ব্যাখ্যা কারও কাছে জানতে চাওয়াও ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস উল্লেখযোগ্য—

'এক ব্যক্তি উমর (রা.)-এর কাছে এসে বলল—"আমি স্বপ্নে দেখেছি, জমিন তরতাজা-সবুজ হয়েছে। এরপর আবার শুকিয়েও গেছে। আবার সবুজ-তরতাজা হয়েছে এবং আবারও শুকিয়ে গেছে।" উমর (রা.) বললেন—"এর ব্যাখ্যা হলো—তুমি প্রথমে

Scanned by CamScanner

মুমিন থাকবে, পরে কাফির হয়ে যাবে। আবার মুমিন হবে, এরপর আবার কাফির হয়ে যাবে এবং কাফির অবস্থায় তুমি মৃত্যুবরণ করবে।" এ কথা শুনে লোকটি বলল—"আসলে আমি এ রকম কোনো স্বপ্ন-ই দেখিনি।" উমর (রা.) বললেন—"যে বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করেছিলে, তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।" তোমার বিষয়ে ফয়সালা হয়ে গেছে, যেমনভাবে হয়েছিল ইউসুফ (আ.)-এর সাথির ব্যাপারে।"' (মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক : ২০৩৬২)

সত্য স্বপ্নের আলামত

আমাদের দেখা স্বপ্ন সত্য কি না, কিছু আলামতের আলোকে তা বোঝা যায় এবং সেটা চিহ্নিত করা যায়—

১. **নেককার ও সত্যবাদী মানুষের স্বপ্ন :** আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

 'যখন কিয়ামতের সময় নিকটে আসবে, তখন মুমিনের স্বপ্ন খুব কম মিথ্যা হবে। যে ব্যক্তি অধিক সত্যবাদী, তার স্বপ্ন তখন তত বেশি সত্য হবে।' (তিরমিজি : ২২৭০)

২. **প্রশান্তি ও স্বস্তিদায়ক স্বপ্ন :** সত্য স্বপ্ন দেখার পর মনে প্রশান্তি অনুভূত হবে, কোনোরূপ অস্থিরতা কাজ করবে না।

৩. **সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট স্বপ্ন :** অনেকে স্বপ্ন মনে রাখতে পারে না। কী দেখেছিল, সেটা বেমালুম ভুলে যায়। সত্য স্বপ্ন এমন নয়। স্বপ্ন সত্য হওয়ার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্যই হলো—সেটি সংক্ষিপ্ত হবে এবং ঘুম ভেঙে যাওয়ার পরও মনে গেঁথে থাকবে দীর্ঘ সময়।

৪. **একই স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি :** বিশেষ কোনো স্বপ্ন নিজে বারবার দেখা বা একই স্বপ্ন একাধিক মানুষ দেখা সত্য হওয়ার আলামত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আজানের বাক্যগুলো আল্লাহ তায়ালা স্বপ্নযোগে ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহাবিদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। একাধিক সাহাবি দেখেছিলেন প্রায় অভিন্ন সেই স্বপ্ন। এটা ছিল সত্য স্বপ্নের দৃষ্টান্ত। অনুরূপভাবে লাইলাতুল কদরের রাত নির্ধারণ নিয়ে রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের সত্য স্বপ্নের ঘটনাটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আবদুল্লাহ ইবনে জায়দ ইবনে আবদ রব্বিহি (রা.) থেকে বর্ণিত—

Scanned by CamScanner

'রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ঘণ্টা বাজানোর নির্দেশ দিলেন। (সেদিন) আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক লোক একটি ঘণ্টা নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম— "হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি এ ঘণ্টাটি বিক্রি করবে?" সে বলল—"তুমি এ ঘণ্টা দিয়ে কী করবে?" আমি বললাম— "আমরা এ ঘণ্টা বাজিয়ে মানুষকে সালাতের জামাতে ডাকব।" সে বলল—"আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম পন্থা বলে দেবো না?" আমি বললাম—"হ্যাঁ অবশ্যই।" সে বলল—"তুমি বলো—আল্লাহু আকবার!" এভাবে আজানের শেষ বাক্য পর্যন্ত আমাকে আবৃত্তি করে শোনাল। অনুরূপ ইকামতও বলে দিলো। ভোরে উঠে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট স্বপ্নের সব কথা বললাম। তিনি বললেন—"ইনশাআল্লাহ এ স্বপ্ন সত্য। এখন তুমি স্বপ্নে যা দেখেছ, বিলালের সাথে দাঁড়িয়ে তাঁকেও তা বলতে থাকো। আর সে আজান দিতে থাকুক। কারণ, তাঁর কণ্ঠস্বর তোমার চেয়ে জোরাল।" অতএব, আমি বিলালের সাথে দাঁড়িয়ে গিয়ে তাঁকে বলতে লাগলাম আর তিনি আজান দিতে থাকলেন।"' বর্ণনাকারী বলেন—'উমর (রা.) নিজ বাড়ি থেকে আজানের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি নিজ চাদর টানতে টানতে বেরিয়ে এসে বলতে লাগলেন—"হে আল্লাহর রাসূল! সেই সত্তার শপথ; যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, একই স্বপ্ন আমিও দেখেছি।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন—"আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।"' (তিরমিজি : ১৮৯)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত—

'নবি ﷺ-এর কতিপয় সাহাবিকে স্বপ্নে দেখানো হলো যে, রমজানের শেষ সাত দিনের মধ্যে কদরের রাত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন—"আমি মনে করি, শেষের সাত দিন সম্পর্কে তোমাদের সকলের স্বপ্ন পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব, যে ব্যক্তি তা অন্বেষণ করবে, সে যেন রমজানের শেষ সাত দিনের রাতগুলোতেই তা অন্বেষণ করে।"' (বুখারি : ২০১৫)

৫. শেষ রাতের স্বপ্ন। রাতের শেষভাগের স্বপ্ন সাধারণত অর্থবহ হয়,। কেননা, এটা একটা বিশেষ মুহূর্ত। এ সময়ে আল্লাহ তায়ালা প্রথম আসমানে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন—

Scanned by CamScanner

> 'যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। যে আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করবে, আমি তাকে তা দান করব। যে আমার নিকট মাফ চাইবে, আমি তাকে মাফ করে দেবো।'
> (বুখারি : ১১৪৫)

কীভাবে ভালো স্বপ্ন দেখব

১. সত্যবাদী হলে
২. হালাল খাবার খেলে
৩. ইসলামের বিধিনিষেধ মেনে চললে
৪. অজু অবস্থায় ঘুমালে এবং
৫. কিবলামুখী হয়ে ঘুমালে।

নবিজিকে স্বপ্নে দেখা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখা সত্যিই সৌভাগ্যের বিষয়; বিশেষত আমাদের মতো যারা তাঁকে কখনো দেখেনি। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নবিজি কখনো কখনো স্বপ্নে দেখা দেন। কেউ যদি বিশ্বনবি ﷺ-কে স্বপ্নে দেখেন, তবে বুঝতে হবে—সত্যি সত্যিই তিনি তাঁকে দেখেছেন। কারণ, শয়তান তাঁর রূপ ধারণ করতে পারে না। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন—

> 'স্বপ্নে আমাকে যে দেখে, সে প্রকৃতই আমাকে দেখে। কারণ, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর যে আমার ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, তার ঠিকানা জাহান্নাম।'
> (বুখারি : ৫৮৪৪, মুসলিম : ২০১৫)

অন্য বর্ণনায় আবু হুরায়রা (রা.) বলেন—

> 'আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি—"যে লোক আমাকে স্বপ্নে দেখে, শীঘ্রই সে জাগ্রত অবস্থাতেও আমাকে দেখবে। কেননা, শয়তান আমার আকৃতি ধরতে পারে না।"'
> (বুখারি : ৬৯৯৩, মুসলিম : ২২৬৬)

Scanned by CamScanner

তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে—হাদিসের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলোতে রাসূল ﷺ-এর দেহের অবয়ব, সৌষ্ঠব ও চেহারার আকৃতি যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, স্বপ্নে ঠিক তেমনটি দেখতে হবে। তা না হলে রাসূল ﷺ-কে স্বপ্নে দেখাটা সত্য বলে পরিগণিত হবে না। ইবনে সিরিন (রহ.)-এর নিকট কেউ এসে যখন বলত—'আমি রাসূল ﷺ-কে স্বপ্নে দেখেছি', তখন তিনি বলতেন—'তুমি তাঁকে কেমন দেখেছ?' অতঃপর স্বপ্নে দেখা ব্যক্তির বর্ণনার সাথে যদি রাসূল ﷺ-এর দেহ মোবারকের বিবরণ মিলে যেত, তখন তিনি বলতেন—'হ্যাঁ, ঠিক আছে। তুমি সত্যিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেই দেখেছ।' আর ভিন্ন ধরনের বিবরণ পেলে বলতেন—'না, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নয়; বরং অন্য কাউকে দেখেছ।'

যুগে যুগে স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন যারা

নবিদের মধ্য থেকে ইউসুফ (আ.), সাহাবিদের মধ্যে আবু বকর (রা.) এবং তাবেয়িনদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন (রহ.) স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন। আর স্বপ্ন ব্যাখ্যায় রাসূল ﷺ-এর জ্ঞানের তো কোনো তুলনাই চলে না। স্বপ্নের অসাধারণ সব ব্যাখ্যা হাজির করতেন তিনি। নিচে কতিপয় প্রাজ্ঞ স্বপ্নবিশারদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো—

ইউসুফ (আ.) : পবিত্র কুরআনে সূরা ইউসুফে সর্বমোট তিনটি স্বপ্নের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি ইউসুফ (আ.)-এর নিজের, আরেকটি জেলখানার দুই কয়েদির এবং তৃতীয়টি মিশরের রাজার স্বপ্ন। ইউসুফ (আ.) কতটা সাবলীলভাবে স্বপ্নগুলোর ব্যাখ্যা করেছিলেন, তা সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করলেই বোঝা যায়। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইউসুফ (আ.)-এর কথাকে উদ্ধৃত করে বলেন—

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ-

'হে আমার রব! আপনি আমাকে রাজত্ব দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা!

Scanned by CamScanner

> দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক। আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সাথে আমাকে যুক্ত করুন।' (সূরা ইউসুফ : ১০১)

আবু বকর (রা.) : সাহাবিদের মধ্যে স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন সাইয়্যিদুনা আবু বকর (রা.)। স্বপ্ন দেখে মাঝে মাঝে আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজেই আবু বকর (রা.)-এর কাছে ব্যাখ্যা জানতে চাইতেন। তিনি নিজেও মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে রাসূল ﷺ-এর উপস্থিতিতে অন্যের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন। কোনো একদিন রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন—'আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, তুমি আর আমি মই বা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার প্রতিযোগিতা করছি। আর প্রতিযোগিতায় আমি তোমার চেয়ে আড়াই ধাপ এগিয়ে।' আবু বকর (রা.) বললেন—'হে আল্লাহর রাসূল! এর ব্যাখ্যা হলো—আল্লাহ তায়ালা আপনাকে তাঁর রহমত ও ক্ষমার দিকে উঠিয়ে নেবেন। আর আপনার পর আমি আরও দুই বছর বেঁচে থাকব।' বাস্তবে সেটাই হয়েছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের প্রায় দুই বছর তিন মাস পর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছিলেন এই মহান সাহাবি। আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> 'আমি একদিন স্বপ্নে দেখি আকাশ থেকে তিনটি চাঁদ আমার কোলে এসে পড়ল। আমি আবু বকর (রা.)-কে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন—"তোমার ঘরে পৃথিবীর তিনজন শ্রেষ্ঠ মানুষকে দাফন করা হবে।" এরপর নবিজি মারা যাওয়ার পর তাঁকে যখন আমার ঘরে দাফন করা হলো, তখন আবু বকর (রা.) বললেন—"এই হলো তোমার তিন চাঁদের প্রথম চাঁদ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ চাঁদ।"' (আল মুজামুল কাবির : ১২৬)

এই স্বপ্নের ব্যাখ্যাটিও সত্য প্রমাণিত হয়েছিল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইন্তেকালের পর আম্মাজান আয়িশা (রা.)-এর ঘরে তাঁকে দাফন করা হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশেই কবরস্থ করা হয় আবু বকর (রা.)-কে। এরপর উমর (রা.)-এর শাসনামলের ১০ বছর এই ঘরেই অবস্থান করতেন আম্মাজান আয়িশা (রা.)। ঘরের মাঝখানে তিনি একটি চাদর টাঙিয়ে রাখতেন। চাদরটির একপাশে দুটি কবর আর অন্য পাশটায় থাকতেন তিনি। তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল—স্বামী ও পিতার পাশেই যেন দাফন করা হয় তাঁকে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা ছিল ভিন্ন!

Scanned by CamScanner

হিজরি ২৩ সনের ২৬শে জিলহজ। উমর ফারুক (রা.) আবু লুলু নামক এক অগ্নি উপাসকের ছুরিকাঘাতে মারাত্মকভাবে জখম হলেন। শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্তে মুমূর্ষু অবস্থায় আম্মাজান আয়িশা (রা.)-এর কাছে পাঠালেন নিজের ছেলেকে। পুত্র এসে খবর দিলো রাসূল ﷺ ও আবু বকর (রা.)-এর পাশেই চিরনিদ্রায় শায়িত হতে চান খলিফাতুল মুসলিমিন। আয়িশা (রা.)-এর সকল পরিকল্পনা উলটপালট যায় এক মুহূর্তে। স্বামী ও পিতার পাশে কবরস্থ হওয়ার প্রচণ্ড আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও উমর ফারুক (রা.)-এর আবেদন তিনি মঞ্জুর করলেন। অবশেষে উমর ফারুক (রা.)-কে আম্মাজান আয়িশা (রা.)-এর ঘরেই তাঁর দুই প্রিয় সাথির পাশে দাফন করা হয়। আর এভাবেই সাইয়্যিদুনা আবু বকর (রা.)-এর করা স্বপ্নের ব্যাখ্যা হুবহু মিলে যায়।

মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন : খলিফা উসমান (রা.)-এর সময়কালে ইরাকের বসরা নগরীতে জন্ম নেওয়া মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন (রহ.)। ছিলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ তাবেয়ি। জটিল জটিল স্বপ্ন ব্যাখ্যায়ও দারুণভাবে পারদর্শী ছিলেন তিনি। দূরদূরান্ত থেকে লোকজন তাঁর কাছে ছুটে আসত স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে। স্বপ্নের মর্ম অনুধাবনে বিরল প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য তাঁকে স্বপ্ন ব্যাখ্যাশাস্ত্রের সবচেয়ে বড়ো পণ্ডিত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জগদ্‌বিখ্যাত গ্রন্থ *তাফসিরুল আহলাম* তাঁর স্বপ্নসংক্রান্ত ব্যাখ্যা, আলোচনা ও মতামতের এক অনবদ্য সংকলন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একবার স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি রাসূল ﷺ-এর কবর খুঁড়ে কাফন সরাচ্ছেন। এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। ইবনে সিরিন (রহ.)-এর কাছে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন—'এই ব্যক্তির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ পুনরুজ্জীবিত হবে।' বাস্তবে হয়েছিলও তা-ই। আবু হানিফা (রহ.) কুফা নগরীর প্রসিদ্ধ ৪০ জন মুজতাহিদ ফকিহ নিয়ে একটি ফিকহ অ্যাকাডেমি গঠন করেছিলেন। অ্যাকাডেমির প্রধান ছিলেন ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.) নিজেই। প্রতিটি নতুন মাসয়ালা ফিকহ অ্যাকাডেমিতে ওঠানো হতো। সেখানে ৪০ জন মুজতাহিদ ফকিহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল হাদিসের ওপর ইলমি মোজাকারা করতেন। সবশেষে সকলের আলোচনা শুনে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত দিতেন ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.)। এভাবেই তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করে সমগ্র উম্মাহর জন্য সুবিশাল ফিকহের ভান্ডার রেখে গেছেন।

Scanned by CamScanner

সুন্নাহর আলোকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা

স্বপ্নের ব্যাখ্যা অন্তর্দৃষ্টি, প্রজ্ঞা ও গভীর জ্ঞানের বিষয়। একই সঙ্গে এটি স্পর্শকাতর বিষয়ও বটে। তাই স্বপ্ন সম্পর্কে গভীর দখল ছাড়া এর ব্যাখ্যা করতে যাওয়া উচিত নয়; এতে ভয়ানক বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ বিভিন্ন সময়ে স্বপ্নের যেসব ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার উল্লেখযোগ্য কিছু এখানে পেশ করা হলো। এগুলো আমাদের সামনে স্বপ্ন ব্যাখ্যার একটি সংক্ষিপ্ত মূলনীতি তুলে ধরবে।

স্বপ্নে সবুজ রং দেখা : সবুজ রাসূল ﷺ-এর অত্যন্ত প্রিয় এবং জান্নাতের আইকনিক রং। তাই স্বপ্নে সবুজ রঙের কিছু দেখলে বা সবুজ রং প্রাধান্য পেলে তা কল্যাণকর ও পুণ্যবান কিছুকে নির্দেশ করে। যেমন : আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)-এর একটি স্বপ্নের ঘটনা হাদিসে এসেছে, যেখানে তিনি সবুজ রং দেখেছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁর ব্যাখ্যায় বলেছিলেন—'আবদুল্লাহ মজবুত রশি ধরা অবস্থায় মারা যাবে।' আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) সেই স্বপ্নের ব্যাপারে বলেন—

> 'আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, যেন একটা স্তম্ভ একটি সবুজ বাগানে রাখা হয়েছে এবং স্তম্ভের উপরিভাগে ছিল একটি রশি। আর নিচের দিকে ছিলেন একজন খাদেম। বলা হলো, এ স্তম্ভ বেয়ে ওপরে ওঠো। আমি ওপরের দিকে উঠে রশিটি ধরলাম। পরে এ স্বপ্ন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন—"ওই বাগান ইসলামের বাগান, ওই স্তম্ভ ইসলামের স্তম্ভ, আর ওই হাতল হলো মজবুত হাতল। তুমি মৃত্যু অবধি ইসলামকে শক্তভাবে ধরে থাকবে।"' (বুখারি : ৭০১৪)

স্বপ্নে রেশমি কাপড় দেখা : রেশমি কাপড় দ্বারা সাধারণত বিবাহ বা শুভ কোনো বিষয়কে বোঝানো হয়ে থাকে। আল্লাহর রাসূল ﷺ দুবার স্বপ্নে রেশমি কাপড় পরিধান করা অবস্থায় আয়িশা (রা.)-কে দেখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে আয়িশা (রা.)-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে নবিজির জীবনে এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.) নিজেই এ ব্যাপারে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> 'তোমাকে বিয়ে করার পূর্বে দুবার আমাকে (স্বপ্নে) দেখানো হয়েছে। আমি দেখেছি, একজন ফেরেশতা তোমাকে একটুকরো

Scanned by CamScanner

রেশমি কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে আসছে। আমি বললাম—"নিকাবটি সরিয়ে দিন।" সে নিকাব সরিয়ে দিলে দেখলাম—ওই রমণী তুমিই। তখন বললাম—"এটা যদি আল্লাহর তরফ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তিনি তা সত্যে পরিণত করবেন।" কিছুদিন পর আবার আমাকে দেখানো হলো, ফেরেশতা তোমাকে এক টুকরো রেশমি কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে আসছে। বললাম—"আপনি (তাঁর নিকাব) সরিয়ে দিন।" সে তা সরিয়ে দিলে আমি তোমাকে দেখতে পেলাম। তখন বললাম—"এটা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তিনি তা সত্যে পরিণত করবেন।"' (বুখারি : ৭০১২)

তরুণ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)ও একবার স্বপ্নে রেশমি কাপড় দেখেছিলেন। এর ব্যাখ্যায় নবিজি যা বলেছিলেন, তা কল্যাণকর বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করে। ইবনে উমর (রা.) বলেন—

'আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার হাতে একখণ্ড রেশমি কাপড়। জান্নাতের যেখানেই ওটা নিক্ষেপ করলাম, কাপড়টি সেখানেই আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। এ স্বপ্ন আমি (আমার বোন ও রাসূল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী) হাফসা (রা.)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। হাফসা (রা.) তা নবি ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলেন। নবিজি শুনে বললেন—"তোমার ভাই একজন নেককার মানুষ।"' (বুখারি : ৭০১৫, ৭০১৬)

স্বপ্নে শেকল ও বেড়ি দেখা : শেকল সাধারণত বন্দিত্ব ও দাসত্বকে নির্দেশ করে, আর বেড়ি দ্বারা বোঝানো হয় নিয়ন্ত্রণক্ষমতা। তাই স্বপ্নে শেকল দেখলে তা অকল্যাণকর বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে বেড়ি পরা দেখলে তাকে বিবেচনা করা হয় কল্যাণকর বিষয় হিসেবে। কারণ, এর দ্বারা দ্বীনের চৌহদ্দিতে নিয়ন্ত্রিত থাকা বোঝায়। এই ব্যাপারে ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর *জামিউস সহিহ গ্রন্থে* আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে—

'(রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে) স্বপ্নে শেকল দেখাকে অপছন্দনীয় মনে করা হতো। আর পায়ে বেড়ি দেখাকে তারা পছন্দ করতেন। বলা হতো—পায়ে বেড়ি দেখার ব্যাখ্যা হলো, দ্বীনের ওপর অবিচল থাকা।' (বুখারি : ৭০১৭)

Scanned by CamScanner

স্বপ্নের ভেতর প্রবাহিত ঝরনা দেখা : প্রবাহিত ঝরনা আল্লাহর অপার ও অফুরান অনুগ্রহের নিদর্শন। স্বপ্নে প্রবাহিত ঝরনা দেখলে তা ব্যক্তির নিয়ামতপূর্ণ কর্মের প্রাচুর্য ও আতিশয্যকে নির্দেশ করে। মুহাজির সাহাবি উসমান ইবনে মাজউন (রা.) অসুস্থজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করার পর তাঁকে আশ্রয়দানকারী আনসারি সাহাবি উম্মুল আলা (রা.) উসমান (রা.) এবং একটি প্রবাহিত ঝরনা স্বপ্নে দেখেছিলেন। নবিজির ব্যাখ্যা করেছিলেন—উসমানের সৎকর্ম প্রবাহিত ঝরনার ন্যায় জারি থাকবে। মহিলা সাহাবি উম্মুল আলা (রা.) হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন—

> 'আমি স্বপ্নে উসমান (রা.)-এর জন্য প্রবাহিত ঝরনা দেখলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তা বর্ণনা করলাম। নবিজি ﷺ বললেন—"এটা তাঁর আমল। আর এই আমল তাঁর জন্য জারি থাকবে।"' (বুখারি : ৭০১৮)

স্বপ্নে দুধ পান করা এবং অন্যকে দেওয়া : দুধ রাসূল ﷺ-এর প্রিয় এবং অত্যন্ত বরকতপূর্ণ একটি খাবার। জান্নাতের চারটি প্রধান নহরের একটি থাকবে দুধের নহর। তাই দুধ হলো বরকত, কল্যাণ, স্বচ্ছতা ও প্রাচুর্যের নিদর্শন। নবি ﷺ-এর দ্বারা ইলম ব্যাখ্যা করেছিলেন। কারণ, ইলমের মধ্যেই নিহিত রয়েছে অধিক কল্যাণ। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

> 'আমি একবার ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, দুধের একটি পেয়ালা আমাকে দেওয়া হলো। তা থেকে আমি এত অধিক পান করলাম যে, আমার চেহারা থেকে তৃপ্তির আভা প্রকাশিত হচ্ছিল। অতঃপর অবশিষ্টাংশ উমরকে দিলাম।' সাহাবিগণ বললেন—'এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী হে আল্লাহর রাসূল?' তিনি বললেন—'ইলম (তথা জ্ঞান)।' (বুখারি : ৭০২৭)

স্বপ্নে নোংরা ও এলোমেলো কাউকে দেখা : নোংরা, এলোমেলো মূলত অকল্যাণ ও অপছন্দের প্রতীক। নোংরা বিষয় মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের বিরোধী। তাই স্বপ্নে কেউ নোংরা বা এলোমেলো কোনো ব্যক্তিকে আসতে দেখলে অকল্যাণ আসন্ন বলে বিবেচনা করা হয় এবং তার চলে যাওয়াকে মনে করা হয় অকল্যাণের পশ্চাদ্‌গমন। রাসূল ﷺ একবার স্বপ্নে এক নোংরা মহিলাকে মদিনা ছেড়ে চলে যেতে দেখে বলেছিলেন—'মদিনা থেকে

Scanned by CamScanner

অকল্যাণকর মহামারি দূর হয়েছে।' সালিমার পিতা আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, নবি ﷺ বলেছেন—

> 'আমি স্বপ্নে দেখেছি—এলোমেলো চুলওয়ালা একজন কালো মহিলা মদিনা থেকে বের হয়ে মাহইয়ায়াহ তথা জুহফা নামক জায়গায় গিয়ে থেমেছে। আমি এর ব্যাখ্যা করলাম, মদিনার মহামারি সেখানে স্থানান্তরিত হলো।' (বুখারি : ৭০৩৯)

স্বপ্নে তরবারি দেখা : তরবারি ব্যক্তির নিরাপত্তা ও আত্মমর্যাদাকে নির্দেশ করে। স্বপ্নে তরবারি দেখার অর্থ হলো—নিরাপত্তা ও আত্মমর্যাদার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সতর্কবার্তা পাওয়া। তরবারি ভেঙে যাওয়া দেখলে তা নিরাপত্তার জন্য হুমকি বা বিপদ। আর তরবারির জৌলুস দেখলে তা নিরাপত্তার জন্য ইতিবাচক বার্তা বা আসন্ন বিজয়ের প্রতীক। আবু মুসা (রা.) বর্ণনা করেন, নবি ﷺ বলেছেন—

> 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটা তরবারি নাড়াচাড়া করছি এবং এর মধ্যভাগ ভেঙে গেল। এর ব্যাখ্যা হলো বিপদ; যা উহুদের যুদ্ধে মুমিনদের ভাগ্যে ঘটেছে। আবার আমি তরবারিটি ধরলাম। এতে তরবারিটি আগের থেকে সুন্দর অবস্থায় ফিরে এলো। এর ব্যাখ্যা হলো—আল্লাহর দেওয়া বিজয় ও মুমিনদের ঐক্য।' (বুখারি : ৭০৪১)

মধু দেখা : মধু একটি পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর খাবার। রাসূল ﷺ মধু খুব পছন্দ করতেন। এটি জান্নাতি পানীয়র অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা মূলত কল্যাণ ও জ্ঞানকেই বোঝানো হয়। স্বপ্নে মধু দেখলে তা কুরআনি ও উপকারী জ্ঞানকে নির্দেশ করে। এই ব্যাপারে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে আবু বকর (রা.) স্বপ্নে মধু দেখার এমনই ব্যাখ্যা করেছিলেন। তবে রাসূল ﷺ তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যাকে আংশিক সমর্থন করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল—

> 'আমি গত রাতে স্বপ্নে একখণ্ড মেঘ দেখলাম, যা থেকে ঘি ও মধু ঝরছে। আমি লোকদের দেখলাম, তারা তা থেকে (মধু ও ঘি) তুলে নিচ্ছে। কেউ অধিক পরিমাণ আবার কেউ-বা কম। আরও দেখলাম, একটা রশি জমিন থেকে শুরু করে আসমানে গিয়ে মিলেছে। আর আপনি সেটি ধরে ওপরে উঠছেন। তারপর

Scanned by CamScanner

অন্য এক লোক তা ধরল এবং এর সাহায্যে ওপরে উঠে গেল। এরপর আরেক লোক তা ধরে এর দ্বারা ওপরে উঠে গেল। এরপর আরেক লোক তা ধরলে তা ছিঁড়ে গেল; কিন্তু পুনরায় সেটা জোড়া লেগে গেল।'

তখন আবু বকর (রা.) বললেন—'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতা কুরবান হোক! আল্লাহর কসম! আপনি অবশ্যই আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ দেবেন।' নবি ﷺ বললেন—'ঠিক আছে, তুমিই এর ব্যাখ্যা দাও।' আবু বকর (রা.) বললেন—'মেঘের ব্যাখ্যা হলো ইসলাম। আর সেখান থেকে যে ঘি ও মধু ঝরছে, সেটা হলো কুরআন ও তার মিষ্টতা। কুরআন থেকে কেউ বেশি সংগ্রহ করছে, আর কেউ কম। আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত ঝুলন্ত দড়িটি হচ্ছে ওই হক (মহাসত্য), যার ওপর আপনি প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। আপনি তা ধরবেন, আর আল্লাহ আপনাকে উচ্চে ওঠাবেন। আপনার পরে আরেকজন তা ধরবে। ফলে এর দ্বারা সে উচ্চে উঠবে। অতঃপর আরেকজন তা ধরে এর মাধ্যমে সে উচ্চে উঠবে। এরপর আরেকজন তা ধরবে; কিন্তু তা ছিঁড়ে যাবে। পুনরায় তা জোড়া লেগে যাবে, ফলে সে এর দ্বারা উচ্চে উঠবে। হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমাকে বলুন—আমি ঠিক বলেছি, না ভুল?' নবি ﷺ বলেন—'কিছু ঠিক বলেছ, আর কিছু ভুল বলেছ।' আবু বকর (রা.) বললেন—'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! আমাকে বলে দিন—যা আমি ভুল করেছি।' নবি ﷺ বললেন—'কসম কোরো না।' (বুখারি : ৭০৪৬, মুসনাদে আহমাদ : ১৮৯৪)

পোশাক দেখা : পবিত্র কুরআনে পোশাককে বলা হয়েছে জিনাত বা সৌন্দর্যের প্রতীক। পোশাক দ্বারা মানুষ তার লজ্জাস্থান ঢেকে রাখে। পোশাকের মাধ্যমেই প্রকাশ পায় রুচিবোধ ও সৌন্দর্য। তাই স্বপ্নে পোশাক দীর্ঘ হওয়া ভালো নিদর্শন বলে বিবেচিত হবে, আর পোশাক খাটো হওয়া তাকওয়া, দ্বীনদারিতে ঘাটতির লক্ষণ। আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

Scanned by CamScanner

'আমি একবার ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, একদল লোককে আমার কাছে আনা হচ্ছে। তাদের গায়ে জামা ছিল। কারও কারও জামা স্তন অবধি, আর কারও কারও তার নিচ পর্যন্ত। উমর ইবনুল খাত্তাব আমার নিকট দিয়ে গেল। তাঁর গায়ের জামা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল।' সহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন— 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এর কী ব্যাখ্যা দিলেন?' তিনি বললেন—'দ্বীন।' বুখারি : ৭০০৮)

তবে ব্যক্তির ভিন্নতার কারণে স্বপ্নের ব্যাখ্যাও ভিন্ন হতে পারে। যেমন : মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন (রহ.)-এর কাছে এক লোক এসে বলল— 'আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি আজান দিচ্ছি।' তিনি উত্তরে বললেন— 'ইনশাআল্লাহ তুমি হজে যাবে।' আরেকজন এসে একই স্বপ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন—'চুরির অপরাধে তোমার হাত কাটা যাবে।' লোকজন জিজ্ঞেস করল—'আপনি একই স্বপ্নের দুই ধরনের ব্যাখ্যা কেন দিলেন?' তিনি বললেন—'প্রথম লোকটি নেককার আর দ্বিতীয় লোকটি ছিল পাপাচারী। তাই প্রথমটির ব্যাখ্যা করেছি সূরা হজের আলোকে আর দ্বিতীয়টি সূরা ইউসুফের আলোকে। সংশ্লিষ্ট আয়াত দুটি হলো—

وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ-

"আর মানুষের মাঝে হজের ঘোষণা দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে, আর সব (পথ-ক্লান্ত) শীর্ণ উটের পিঠে, বহু দূরের গভীর পর্বতসংকুল পাড়ি দিয়ে।" (সূরা হজ : ২৭)

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسَارِقُوْنَ-

"অতঃপর ইউসুফ যখন তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিলো, তখন সে তাঁর সহোদর ভাইয়ের রসদপত্রের ভেতর পানপাত্রটি রেখে দিলো। তখন এক ঘোষক ঘোষণা দিলো—হে কাফেলার লোক! তোমরা নিশ্চয়ই চোর ।"' (সূরা ইউসুফ : ৭০)

Scanned by CamScanner

স্বপ্ন হলো ঘুমের রাজ্যে মানুষের অবচেতন মনের একটি ভিন্ন জগৎ। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের ইন্দ্রিয় কিছুটা স্তিমিত হলেও পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয় না। ফলে বিচিত্র স্বপ্ন এসে ভিড় করে দুচোখে। আর মানুষের সহজাত স্বভাব হলো—তারা কোনো স্বপ্ন দেখলে প্রিয়জনের কাছে তা বলে বেড়ায়, কখনো-বা খুঁজে ফেরে তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও সমাধান। কিন্তু যার-তার কাছে হুট করে স্বপ্ন শেয়ার করতে নেই। স্বপ্নের-ব্যাখ্যা খুবই জটিল এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক একটি বিষয়। স্বপ্নের তাবির বা ব্যাখ্যা করা ইসলামি জ্ঞানের স্বতন্ত্র একটি শাখা। যে কেউ ইচ্ছা করলেই এই কাজটি করতে পারেন না। যিনি কুরআন-সুন্নাহর অগাধ জ্ঞান রাখেন, স্বপ্ন ব্যাখ্যার মূলনীতি সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত, সবার প্রতি কল্যাণকামী এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী, কেবল এমন লোকের কাছেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া উচিত। তা না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে অনেক সময়।

মুমিন জীবনে স্বপ্ন কেবল ঘুমের রাজ্যে কল্পকাহিনি দর্শনের নাম নয়; বরং একজন ঈমানদারের জীবনে স্বপ্ন বিভিন্ন বিষয়ের আগাম ইঙ্গিত বহন করে। তাই সৎ ও আল্লাহভীরুদের স্বপ্নগুলো গভীরতর অর্থবোধক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা স্বপ্নযোগে তাঁর প্রিয় বান্দাদের ইঙ্গিতবহ বার্তা পাঠান। এটা মুমিনের জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আসমানি নির্দেশনাস্বরূপ। নিশ্চয়ই আমরা সবাই এ রকম ভালো স্বপ্ন দেখতে চাই; যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা যেমন থাকবে, তেমনই থাকবে সুসংবাদ কিংবা আগাম সতর্কবার্তা। আল্লাহ আমাদের উত্তম স্বপ্নের বরকত দান করুন, আমাদের কবুল করুন ঋদ্ধজনের কাতারে। আমিন!

Scanned by CamScanner

দীপ্তিময় তারুণ্য

তরুণরা হলো ভবিষ্যৎ পৃথিবীর বর্তমান প্রতিচ্ছবি। তাদের হাত ধরেই নির্মিত হয় একটি নতুন পৃথিবীর পাটাতন। কোনো জাতির তরুণদের জীবনচরিত দেখেই অঙ্কন করা যায় সেই জাতির অনাগত দিনের চিত্র। তাই সমাজপতি ও সমাজকর্মী, বিশেষত যারা একটি সোনালি সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেন, তাদের নিকট তরুণ প্রজন্ম বরাবরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তারুণ্য বিনির্মাণের কাজ শুরু হয় শৈশব থেকেই। শৈশব ও কৈশোর হলো জীবন গঠনের প্রথম অধ্যায়। পূর্ণ বয়সে একজন মানুষের স্বভাব-চরিত্র ও চিন্তা-চেতনা কেমন হবে, তা নির্ভর করে তরুণ বয়সের পরিচর্যার ওপর। তাই শৈশব ও কৈশোর থেকেই তরুণদের সঠিকভাবে গড়ে তোলা আমাদের জন্য একান্ত কর্তব্য।

তারুণ্য বিকাশে নববি কৌশল আমাদের জন্য সর্বোত্তম নকশা এবং সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। এজন্য নবি-রাসূলগণ তরুণ বয়সে কীভাবে নিজেদের নির্মাণ করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে অনুজ তরুণদের কীভাবে সোনালি মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন, তা জানা আমাদের প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত জরুরি। কেননা, নবি-রাসূলগণের অনুসৃত পথ ও পদ্ধতিই উপহার দিতে পারে একটি আলোকিত প্রজন্ম।

Scanned by CamScanner

আদর্শ তরুণ প্রজন্ম গড়ে তুলতে অভিভাবক ও সমাজের জ্যেষ্ঠ নাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু করণীয় রয়েছে। সমাজের প্রত্যেকের উচিত করণীয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং নিজ নিজ দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদন করা। এগুলো হলো—

উত্তম চরিত্রের উপমা উপস্থাপন

শিশু-কিশোররা প্রকৃতিগতভাবেই ভীষণ অনুকরণপ্রিয়। তারা কথা বা উপদেশের চেয়ে বড়োদের কর্মকে খেয়াল করে বেশি এবং বড়োদের কাজকেই মনে করে আদর্শ। ফলে নিজেরাও সেই কর্ম ও আচরণের অনুকরণ শুরু করে। প্রত্যেক শিশু-কিশোরই মনে করে—তার আশপাশের বড়োরা যা করেছে, তা-ই সঠিক। তাই একজন দাঈ ও সমাজের জ্যেষ্ঠ সদস্য হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো—শিশু-কিশোর ও তরুণদের সামনে নিজেকে উত্তম চরিত্রের উপমা হিসেবে উপস্থাপন করা। যাবতীয় অনর্থক ও বাজে কর্ম থেকে বিরত থাকা। তাদের সামনে এমন কথা না বলা, যার ফলে তাদের মনে বিরূপ প্রভাব পড়ে।

আমরা অনেক সময় হাসির ছলে মিথ্যা বলে ফেলি। শিশু-কিশোরদের মনে এসব ছোটো ছোটো বিচ্যুতিও গভীরভাবে রেখাপাত করতে পারে। আর অসৎ লেনদেন, মানুষ ঠকানো, বেইনসাফির মতো ঘৃণ্য অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকা তো একেবারেই অত্যাবশ্যক; বরং এসবের বিরুদ্ধে আমাদের শক্ত অবস্থান দেখানো উচিত। এতে শিশুরা তাদের জীবন প্রভাত থেকেই এসব অনৈতিক কর্মকাণ্ড ঘৃণা করতে শিখবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে—যদি শিশু-কিশোরদের মধ্যে একটি স্বচ্ছ ও নির্মল জীবনবোধ ছড়িয়ে দেওয়া না যায় এবং তাদের অভ্যাসকে ছোটো থেকেই পরিচ্ছন্ন না রাখা যায়, তাহলে পরবর্তী সময়ে তাদের সঠিক পথে নিয়ে আসাটা খুবই চ্যালেঞ্জিং।

হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক সৃজন ও কৌতূহল নিবারণ

তরুণ মন সীমাহীন কৌতূহলে ভরপুর থাকে। এই কৌতূহলকে নিবারণে যারা এগিয়ে আসে, তাদের প্রতিই তরুণরা আকৃষ্ট হয় সবচেয়ে বেশি।

Scanned by CamScanner

তাই কিশোর মনের কৌতূহলকে কল্যাণকর উপাদান দিয়ে ভরিয়ে দিতে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে সবার আগে। অথচ আমাদের সমাজে সাধারণত দেখা যায়—তরুণদের সাথে বড়োরা বরাবরই দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। ছোটোরা কাছে ঘেঁষলেই চড়া গলায় বলে ওঠেন—'বড়োদের সামনে তোমাদের কী? এই বয়সে এত কিছু জেনে হবে কী? যাও পড়তে বসো গিয়ে!'

বড়োদের এমন আচরণে কিশোর-তরুণরা সমাজের বা পরিবারের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং তাদের ভাবতে থাকে দূরবর্তী কেউ। ফলে নিজেদের যাবতীয় কৌতূহল মেটাতে তারা মিশে যায় দুষ্ট ও বখাটে ছেলেদের ভিড়ে। এতে তারা একটি ভালো কৌতূহলও নোংরা বা অশ্লীল বার্তা দ্বারা মেটায়। এই অসৎসঙ্গের ফলে জীবনের প্রারম্ভকাল থেকেই ভুল তথ্য, অসৎ মনোবৃত্তি ও অশ্লীল কল্পনা নিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে তারা। সময়ের আবর্তনে এই নেতিবাচক বিষয়গুলোই তাদের পুরো মন-মগজ ও স্বভাব-চরিত্রকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ধীরে ধীরে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ ব্যাপারগুলোই স্বাভাবিক হয়ে উঠতে থাকে তাদের কাছে। কেউ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে, কেউ পর্নোগ্রাফিতে বুঁদ হয়ে থাকে, কেউ-বা জড়িয়ে পড়ে কিশোর গ্যাঙের সাথে। এভাবে অন্ধকার পথে শুরু হয় তাদের নীরব যাত্রা। আর মুকুলেই ঝরে পড়ে অপার সম্ভাবনাময় এক প্রজন্ম।

তরুণদের ধ্বংসাত্মক ভবিষ্যৎ থেকে রক্ষার জন্য পরিবার ও সমাজের জ্যেষ্ঠদের কর্তব্য হলো—শিশু-কিশোর ও তরুণদের কাছে টেনে নেওয়া, তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শোনা এবং তাদের যাবতীয় কৌতূহল উত্তম ও সঠিক তথ্য দ্বারা নিবারণ করা। এতে বাজে বন্ধুর পরিবর্তে পরিবার ও সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরই যোগ্য বন্ধু মনে করবে তারা।

মন ও মগজে তাওহিদের বীজ বপন

শিশু-কিশোরদের নিকট একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার পর পরিবার ও সমাজের অগ্রজদের কর্তব্য হলো—পরিস্থিতি বুঝে আস্তে আস্তে তাদের মন ও মগজে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের বীজ বপন করা। বিভিন্ন পরিস্থিতির আলোকে কিশোর-তরুণদের শেখাতে হবে—

Scanned by CamScanner

তাওহিদ ও রিসালাতের গুরুত্ব কী? দুনিয়া ও আখিরাতে এর প্রভাবই-বা কতটুকু? দুনিয়া সৃষ্টি, এর ধ্বংস, মানব সৃষ্টির ইতিহাস ও উদ্দেশ্য, মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য ইত্যাদি বুনিয়াদি বিষয় সম্পর্কে শিশু-কিশোরদের ছোটো থেকেই সচেতন করে তোলা জরুরি।

শিশু-কিশোরদের বোঝাতে হবে—ঈমান-আখলাক ও নৈতিকতার গুরুত্ব কতটা গভীর! সাহাবিগণ ঈমান ও নৈতিকতার জন্য কীভাবে জীবনবাজি রেখেছেন; কিন্তু ঈমান ও নৈতিকতার প্রশ্নে আপস করেননি, তা তরুণদের মনে সুচারুভাবে এঁকে দিতে হবে। একজন তরুণ যখন জানবে তাকে কে সৃষ্টি করেছে, কেন সৃষ্টি করেছে, তার জীবনের উদ্দেশ্য কী এবং গন্তব্য কোথায়; তখন সে নিজের কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে আপনাআপনিই সচেতন হবে। সচেষ্ট হবে আদর্শ জীবন পরিগঠনে।

আদরের সাথে শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন আদব-কায়দা, নিয়ম-পদ্ধতি ও ঈমান-আখলাকের শিক্ষা দিতে হবে। শৈশবকালে একবার রাসূল ﷺ-এর কোলে বসে উমর ইবনে আবু সালামা (রা.) খাবার গ্রহণ করছিলেন। শিশু উমর থালার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এলোমেলোভাবে খাবার নিয়ে খাওয়া শুরু করলেন। এমন অস্থিরমতি ভাব দেখে নবিজি বললেন—'হে বৎস! বিসমিল্লাহ পড়ো। ডান হাতে খাও এবং তোমার ডান পাশ থেকে খাও।' রাসূল ﷺ-এর এই কোমল দিকনির্দেশনা তাঁর মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। পরবর্তী সময়ে খাবার খেতে বসলে তিনি এ ব্যাপারটি খেয়াল রাখতেন।

ভালো-মন্দ বিচারের বোধ ও মনন তৈরি

ভালা-মন্দ বিচার করার মতো বোধ তৈরি হয় কিশোর বয়সেই। তাই এই বয়স থেকেই তাদের ভালো-মন্দ বুঝে কাজ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা কর্তব্য। কিশোররা কোনো ভুল করে বসলে অভিভাবকদের বলা উচিত—'তুমি নিজেই বলো তো এটা ঠিক হয়েছে কি না! এমন কাজ কি তোমার সাথে যায়?' এভাবে ভালো-মন্দ বিচারের ভার যখন তার দিকেই অর্পণ করা হয়, তখন সে বুঝতে পারে—জ্যেষ্ঠরা তার থেকে ভালো কিছু প্রত্যাশা করে, খারাপ বা অন্যায় কিছু করা তার শোভা পায় না। ফলে সে পরবর্তী সময়ে ভালো-মন্দ বিচার করে কাজ করার অভ্যন্তরীণ তাড়না অনুভব করে।

Scanned by CamScanner

গল্পের ছলে উপদেশ

তরুণ মনে উপমা ও উদাহরণ বেশ প্রভাব ফেলে। এজন্য তাদের মন-মর্জি ও অবস্থার আলোকে বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে উত্তম উপমা ও উদাহরণ তুলে ধরা জরুরি। ঈমান-ইসলাম ও নৈতিকতার প্রশ্নে আমাদের পূর্ববর্তী নবিগণ কীভাবে নিজেদের সমস্ত কর্মশক্তি নিয়োগ করেছেন এবং শত জুলুম মুখ বুজে সয়েছেন, কীভাবে সাহাবায়ে কেরাম সত্যের প্রশ্নে জীবন দিয়েছেন; জীবন-যৌবন ও তারুণ্যকে ওয়াকফ করে দিয়েছেন একটি সোনালি সভ্যতা নির্মাণে, জ্ঞান অন্বেষণের নেশায় কীভাবে সালাফগণ ব্রতী হয়েছেন কঠোর অধ্যবসায়ে, তরুণ প্রজন্মের সামনে সেসব তুলে ধরতে হবে।

এ রকম বিভিন্ন বিষয়ে কিশোরদের উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিম মনীষী এবং আমাদের সোনালি দিনের উদাহরণ পেশ করা খুবই ফলপ্রসূ একটি উপায়। এর মাধ্যমে তরুণরা যেমন নিজের কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে সচেতন হতে শেখে, তেমনই পূর্ববর্তীদের কর্মনীতি জানার ফলে তাদের অন্তঃকরণে চমৎকার একটি মডেল ভেসে ওঠে, যা তাদের মনে প্রেরণা জোগায়, সাহস সঞ্চার করে এবং সফলতার ব্যাপারে করে তোলে উদ্দীপ্ত ও আত্মবিশ্বাসী।

কারণ বর্ণনা করে উপদেশ প্রদান

তরুণ মন সব সময়ই স্বাধীনচেতা হয়। তারা সেই কাজটির প্রতিই মনোযোগী হয়, যার গুরুত্ব তারা মন থেকে উপলব্ধি করে। আর যে কাজটির গুরুত্ব ও ফলাফল তাদের নিকট অজ্ঞাত, তার ব্যাপারে তারা যারপরনাই উদাসীন হয়। এমন কাজের জন্য তরুণদের চাপ দেওয়া হলে উলটো বিদ্রোহ করে বসে তারা। ফলে কোনো কাজের প্রতি তরুণদের আগ্রহী করে তুলতে তাদের সামনে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির গুরুত্ব ও কারণ বর্ণনা করা উচিত। এতে তারা সেই বিষয়টি সম্পর্কে নিজ থেকেই আগ্রহী ও সচেতন হয়ে উঠবে। আর আস্তে আস্তে সেটাই পরিণত হবে তাদের রোজকার অভ্যাসে।

কারণ ও গুরুত্ব বর্ণনা করে উপদেশ দেওয়ার পদ্ধতিটি আমরা রাসূল ﷺ-এর কর্মনীতিতেও দেখতে পাই। তরুণ সাহাবি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) নতুন বিবাহ করার পর রাসূল ﷺ তাঁকে দাম্পত্য সম্পর্কের কিছু

Scanned by CamScanner

আদব ও নিয়ম শিক্ষা দিয়েছিলেন। এ সময় সেই নিয়মের অন্তর্নিহিত কারণও বর্ণনা করেছিলেন তিনি। কোনো এক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাসূল ﷺ খেয়াল করলেন জাবির (রা.) একটু দ্রুতগতিতে বাড়ির দিকে যাচ্ছেন। খানিকটা ব্যাকুল দেখাচ্ছে তাঁকে। নবিজি এই ব্যাকুলতার কারণ জিজ্ঞেস করলে জাবির (রা.) জানালেন, তিনি নতুন বিবাহ করেছেন এবং নববধূকে ঘরে রেখেই যোগ দিয়েছেন জিহাদের ময়দানে। তাই স্ত্রীর নিকট দ্রুত যাওয়ার জন্য তিনি এমন করছেন। কিছু আলাপের পর নবিজি তাঁকে বললেন—

> 'আস্তে চলো এবং রাতে তোমার ঘরে প্রবেশ করো, যাতে এই সময়ের মধ্যে তোমার স্ত্রী চুল আঁচড়িয়ে না থাকলে আঁচড়ে নিতে পারে এবং নিজেকে পরিপাটি করে নিতে পারে।'
> (বুখারি : ৪৭৯১)

এখানে ১৭ বছর বয়সি জাবির (রা.)-কে নবিজি উপদেশ দিচ্ছেন ধীরেসুস্থে রাতের দিকে স্ত্রীর নিকট গমন করতে। এর কারণ হিসেবে নবিজি ব্যাখ্যা দিলেন—যাতে এই সময়ে জাবিরের স্ত্রী স্বামীর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে। এটি দাম্পত্য সম্পর্কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণটি বর্ণনা করে নবিজি আরেকটি সাধারণ আদব শিক্ষা দিলেন—

> 'স্ত্রীর নিকট ভদ্রতা ও প্রজ্ঞার সাথে গমন করবে।' (বুখারি : ৪৭৯১)

অর্থাৎ, তারুণ্যের অস্থিরমতি স্বভাবে তাড়িত হয়ে স্ত্রীর ব্যাপারে এমন তাড়াহুড়ো কোরো না, যাতে সে কষ্ট পায়। সুবহানাল্লাহ! রাসূল ﷺ-এর উপদেশ প্রদান নীতি কতই-না সুন্দর! কতই-না বাস্তবধর্মী!

বুদ্ধিমত্তার সাথে ভুল সংশোধন

কিশোর-তরুণদের ভুল সংশোধন করানোর ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া বড়োদের কর্তব্য। এই বয়সে তরুণদের মধ্যে ক্রমশ ব্যক্তিত্ববোধ তৈরি হয়; কিছুটা হলেও তাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ কাজ করে। তাই ভুল শুধরে দেওয়ার ক্ষেত্রে তরুণদের আত্মসম্মানবোধের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি। জনসম্মুখে বকা দিয়ে কিংবা অপমানকর উপায়ে মারধর করে তরুণদের সংশোধন করার চেষ্টা অনেকাংশেই বুমেরাং হয়ে ওঠে। সুতরাং তাদের শোধরানোর চেষ্টা করতে হবে ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে।

Scanned by CamScanner

একবার হজের মৌসুমে নবিজি তাঁর চাচাতো ভাই ফজল ইবনে আব্বাস (রা.)-কে নিজের বাহনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ফজল (রা.) ছিলেন কালো চুল ও সুন্দর চেহারার অধিকারী টগবগে উঠতি তরুণ। কিছুদূর যাওয়ার পর খাসআম গোত্রের এক তরুণী নবিজির নিকট এলো তার অসুস্থ বাবার হজের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে। তরুণী আসামাত্রই ফজলের চোখ তার দিকে নিবদ্ধ হলো। ফজলের এই দৃষ্টি নিবদ্ধের বিষয়টি রাসূল ﷺ-এর নজর এড়াল না। তিনি ফজলকে কিছু না বলে আলতো করে তাঁর চোয়াল ধরে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দিলেন। কিন্তু খানিক পরে ফজল পুনরায় তাকালেন তরুণীর দিকে। নবিজি উত্তর প্রদানের ফাঁকে আবারও ফজলের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন; কিন্তু তরুণীর উপস্থিতিতে তাঁকে কিছুই বললেন না। প্রশ্নের জবাব পেয়ে তরুণী চলে গেলে নবিজি তাঁর তরুণ চাচাতো ভাইকে নরম স্বরে বললেন—

> 'ফজল, আজকের দিনটি কতই-না মহান! যে আজ নিজের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে, লজ্জাস্থান ও জবান সুরক্ষিত রাখবে, তাকে মাফ করে দেওয়া হবে।'
> (আবু দাউদ : ১৮০৯, ১৯০৫; মুসনাদে আহমদ : ৩০৪২)

এখানে নবিজির ভুল শোধরানোর পদ্ধতিটি অত্যন্ত চমৎকার। তিনি ফজল (রা.)-কে ধমকের সুরে কিছু বললেন না কিংবা শাস্তিমূলক বার্তাও শোনালেন না; বরং তাঁকে কিছুক্ষণ আগের ঘটনার বিপরীত কর্মের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করলেন। এর মাধ্যমে তিনি ফজলের তরুণ মনে পরোক্ষভাবে বার্তা দিলেন, নিজের দৃষ্টি লজ্জাস্থান ও জবান নফসের খায়েশ অনুযায়ী ব্যবহার করতে নেই। এটা গুনাহের কাজ এবং এই তিনটি বিষয়েই গুনাহ সংঘটিত হওয়ার মূল অস্ত্র। আজকের দিনের বিশেষ পুরস্কার হলো—পাপাচারের এই প্রধান তিনটি হাতিয়ারের অবৈধ ব্যবহার থেকে যে মুক্ত থাকবে, আল্লাহ তার গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন।

পরিশ্রমী করে গড়ে তোলা

পরনির্ভরশীলতা জীবনের জন্য অভিশাপস্বরূপ। পরনির্ভরশীল প্রজন্ম পরাশ্রয়ী তৃণের মতো; তারা কখনোই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। তাই রাসূল ﷺ সর্বদা পরনির্ভরশীলতাকে তিরস্কার করেছেন, সব সময় উৎসাহ দিয়েছেন

Scanned by CamScanner

স্বনির্ভর বা স্বাবলম্বী হতে। রাসূল ﷺ নিজেও স্বীয় কাজ অন্যের জন্য ফেলে রাখতেন না। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'রাসূল ﷺ নিজের কাপড়ের উকুন পরিষ্কার করতেন, বকরির দুধ দোহন করতেন, নিজের কাপড় ও জুতা সেলাই করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করতেন।'
> (মুসনাদে আহমদ : ২৬১৯৪; সহিহ ইবনে হিব্বান : ৫৬৭৭)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

> 'মানুষের জন্য সর্বোত্তম খাদ্য হলো নিজের হাতে উপার্জনকৃত খাদ্য।' (বুখারি : ২০৭২)

আমাদের সমাজে অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের ননির পুতুল করে গড়ে তোলেন। তাদের দিয়ে কোনো কাজ করান না, শেখাতেও চান না। পরিণত বয়সে দেখা যায়—সন্তান জীবন পরিচালনার জন্য মৌলিক দায়িত্বটুকু নিতেও হিমশিম খায়; ধরাশায়ী হয় অতীব প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে। হালকা চাপেই পেরেশানিতে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়, অবশেষে সাহস ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে বেছে নেয় ভয়ংকর আত্মহননের পথ। এমন অকর্মণ্য প্রজন্মের এহেন করুণ পরিণতিই তো অনিবার্য! কারণ, যে সন্তান জীবনের একটি বড়ো অধ্যায়জুড়ে নিজের জীবন পরিচালনার মৌলিক দায়িত্বটুকুও নিতে শেখেনি, সে কী করে হঠাৎ বৃহৎ পরিসরে পরিবার-সমাজের দায়িত্বভার বহনে সক্ষম হবে?

আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলতে না চাইলে শৈশব ও কৈশোর থেকেই তাদের পরিশ্রমী করে গড়ে তুলতে হবে। তাদের শেখাতে হবে—'পরিশ্রম কখনো বৃথা যায় না; বরং পরিশ্রমে যে ঘাম ঝরে, সে ঘামের লোনা পানিতেই জন্ম নেয় সফলতার বীজ।'

সন্তানকে শৈশব থেকেই ছোটোখাটো কাজে যুক্ত করা অভিভাবকদের কর্তব্য। নিজের বই-খাতা-টেবিল গোছানো, শোয়ার বিছানা ও কাপড় ঠিকঠাক করা, বাবা-মাকে বাড়ির টুকটাক কাজে সহায়তা করা ইত্যাদিতে কিশোরদের অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। মাঝেমধ্যে ছোটোখাটো দায়িত্ব দিয়ে তাদের বোঝাতে হবে—এখন তোমার দায়িত্ব নেওয়ার বয়স হয়েছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে একদিকে তারা যেমন বিভিন্ন প্রয়োজনীয়

Scanned by CamScanner

কাজকর্মে অভ্যস্ত হবে, অন্যদিকে তেমনই দায়িত্বের ভার বহন করতে শিখবে ক্রমান্বয়ে। পাশাপাশি তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে, অনুভব করবে ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও পোক্তভাবে নিজেকে গড়ে তোলার প্রেরণা। একই সঙ্গে উপলব্ধি করবে, অহেতুক কর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে কর্মমুখী হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। এভাবে বয়সের সাথে তাল মিলিয়ে তারা শামিল হবে কর্মঠ ও স্বাবলম্বী মানুষের কাতারে।

কষ্টসহিষ্ণু করে গড়ে তোলা

যেকোনো পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতাসম্পন্ন তারুণ্য গড়ে তোলার জন্য শৈশব ও কৈশোর থেকেই তাদের কষ্টসহিষ্ণু করে গড়ে তোলা বড়োদের দায়িত্ব। তাদের বোঝানো উচিত—পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট-বেদনা খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। সুতরাং এসবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। মাঝেমধ্যে না পাওয়ার বেদনার সাথেও তাদের পরিচয় করানো উচিত। কেননা, সব সময় চাওয়ামাত্রই পেলে পরিণত বয়সে যেকোনো অপ্রাপ্তির বেদনা তাদের জন্য হয়ে উঠবে চূড়ান্ত অসহনীয়। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি যে দুনিয়ার অনিবার্য একটি বিষয়, অধিকাংশ পিতা-মাতাই তা শিশুদের নিকট অচেনা রাখতে চায়। ফলে কখনো অপ্রাপ্তির মুখোমুখি হলে তারা পাগলপারা হয়ে ওঠে অথবা চরম হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে খেই হারিয়ে ফেলে।

বিখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর মা কিশোর বয়সে আবদুল্লাহ (রা.)-কে অনেক কষ্টসহিষ্ণু করে গড়ে তুলেছিলেন। লোকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তাঁর মা বলতেন—'সন্তান যদি মায়ের দেওয়া এই কষ্টই সহ্য করতে না পারে, তবে সে কী করে শত্রুর দেওয়া কষ্ট সহ্য করবে?'

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক-ও একই সুর তুলে বলেছেন—'যে সন্তানকে বিড়ালের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়, সেই সন্তান সিংহের সাথে লড়াই করবে কীভাবে?'

সত্যিই তাই; একটু হোঁচট খেলেই যে অভিভাবক মুষড়ে পড়ে, তাদের সন্তান কী করে জীবনের বৃহৎ পরিসরে ঝুঁকি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে! তাই সন্তান একটু ব্যথা পেলেই অভিভাবকদের 'উহু! আহা!' করে অস্থির হওয়া উচিত নয়। এতে শিশু-কিশোররা সাহস হারিয়ে ভীতু ও দুর্বল হয়ে পড়ে,

Scanned by CamScanner

ভয় ও শঙ্কায় আড়ষ্ট হয়ে যায় অল্পতেই। তাই বড়োদের উচিত শিশু-কিশোরদের কষ্ট সহ্য করতে উৎসাহ প্রদান করা; সামান্য পড়ে গিয়ে ব্যথা পেলে কিংবা ছোটোখাটো ব্যর্থতায় তাদের অভয় দেওয়া। কাঁধ চাপড়ে বলা—'আরে এতটুকুতে কী হয়েছে! তুমি তো সাহসী ছেলে। আরও কঠিন কিছু জয় করার সক্ষমতা তুমি রাখো।'

বড়োদের এমন অভয় বাণীতে ছোটোরা বুকে সাহস পায়, প্রস্তুত হয় আরও কঠিন কিছু মোকাবিলার জন্য। ফলে কষ্ট-ব্যথা-বেদনা তাদের ঘায়েল করতে পারে না। যেকোনো পরিস্থিতিতে বুক ফুলিয়ে লড়াই করতে হিম্মত হারায় না কখনো।

নবিগণের আদর্শ তারুণ্য

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নবিগণের জীবনাচার আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। পূর্ববর্তী নবিগণের শরিয়াহ উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য রহিত হয়ে গেছে ঠিক, কিন্তু তাঁদের চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, ঈমানের দৃঢ়তা, সত্য ও ইনসাফের ওপর অনড় অবস্থান, উন্নত ও পরিশুদ্ধ জীবনাচার, চৌকশ কর্মকৌশল এবং নিষ্ঠা আজও আমাদের জন্য মহান আদর্শ হিসেবে পরিগণিত। তাই প্রত্যাশিত প্রজন্ম বিনির্মাণে নবিগণের তারুণ্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা অভিভাবক ও তরুণ উভয়ের জন্যই আবশ্যক। এবার আমরা কয়েকজন সম্মানিত নবি (আ.)-এর শৈশব-কৈশোর ও তারুণ্য সম্পর্কে জেনে নেব।

ইবরাহিম (আ.)-এর তারুণ্য : ইবরাহিম (আ.) শৈশব থেকেই সত্যানুসন্ধানী ছিলেন। জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই তিনি নিজের বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়েছেন, যুক্তি খুঁজেছেন, খুঁজেছেন নিজের রবকে। তরুণ বয়স থেকেই তিনি ছিলেন প্রভাব বিস্তার করার মতো যোগ্যতার অধিকারী। ছিলেন মানুষের চিন্তাকে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো শক্তিমান বিতার্কিক। মিথ্যার মসনদকে ধরাশায়ী করতে পারতেন সত্য যুক্তি দিয়ে।

পৌত্তলিকতার মহাসমারোহে অবস্থান করেও শিরকের কালো বিষ থেকে তিনি ছিলেন পবিত্র। তাঁর পরিবার ছিল বংশ পরম্পরায় পুরোহিত। ইচ্ছা করলেই তিনি এই আরাম ও ঝুঁকিহীন পেশা গ্রহণে পিতার অনুগামী হতে পারতেন। এতে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ-সম্পদের স্থায়ী বন্দোবস্তও হতো।

Scanned by CamScanner

কিন্তু এসব মিথ্যা ও কাল্পনিক আভিজাত্যের প্রতি কোনো রকম আগ্রহই দেখাননি তিনি; বরং পারিপার্শ্বিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই নিজেকে বারংবার প্রশ্ন করেছেন—এই আকাশ-বাতাস-চাঁদ-সূর্য কীভাবে সৃষ্টি হলো? এত সুন্দর করে কে সাজাল এ বসুন্ধরা? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরের পেছনে তিনি ছুটেছেন অবিরাম। একবার ভাবলেন—চাঁদ যেহেতু রাতের আঁধার বিলীন করে দেয়, তাই চাঁদ-ই হবে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা; কিন্তু রাত্রি শেষে চাঁদ আড়ালে গেলে তাঁর ভাবনায় ছেদ পড়ল। আবার দিনের উজ্জ্বল আলোর উৎসমূল সূর্যের দীপ্ত কিরণ দেখে ভাবল, যার আলোয় আলোকিত পুরো ধরণি, সেই হবে এ নিখিল জগতের স্রষ্টা। কিন্তু দিনশেষে সূর্যও যখন অস্তাচলে গেল, তিনি স্থির সিদ্ধান্তে এলেন—যার শেষ আছে, সে কখনো এ বিশ্বজগতের স্রষ্টা হতে পারে না। আমার স্রষ্টা তো সে-ই, যাঁর কোনো শুরু কিংবা শেষ নেই, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরন্তন। সূচনাহীন অতীত থেকে তিনি আছেন, থাকবেন অনন্ত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত। এভাবে কিশোর বয়েসেই ইবরাহিম (আ.) নিজের রবকে খুঁজে নেন। পেয়ে যান মহাসত্যের সন্ধান। অতঃপর সেই মহাসত্যের পথে আহ্বান করতে শুরু করলেন মানুষকে। কুরআন এই ঘটনাকে বর্ণনা করেছে এভাবে—

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَاۤ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ- فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ- فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَاۤ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ- اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

'অতঃপর রাত্রি যখন তাকে আচ্ছন্ন করল, তখন একটি নক্ষত্র দেখে সে বলল—"এ আমার রব।" কিন্তু যখন তা ডুবে গেল, সে বলল—"যে ডুবে যায়, আমি তাকে (রব হিসেবে) পছন্দ করি না।" তারপর যখন চাঁদকে আলো বিকিরণ করতে দেখল, বলল—"এ আমার রব।" কিন্তু যখন সেটাও ডুবে গেল, তখন বলল—"আমার রব পথপ্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের

Scanned by CamScanner

অন্তর্ভুক্ত হব।" এরপর যখন সূর্যকে দীপ্তিমান দেখল, তখন বলল—"এ আমার রব, এটি সবচেয়ে বড়ো!" কিন্তু এও যখন ডুবে গেল, তখন ইবরাহিম চিৎকার করে বলে উঠল—"হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরিক করো, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি তো একনিষ্ঠভাবে নিজের মুখ সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি, যিনি জমিন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।"' (সূরা আনআম : ৭৬-৭৯)

রবকে খুঁজে নেওয়ার পর তরুণ ইবরাহিম (আ.) নিজের পিতাসহ স্বজাতির যুবকদের পৌত্তলিকতা ছেড়ে প্রকৃত রব, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছেন। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের ভণিতার আশ্রয় নেননি তিনি। তাঁর সেই দীপ্ত ঘোষণা বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কুরআনে—

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ- قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ- قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ- قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ- قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ-

'সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন সে তার আপন পিতা ও জাতিকে বলেছিল—"এ মূর্তিগুলোর পরিচয় কী, যেগুলোর পূজায় তোমার মত্ত হয়ে আছ?" তারা জবাব দিলো—"আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এদের উপাসনা করতে দেখেছি।" সে বলল—"তোমরা পথভ্রষ্ট এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল।" তারা বলল—"তুমি কি আমাদের সামনে মন থেকে এসব কথা বলছ, না নিছক কৌতুক করছ।" সে জবাব দিলো—"না, (আমি জেনে-বুঝে মন থেকেই এসব বলছি) বরং আমি তোমাদের সামনে এ কথার সপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমাদের রব তিনিই, যিনি পৃথিবী ও আকাশের রব এবং তিনিই এসবের স্রষ্টা।"' (সূরা আম্বিয়া : ৫২-৫৬)

Scanned by CamScanner

সত্যের সাক্ষ্যদানে তরুণ ইবরাহিম (আ.) ছিলেন নির্ভয়, নিঃসংকোচ। তিনি স্বজাতির বদ্ধ ও যুক্তহীন চিন্তার রাজ্যে কুঠারাঘাত করার জন্য তাদের স্বহস্তে নির্মিত মূর্তিগুলো ভেঙে দিয়েছিলেন কুঠারাঘাতে। আর কুঠারটি ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন সবচেয়ে বড়ো মূর্তিটির গলায়। জাতির লোকেরা যখন তাঁকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল, তিনি বললেন—'বড়ো মূর্তিটাই হয়তো এ কাজ করে থাকবে। বাকি মূর্তিদের জিজ্ঞেস করো, তারাই বলে দিক!' তরুণ ছেলের এমন কথায় সকলের চিন্তার রাজ্যে ঝড় বয়ে গেল। সেই ঝড়ের মাঝে সুনামি হয়ে এলো ইবরাহিম (আ.)-এর পরবর্তী মন্তব্য। তাঁর কথার সারমর্ম অনেকটা এমন—'যদি এ মূর্তি নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে না পারে, তবে সে কী করে তোমাদের রক্ষা করবে? তাহলে কি তোমরা এমন সব জিনিসের পূজা করছ, যারা তোমাদের না উপকার করতে পারে, না কোনো ক্ষতি?'

মহান আল্লাহ এই ঘটনাকে তুলে ধরে বলেন—

قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ- قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ- فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ- ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ- قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ- اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ-

'(ইবরাহিমের জাতির লোকেরা তাঁকে) জিজ্ঞেস করল—"ওহে ইবরাহিম! তুমি কি আমাদের ইলাহদের সাথে এ কাণ্ড করেছ?" সে জবাব দিলো—"বরং ওদের মধ্যে এই বড়োটিই এরূপ করেছে। সুতরাং তোমরা ওদেরকেই জিজ্ঞেস করো; যদি ওরা কথা বলতে পারে।" এ কথা শুনে তারা নিজেদের বিবেকের দিকে ফিরল এবং (মনে মনে) বলতে লাগল—"সত্যি তোমরা নিজেরাই জালিম।" কিন্তু আবার তাদের মত পালটে গেল এবং বলতে থাকল—"তুমি জানোই যে, এরা কথা বলতে পারে না।" ইবরাহিম বলল—"তাহলে তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব জিনিসের পূজা করছ, যারা তোমাদের না উপকার করতে পারে, না ক্ষতি?

Scanned by CamScanner

ধিক তোমাদেরকে ও তোমাদের সেসব উপাস্যকে; আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা তোমরা করো। তোমাদের কি এতটুকুও জ্ঞান-বুদ্ধি নেই?"' (সূরা আম্বিয়া : ৬২-৬৭)

ইবরাহিম (আ.)-এর উদ্দেশ্য নিছক মূর্তি ভাঙা কিংবা সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ছিল না; বরং মূল লক্ষ্য ছিল মিথ্যা রবের অসারতা ও অসহায়ত্ব প্রমাণ করা, জাতির চিন্তায় আলোড়ন তুলে তাদের সামনে সত্যকে উন্মোচন করা। তরুণ ইবরাহিমের এমন বুদ্ধিদীপ্ত কর্মের কাছে পুরো জাতি হেরে গেল। আর বিবেকের দুয়ারে তালা মেরে মেতে উঠল হঠকারী তৎপরতায়। তাদের সমস্ত রাগ এসে পড়ল ইবরাহিম (আ.) ওপর। তারা বলল—

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ-

'তারা বলল—"পুড়িয়ে ফেলো একে এবং সাহায্য করো তোমাদের উপাস্যদের, যদি তোমরা কিছু করতে চাও!"' (সূরা আম্বিয়া : ৬৮)

এরপর ইবরাহিম (আ.)-কে নিয়ে আসা হলো তৎকালীন প্রতাপশালী বাদশাহ নমরুদের সামনে। নমরুদ তাঁকে রব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। শুরু হলো সত্য ও মিথ্যা রবের পরিচয় সম্পর্কে তুমুল বিতর্ক। এবারও ইবরাহিম (আ.) তাঁর অসামান্য প্রজ্ঞা ও যুক্তির অস্ত্র দিয়ে মিথ্যাকে ধরাশায়ী করলেন। কুরআন সেই বিতর্ককে তুলে ধরেছে—

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ-

'তুমি কি সেই ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করোনি, যে ইবরাহিমের সাথে বিতর্ক করেছিল? বিতর্ক করেছিল এই কথা নিয়ে—ইবরাহিমের রব কে? এবং বিতর্ক এজন্য করেছিল—আল্লাহ তাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছিলেন। যখন ইবরাহিম বলল—"যিনি জীবন ও মৃত্যু দেন, তিনিই আমার রব।" জবাবে সে বলল—"জীবন ও মৃত্যু তো আমার হাতেও।" ইবরাহিম বলল—"তাই যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ পূর্ব দিক

Scanned by CamScanner

> থেকে সূর্য ওঠান, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উঠাও দেখি।" এ কথা শুনে সেই সত্য অস্বীকারকারী হতবুদ্ধি হয়ে গেল; কিন্তু আল্লাহ জালিমদের সঠিক পথ দেখান না।' (সূরা বাকারা : ২৫৮)

এভাবেই ইবরাহিম (আ.) নিজের তারুণ্যকে সাজিয়েছিলেন—প্রকৃত রবের নিকট আত্মসমর্পণ, মিথ্যায় নিমজ্জিত মানুষকে সত্যের প্রতি আহ্বান এবং উত্তম যুক্তি দিয়ে মানুষের মস্তিষ্কে গেড়ে বসা মিথ্যাকে অপসারণের মধ্য দিয়ে।

ইসমাইল (আ.)-এর তারুণ্য : ইবরাহিম (আ.)-এর বড়ো পুত্র ইসমাইল (আ.) শৈশবেই আল্লাহর রাহে কুরবানির এমন নজির স্থাপন করেছিলেন, যা পৃথিবীর মানুষ পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে শেষ দিন পর্যন্ত। তিনি আল্লাহকে খুশি করার জন্য নির্দ্বিধায় এবং সম্পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে নিজেকে তরবারির নিচে সঁপে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা সেই নজির কুরআনে বর্ণনা করে বলেছেন—

> فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ
> فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ؗ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ
> اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ- فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ- وَنَادَيْنٰهُ اَنْ
> يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ- قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ-
>
> 'সে পুত্র যখন তাঁর সাথে কাজকর্ম করার বয়সে পৌঁছল, তখন (একদিন) ইবরাহিম তাঁকে বলল—"হে পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখি তোমাকে জবেহ করছি। এখন বলো তুমি কী মনে করো?" সে বলল—"হে আব্বাজান! আপনাকে যা হুকুম দেওয়া হচ্ছে, তা করে ফেলুন। আপনি আমাকে সবরকারীই পাবেন, ইনশাআল্লাহ!" শেষ পর্যন্ত যখন তাঁরা দুজন আনুগত্যের শির নত করে দিলো এবং ইবরাহিম উপুড় করে শুইয়ে দিলো পুত্রকে, আমি আওয়াজ দিলাম—"হে ইবরাহিম! তুমি স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়েছ। আমি সৎকর্মকারীদের এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।"'
> (সূরা সফফাত : ১০২-১০৫)

তরুণ বয়সে উপনীত হয়ে ইসমাইল (আ.) পৃথিবীর প্রথম ঘর পবিত্র কাবা শরিফ পুনর্নির্মাণে বাবাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ব্যাপারে বলেন—

Scanned by CamScanner

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

'আর স্মরণ করো, ইবরাহিম ও ইসমাইল যখন এই গৃহের ভিত্তিপ্রাচীর নির্মাণ করছিল, তাঁরা দুআ করে বলছিল—"হে আমাদের রব! আমাদের এই খেদমত কবুল করে নাও। তুমি সবকিছু শ্রবণকারী ও সবকিছু জ্ঞাত। হে আমাদের রব! আমাদের দুজনকে তোমার প্রতি মুসলিম (নির্দেশের অনুগত) বানিয়ে দাও। আমাদের বংশ থেকে এমন একটি জাতির সৃষ্টি করো, যারা হবে তোমার অনুগত। তোমার ইবাদতের পদ্ধতি আমাদের বলে দাও এবং কবুল করো আমাদের তওবা। তুমি বড়োই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।"' (সূরা বাকারা : ১২৭-১২৮)

ইসমাইল (আ.)-এর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের তরুণদেরও উচিত, আল্লাহর খুশির জন্য নিজের সমস্ত খেয়ালখুশি ও প্রবৃত্তিকে রবের নিকট সমর্পণ করা এবং নিজের যাবতীয় মেধা, যোগ্যতা ও সামর্থ্যকে দ্বীনের পথে নিযুক্ত করা। ইসমাইল (আ.) তাঁর বাবার কাজে সাহায্য করেছিলেন, রবের নিকট পিতার সম্মানকে বৃদ্ধি করেছিলেন নিজেকে কুরবানির জন্য সঁপে দিয়ে। তরুণদেরও উচিত পিতার বৈধ কাজে সহায়তার মধ্য দিয়ে পিতার সম্মান বজায় রাখা। একই সঙ্গে এমন সব কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা, পিতার মর্যাদায় যা সামান্যতম আঁচড় ফেলে।

তরুণ বয়সে ইউসুফ (আ.) : নবি ইউসুফ (আ.) শৈশব থেকেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও বিনয়ী ছিলেন। তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্র কিয়ামত পর্যন্ত উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে অনাগত তরুণদের জন্য। শৈশবে তিনি এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেন। পিতা ইয়াকুব (আ.) সেই স্বপ্নের গূঢ় রহস্য বুঝতে পেরে ছোট্ট ইউসুফকে বলেছিলেন—এই স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদেরকে তুমি বোলো না। কুরআন সেই ঘটনা এভাবে তুলে ধরেছে—

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يَا اَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سَاجِدِيْنَ - قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلٰى

Scanned by CamScanner

اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۖ اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ- وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَه عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَا اَتَمَّهَا عَلٰى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحَاقَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-

'এটা সেই সময়ের কথা, যখন ইউসুফ তাঁর পিতাকে বলেছিল—"আব্বাজান! আমি স্বপ্ন দেখেছি এগারোটি তারকা, সূর্য ও চাঁদ আমাকে সিজদা করছে।" জবাবে তাঁর পিতা বলল—"বেটা! এ স্বপ্নের কথা তোমার অন্য ভাইদের শোনাবে না; শোনালে তারা তোমার ক্ষতি করার জন্য পেছনে লাগবে। মূলত শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (স্বপ্নে যেমন দেখেছ) এভাবে তোমার রব তোমাকে (তাঁর কাজের জন্য) মনোনীত করবেন এবং কথার মর্মমূলে পৌছানো শেখাবেন (স্বপ্নের ব্যাখ্যা শেখাবেন)।" আর তোমার প্রতি এবং ইয়াকুবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তিনি অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম ও ইসহাকের প্রতি পূর্বে তিনি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেছিলেন। তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।' (সূরা ইউসুফ : ৪-৬)

এই ঘটনা আমাদের দুটি বিষয়ের শিক্ষা দেয়—

এক. ইউসুফ (আ.)-এর মতো আমাদের শিশু-কিশোর ও তরুণদেরও উচিত, অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে তৎক্ষণাৎ তা বাবা-মাকে জানানো, যাতে বাবা-মা পরিস্থিতির আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

দুই. ইয়াকুব (আ.) একজন পিতা হিসেবে শিশু ইউসুফের স্বপ্নকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর স্বপ্নের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং স্বপ্নের যথাযথ ব্যাখ্যা করে সন্তানকে উত্তম পরামর্শ দিয়েছেন; সতর্ক করেছেন পারিপার্শ্বিক বিপদ সম্পর্কে।

আমাদের অভিভাবকদেরও উচিত সন্তানের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনা। অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা তার সাথে ঘটছে কি না, কারও দ্বারা কোনো ধরনের অ্যাবিউজের শিকার হচ্ছে কি না কিংবা সে কোনো ভয় বা হুমকি দ্বারা তাড়িত হচ্ছে কি না ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাদের সাথে খোলামেলা আলাপ হওয়া জরুরি। তাদের সাথে এমন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত,

Scanned by CamScanner

যাতে যাবতীয় ভয়-আশঙ্কা-আনন্দ; সব কথাই তারা পিতা-মাতা ও জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের নিকট নির্ভয়ে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্ত করতে পারে।

কৈশোর বয়সে ইউসুফ (আ.) বৈমাত্রেয় ভাইদের হিংসা ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মিশরে দাস হিসেবে বিক্রি হন এবং মিশরের প্রভাবশালী রাজকর্তা আজিজে মিশর তাঁকে ক্রয় করে নিজের সুন্দরী স্ত্রী জুলাইখাকে উপহার দেন। রুক্ষ মরুভূমিতে বেড়ে ওঠা ইউসুফ মিশরের রাজন্যবর্গের অভিজাত পরিবেশের সাথে দ্রুতই মানিয়ে নেন। মিশরের উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তিনি নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ পান, ধীরে ধীরে আত্মস্থ করতে থাকেন সবকিছু। তিনি মিশরীয় বর্ণলিপি হায়ারোগ্লিফিক্স পড়তে ও লিখতে শেখেন। ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নিযুক্ত হন আজিজে মিশরের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধায়ক ও সচিব হিসেবে।

একজন স্মার্ট কিশোর বা তরুণের বৈশিষ্ট্য তো এটাই। নিজের সাথে ঘটে যাওয়া যেকোনো দুর্ঘটনাকে তড়িদ্‌গতিতে মেনে নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে দ্রুত খাপ খাইয়ে নেওয়াই স্মার্টনেসের পরিচায়ক। তরুণদের উচিত—যখনই কোনো ভালো পরিবেশ ও উন্নত সভ্যতার সাক্ষাৎ পাবে, কালবিলম্ব না করে সেখানকার ইতিবাচক দিকগুলো নিজের মধ্যে আয়ত্ত করে ফেলা এবং নিজের মেধা ও যোগ্যতার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। একই সঙ্গে নেতিবাচক দিকগুলোকে এড়িয়ে চলা। এভাবে ধৈর্য ও তাওয়াক্কুলের সাথে নিজেকে যোগ্য হিসেবে প্রমাণ করতে পারলে আল্লাহ তার জন্য উত্তম বিকল্পের ব্যবস্থা করে দেবেন, যেমনটি দিয়েছিলেন নবি ইউসুফ (আ.)-কে। খেয়াল করে দেখুন—বাবা-মাকে হারিয়ে এবং দাস হিসেবে বিক্রি হয়ে নতুন পরিবেশে এসেও তিনি হতাশার সাগরে নিমজ্জিত হননি; বরং নতুন পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য শুরু করেছেন নবযাত্রা। সফলও হয়েছেন অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে।

তরুণ বয়সে উপনীত হয়ে ইউসুফ (আ.) এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আজিজে মিশরের পত্নী, পরমা সুন্দরী অভিজাত রমণী জুলাইখা নিজের সাত স্তরবিশিষ্ট খাসকামরায় ডেকে নিয়ে তরুণ ইউসুফের নিকট পাণি প্রার্থনা করেন। উঠতি বয়সের টগবগে তরুণ ইউসুফ (আ.) জুলাইখার এই প্রেমাসক্ত আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করে দরজার দিকে দৌড় শুরু করেন। যিনার মতো নিষিদ্ধ অপকর্ম থেকে বাঁচতে

Scanned by CamScanner

ইউসুফ (আ.)-এর এই প্রচেষ্টা ও তাওয়াক্কুলে সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তাঁর কুদরতি শক্তিতে দরজার প্রত্যেকটি তালা খুলে দেন। তারপরও ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয় ইউসুফ (আ.)-কে। কুরআনের বর্ণনায়—

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْۤ اَحْسَنَ مَثْوَايَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ- وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَاۤ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ- وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ؕ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّاۤ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

'যে নারীর ঘরে সে ছিল (বড়ো হচ্ছিল), সে নারী তাঁকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকল এবং একদিন সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল—"চলে এসো।" ইউসুফ বলল—"আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি, আমার রব তো আমাকে ভালোই মর্যাদা দিয়েছেন (আর আমি এ কাজ করব!)। এ ধরনের জালিমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না।" মহিলাটি তাঁর আসক্ত ছিল এবং ইউসুফও তার প্রতি আসক্ত হতো, যদি না তাঁর রবের জ্বলন্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করত। এমনটিই হলো, যাতে আমি তাঁর থেকে অসৎবৃত্তি ও অশ্লীলতা দূর করে দিতে পারি। তাঁকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখবার জন্য এইভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। মূলত সে ছিল আমার নির্বাচিত বান্দাদের একজন। শেষ পর্যন্ত ইউসুফ ও সে আগপিছে দরজার দিকে দৌড়ে গেল এবং সে পেছন থেকে ইউসুফের জামা (টেনে ধরে) ছিঁড়ে ফেলল। উভয়েই দরজার অপর পাশে তার স্বামীকে উপস্থিত পেল। তাঁকে দেখতেই মহিলাটি বলতে লাগল—"তোমার পরিবারের প্রতি যে অসৎ কামনা পোষণ করে, তার কী শাস্তি হতে পারে? তাকে কারাগারে প্রেরণ করা অথবা কঠোর শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কী শাস্তি দেওয়া যেতে পারে?"' (সূরা ইউসুফ : ২৩-২৫)

Scanned by CamScanner

চারিত্রিক পবিত্রতার প্রশ্নে ইউসুফ (আ.)-এর এমন আপসহীনতা তরুণ-যুবকদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। তিনি ইচ্ছা করলে তারুণ্যের উত্তাল আকাঙ্ক্ষার যাচ্ছেতাই ব্যবহার করতে পারতেন, একটি কাক-পক্ষীও টের পেত না সেটা; কিন্তু তিনি আল্লাহর পবিত্র ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে নির্জন কক্ষেও পরমা রূপসি নারীর অপবিত্র নিবেদনকে আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে মেরেছেন। অথচ আমরা কতই-না দিগ্‌ভ্রান্ত! ভদ্রতার মুখোশের আড়ালে সর্বদা সুযোগসন্ধানী। বাইরের আবরণ ভদ্রতার মোড়কে আচ্ছাদিত হলেও ভেতরের চেহারাটা অতিশয় কদাকার। অনেকেরই নির্জনতা কাটে পর্নোগ্রাফিতে কিংবা অবৈধ প্রেম চর্চায়। অধিকাংশের চ্যাটিং ইনবক্স নিষিদ্ধ আলাপনে ঠাসা। পরকীয়া, নিষিদ্ধ সম্পর্ক ও ব্ল্যাক মেইলিংয়ের মাধ্যমে ব্যভিচার যেন আজ অতি সাধারণ বিষয়। সমাজের জ্যেষ্ঠদের এমন কর্মে তরুণ সমাজও মারাত্মকভাবে সংক্রমিত। অবস্থার অবনতি এমন পর্যায়ে ঠেকেছে যে, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা যেন অনেকের নিকট আজ রূপকথার কোনো গল্প। যিনার এমন ধ্বংসাত্মক মহামারি থেকে রক্ষার জন্য ইউসুফ (আ.)-এর চারিত্রিক দৃঢ়তা থেকে তরুণ সমাজ ও বড়োদের শিক্ষা নিতে হবে। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'আল্লাহ তায়ালা সাত ব্যক্তিকে সেই দিন তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। সেই সাত ব্যক্তি হলো—
>
> ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক।
>
> ২. সেই যুবক, যার যৌবনকাল আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে অতিবাহিত হয়।
>
> ৩. সেই ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে।
>
> ৪. সেই দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালোবাসার ওপর মিলিত হয় এবং এই ভালোবাসার ওপরই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়।
>
> ৫. সেই ব্যক্তি, যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত, সুন্দরী রমণী (যিনার দিকে) আহ্বান করে, কিন্তু সে বলে—"আমি আল্লাহকে ভয় করি।"
>
> ৬. সেই ব্যক্তি, যে গোপনে দান করে; এমনকী তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না।
>
> ৭. আর সেই ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।' (বুখারি : ৬৬০)

Scanned by CamScanner

কারাগারে এসেও দমে যাননি ইউসুফ (আ.)। তিনি দেখেন, কারাগারের ভেতরের পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত নাজুক। চারদিক অপরিষ্কার-নোংরা, যেন রীতিমতো ময়লার ভাগাড়। কারাবন্দিরাও জীবনের সমস্ত আশা হারিয়ে হয়ে উঠেছে মারাত্মক হিংস্র। মনুষ্য আচরণ তাদের নেই বললেই চলে। তরুণ ইউসুফ কারাগারের পরিবেশে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসেন। নিয়মিত তালিম ও দাওয়াতের মাধ্যমে নতুন করে আশার আলো সঞ্চার করেন বন্দিদের মনে। স্রষ্টার পরিচয় তুলে ধরে তাদের হৃদয়-জমিনে বপন করেন ঈমানের বীজ। ফলে আস্তে আস্তে তাদের আচরণে পরিবর্তন আসে, পরিবর্তন আসে চিন্তায়। ময়লার ভাগাড় সরিয়ে কারাগারকে তারা সাজিয়ে তোলে পবিত্র ও বাসযোগ্যরূপে। এভাবে সকল কয়েদির নিকট উত্তম আদর্শ ও অভিভাবক হিসেবে আবির্ভূত হন তিনি। কারাকর্তৃপক্ষও তরুণ ইউসুফের এসব উদ্যোগে যারপরনাই আনন্দিত হয়।

কারামুক্তির পর তিনি মিশরের রাজার কোষাধ্যক্ষ এবং খাদ্যশস্য সংরক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। তখনও যথারীতি তিনি তাঁর তারুণ্য, যৌবন, শক্তি ও সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে দেশের সেবা করেন। শস্য সংরক্ষণ ও বণ্টনের জন্য প্রণয়ন করেন ১৪ বছর মেয়াদি জাতীয় পরিকল্পনা। তখন আশপাশের সবগুলো দেশে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও ইউসুফ (আ.)-এর এই দূরদর্শিতামূলক সিদ্ধান্তের কারণে মিশরে কোনো খাদ্যাভাব দেখা দেয়নি। তাঁর যথাযথ পরিকল্পনা এবং সেটার বাস্তবায়ন দুর্ভিক্ষ চলাকালেও মিশরকে রেখেছিল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সংকটমুক্ত।

এখানেও ইউসুফ (আ.) সর্বযুগের তরুণদের জন্য অনুসরণীয়। তাঁর কর্মনীতি থেকে শিক্ষা নিয়ে তরুণদের যেকোনো পরিস্থিতিতে টিকে থাকার শক্তি অর্জন করতে হবে। গোবরেও ফোটাতে হবে পদ্মফুল। সাহস না হারিয়ে অতি জঘন্য পরিবেশকেও উত্তম আচরণ, সঠিক জ্ঞান ও জুতসই পরিকল্পনায় করে তুলতে হবে সুন্দর ও উপযোগী। হতাশার নয়, আশার বাণী শুনিয়ে মানুষকে ইতিবাচক কাজের দিকে উজ্জীবিত করতে হবে। তাদের কাছে ঘেঁষে আহ্বান করতে হবে সত্যের দিকে।

জীবনের উত্থান-পতনে কীভাবে ধৈর্যধারণ করতে হয়, সবকিছু হারিয়েও নতুন করে জীবন সাজাতে হয়—তার চমৎকার উপমা ইউসুফ (আ.)-এর তারুণ্য। বিপদে তিনি শুধু ধৈর্যই ধারণ করেননি; বরং বিপদকে শিক্ষার

Scanned by CamScanner

উপকরণে রূপান্তর করে নিজেকে গড়ে তুলেছেন আরও দৃঢ় ও আত্মবিশ্বাসী করে—'He transformed all challenges into opportutnities.' এভাবেই তিনি শত বিপর্যয়কে জয় করে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের ত্রাণকর্তা হিসেবে নিজেকে আবিষ্কার করেছেন।

দাউদ (আ.)-এর তারুণ্য : তরুণ বয়সেই দাউদ (আ.) তাঁর জাতির ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ সমর কৌশলের মাধ্যমে অনিবার্য বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন পুরো জাতিকে। সেবার বনি ইসরাইলের বাদশাহ তালুত তাঁর সৈন্যদের নিয়ে বের হয়েছিলেন কাফির শক্তি জালুতের বিরুদ্ধে। কিন্তু জর্দান নদী পার হওয়ার সময় অধিকাংশ সৈন্য তাঁর আদেশ অমান্য করে নদীর পানি পান করে ফেলে। ফলে সামনে এগোতে অক্ষম হয়ে পড়ে তারা। কিছুদূর যাওয়ার পর বাকি সৈন্যদেরও অধিকাংশ যুদ্ধে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তবে তখনও তালুতের পক্ষে যুদ্ধে অবিচল ছিল আল্লাহভীরু কিছু সৈন্য। আল্লাহ তায়ালা সেই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন—

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ-

'তারপর তালুত যখন সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে চলল, সে বলল—“আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নদীতে তোমাদের পরীক্ষা হবে। যে তার পানি পান করবে, সে আমার সহযোগী নয়। একমাত্র সে-ই আমার সহযোগী, যে তার পানি থেকে নিজের পিপাসা নিবারণ করবে না। তবে এক আধ আঁজলা কেউ পান করতে চাইলে করতে পারে।” কিন্তু স্বল্পসংখ্যক লোক ছাড়া বাকি সবাই সেই নদীর পানি আকণ্ঠ পান করল। অতঃপর তালুত ও তাঁর ঈমানদার সাথিরা যখন নদী পেরিয়ে সামনে

Scanned by CamScanner

> এগিয়ে গেল, তখন তাঁরা তালুতকে বলে দিলো, আজ জালুত ও তার সেনাদলের মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু যারা এ কথা মনে করছিল—তাদের একদিন আল্লাহর সাথে মোলাকাত হবে, তারা বলল—"অনেকবারই দেখা গেছে, স্বল্পসংখ্যক লোকের একটি দল আল্লাহর হুকুমে একটি বিরাট দলের ওপর বিজয় লাভ করেছে। আর আল্লাহ সবরকারীদের সাথি।'" (সূরা বাকারা : ২৪৯)

জালুত ছিল বিশাল দেহের অধিকারী। যুদ্ধের ময়দানে সে একাই ছিল কয়েকশো সৈন্যের সমান। পক্ষান্তরে তালুতের বাহিনী এমনিতেই কম, তার ওপর অধিকাংশ সৈন্য পেছনে সরে গেছে। তালুতের নেতৃত্বে বনি ইসরাইল তখন খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে। জাতির এমন দুর্দিনে ত্রাণকর্তারূপে সামনে এলেন ১৭ বছর বয়সি এক তরুণ। প্রথমবারের মতো লৌহবর্ম প্রস্তুত করে চমকে দিলেন শত্রু-মিত্র সবাইকে। তিনি আর কেউ নন, আল্লাহর পয়গম্বর দাউদ (আ.)। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন—

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّـكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ-

> 'আমি দাউদকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণের কৌশল শিক্ষা দিয়েছি, যাতে তোমরা প্রতিপক্ষের অস্ত্রের আঘাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারো। তোমরা কি এজন্য শোকরগোজার হবে না?' (সূরা আম্বিয়া : ৮০)

যুদ্ধের ময়দানে উভয় সেনাদল মুখোমুখি হলো। জালুতের বাহিনী প্রস্তাব করল, প্রথম লড়াই হবে উভয় শিবিরের শ্রেষ্ঠ দুই বীরের মধ্যে। এই লড়াইয়ে যে জিতবে, যুদ্ধে তার পক্ষই বিজয়ী বলে গণ্য হবে। শত্রুদল থেকে জালুত নিজেই এগিয়ে এলো। কিন্তু বিশালদেহী জালুতকে মোকাবিলা করবে কে? ভয়ে চুপসে গেল সবাই। আর ঠিক তখনই এগিয়ে এলো চৌকশ তরুণ দাউদ (আ.)। তিনি গোপনে হাতের মুঠোয় কয়েকটি নুড়িপাথর নিয়ে এলেন, খুঁজতে লাগলেন জালুতের দুর্বল জায়গা। যুদ্ধ শুরু হওয়ামাত্রই দাউদ (আ.) আচমকা জালুতের চোখ বরাবর সেই পাথরগুলো ছুড়ে মারলেন। লক্ষ্যভেদ করল পাথর। কিছু বুঝে উঠার আগেই হাতির ওপর থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল জালুত। এই সুযোগে দাউদ (আ.) এক কোপে

Scanned by CamScanner

তার শিরশ্ছেদ করে ফেললেন। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল জালুতের সেনাদল। তরুণ দাউদ (আ.)-এর বিচক্ষণতা ও সাহসিকতায় বিজয় লাভ করল তালুতের সেনাবাহিনী। এরপর আল্লাহ তায়ালা দাউদ (আ.)-কে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করলেন। আল্লাহ তায়ালা এই ঘটনার দিকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

فَهَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ -

> ‘অবশেষে আল্লাহর হুকুমে তাঁরা কাফিরদের পরাজিত করল। আর দাউদ জালুতকে হত্যা করল এবং আল্লাহ তাঁকে রাজ্য ও প্রজ্ঞা দান করলেন। আর এর সাথে যা যা তিনি চাইলেন, তাঁকে তা শিখিয়ে দিলেন।’ (সূরা বাকারা : ২৫১)

এভাবেই ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে তারুণ্যের চমকে দাউদ (আ.) শক্তিশালী আমালেকা জাতিকে পরাজিত করেছিলেন, জালুত বাদশাহকে হত্যা করে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন বনি ইসরাইল শিবিরে।

সোলায়মান (আ.)-এর তারুণ্য : সোলায়মান (আ.) ছিলেন দাউদ (আ.)-এর পুত্র। তরুণ বয়স থেকেই তিনি ছিলেন প্রখর প্রতিভার অধিকারী এবং মানুষের অধিকার ও ন্যায়বিচারের প্রতি যত্নবান। তাঁর পিতা দাউদ (আ.)ও ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক; ইনসাফ কায়েমে সদা তৎপর। তবুও কয়েকটি বিচারের ক্ষেত্রে তরুণ সোলায়মান (আ.) পিতার দেওয়া রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আপিল করেছিলেন এবং চমৎকার একটি বিকল্প রায় প্রস্তাব করে নিশ্চিত করেছিলেন অধিকতর ইনসাফ। বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষই সন্তুষ্ট হয়েছিল এতে।

একবার দুজন লোক বিচারের জন্য দাউদ (আ.)-এর দরবারে উপস্থিত হলো। তন্মধ্যে একজন ছাগলপালের আর অপরজন ছিল ফসলি জমির মালিক। জমির মালিক ছাগলপালের মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল—গতরাতে তার ছাগলের পাল আমার শস্যখেতে প্রবেশ করে সমস্ত ফসল লন্ডভন্ড করে দিয়েছে; একটুও বাকি রাখেনি। বিবাদীও অভিযোগ স্বীকার করে নিল। ফলে দাউদ (আ.) রায় দিলেন—ছাগলপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যখেতের মালিককে জরিমানাস্বরূপ প্রদান করবে। কেননা,

Scanned by CamScanner

ছাগলপালের সম্ভাব্য মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্যের প্রায় সমান ছিল। রায় মেনে নিয়ে বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষই বাড়ির পথ ধরল। আদালতের বাইরে আসতেই তাদের সাক্ষাৎ হলো তরুণ সোলায়মান (আ.)-এর সাথে। সোলায়মান (আ.) জানতে চাইলে তারা মোকদ্দমার রায় বর্ণনা করল। সোলায়মান (আ.) বললেন—'আমি হলে অন্যরকম রায় দিতাম, উভয়পক্ষই লাভবান হতো তাতে।' তারপর তিনি পিতা দাউদ (আ.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে রায় পুনর্বিবেচনার আপিল করলেন। দাউদ (আ.) বললেন—'বলো দেখি কী সেই রায়, যেটাতে উভয়পক্ষই লাভবান হবে?'

সোলায়মান (আ.) বললেন—'আপনি ছাগলের পালটি ফসলের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করতে থাকুক। আর ফসলের খেতটি ছাগলের মালিককে দিন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করুক। যখন শস্যক্ষেত্রটি ছাগল বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থার ন্যায় হবে, তখন শস্যক্ষেত্রটি তার মালিককে ফেরত দেবে। অনুরূপ ছাগলপালও তার মালিককে ফেরত দেওয়া হবে।' সোলায়মান (আ.)-এর এই রায় উভয়পক্ষেরই পছন্দ হলো। দাউদ (আ.)ও ছেলের বুদ্ধিমত্তায় ভীষণ খুশি হলেন।[৮]

এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন—

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ
وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ- فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا-

'স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তাঁরা উভয়ই একটি শস্যখেতের মোকদ্দমার ফয়সালা করছিল, যেখানে রাতের বেলা ছড়িয়ে পড়েছিল অন্য লোকদের ছাগল এবং আমি নিজেই দেখছিলাম তাঁদের বিচার। আমি সোলায়মানকে এ বিষয়ের (সঠিক) বুঝ দিয়েছিলাম আর (তাঁদের) প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম বিচারশক্তি ও জ্ঞান।' (সূরা আম্বিয়া : ৭৮-৭৯)

বিচার নিয়ে সোলায়মান (আ.)-এর আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তা ও বিরল প্রতিভার নমুনা আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনাকৃত সেই হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

---

৮ তাফসিরে ইবনে কাসির

'দুজন মহিলার সাথে তাদের দুটো ছেলে সন্তান ছিল। একটি বাঘ এসে তাদের একজনের ছেলেকে নিয়ে গেল। এরপর এক মহিলা অপর মহিলাকে বলল—"বাঘ তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে।" অন্যজন বলল—"বাঘ তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে।" এরপর তারা দুজন বিচারের দাবি নিয়ে গেল দাউদ (আ.)-এর নিকট। দাউদ (আ.) জ্যেষ্ঠ মহিলাটির পক্ষে রায় দিলেন। তারপর তারা বেরিয়ে দাউদ (আ.)-এর ছেলে সোলায়মান (আ.)-এর নিকট গেল এবং দুজনেই সোলায়মান (আ.)-কে তাদের ঘটনা জানাল। সব শুনে সোলায়মান (আ.) বললেন—"আমার কাছে একটি ছুরি আনো। আমি শিশুটিকে কেটে দুজনের মধ্যে ভাগ করে দেবো।" এই কথা শুনে বয়সে ছোটো স্ত্রীলোকটি বলল—"আপনি এমনটা করবেন না! আল্লাহ আপনার ওপর দয়া করুন। এই ছেলেটি তারই।" এরপর সোলায়মান (আ.) রায় দিলেন—ছেলেটি ছোটো মহিলার।' (বুখারি : ৬৭৬৯)

সোলায়মান (আ.)-এর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তায় প্রমাণ হয়েছিল দাবিকৃত ছেলেটি ছোটো মহিলারই। কারণ, হত্যার কথা শুনে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। আর যাই হোক প্রকৃত মা কখনো সন্তানের হত্যা সহ্য করতে পারে না। এভাবেই মানুষের অধিকার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় নিজের তারুণ্য ও মেধাশক্তিকে ব্যয় করেছিলেন সোলায়মান (আ.)।

রাসূল ﷺ-এর তারুণ্য

রাসূল ﷺ-এর তারুণ্য ছিল সর্বযুগের তরুণদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্র ও অনুপম ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ও দায়িত্বশীলতার মূর্তপ্রতীক। রাসূল ﷺ-এর শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্যের কিছু বৈশিষ্ট্য ও কর্মকাণ্ড নিচে তুলে ধরা হলো—

নিজেকে গঠন : রাসূল ﷺ-এর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে বিভিন্ন আঙ্গিকে নিজেকে নির্মাণের মধ্য দিয়ে। জন্মের কিছুদিন পর থেকেই বেড়ে উঠেছেন তায়েফের মরূদ্যানে, বনু সাদ গোত্রের দুধমাতা হালিমাতুস-সাদিয়ার গৃহে। সেখানে তিনি দুধভাইদের সঙ্গে খাবার ভাগাভাগি করে খেয়েছেন। এতে শিশু মুহাম্মাদ ﷺ এককেন্দ্রিকতার পরিবর্তে শিখেছেন সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে, স্বার্থপরতার বদলে নিয়েছেন পরোপকারের তালিম।

Scanned by CamScanner

সাদ গোত্র থেকে তিনি সেখানকার বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিখেছেন, যা একজন দাঈ ও নেতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৈশোরে তিনি পাড়ার বন্ধুদের সাথে মাঠে ছাগল চরাতে যেতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করতেন। এ ছাড়া মেষ চরানোর সুবাদে তিনি অনেকগুলো গুণ অর্জন করেছিলেন ছোটোবেলাতেই। যেমন—

- **চরম ধৈর্য :** ছাগলের পাল নিয়ন্ত্রণ করা অত্যধিক ধৈর্যের বিষয়। একটা এদিকে ছোটে, তো আরেকটা অন্যদিকে। সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় পূর্ণ ধৈর্যের সাথে, পরিস্থিতি বুঝে পদক্ষেপ নিতে হয় দ্রুত সময়ের মধ্যে। তাই ছাগল চরানোর মধ্য দিয়ে রাসূল ﷺ কিশোর বয়সেই ধৈর্যের গুণকে পোক্ত করেছিলেন।

- **গভীর মনোযোগ :** ছাগলের পাল মাঠে নিয়ে যাওয়া ও নিয়ে আসার পথে এবং চারণের সময় গভীর মনোযোগের সাথে সেগুলোর প্রতি খেয়াল করতে হয়। কারও বাগান বা শস্যক্ষেত্রে ঢুকে পড়ল কি না, কারও গাছ খেয়ে ফেলল কি না, অন্যের মালিকানাধীন চারণভূমিতে প্রবেশ করল কি না ইত্যাদি বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকতে হয় রাখালকে। তা ছাড়া মাঠে কোনো ছাগল দলচ্যুত হলো কি না, পালে হিংস্র প্রাণী প্রবেশ করল কি না কিংবা কোনো ছাগল অসুস্থ হয়ে পড়ল কি না—সেসব বিষয়েও রাখতে হয় প্রখর নজরদারি। ফলে ছাগলচারণের মাধ্যমে নবিজি কিশোর বয়সেই গভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষমতা অর্জন করেছিলেন।

- **দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতা অর্জন :** মরুভূমিতে যেকোনো সময় মরুঝড় ওঠার সম্ভাবনা থাকে। সেই দুর্যোগের মুহূর্তে শুধু নিজেকে রক্ষা করলেই চলে না; বরং একজন রাখালের জন্য পালের সমস্ত পশুকে রক্ষা করা অন্যতম কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে নিরাপদে ঘরে ফেরাতে হয় পশুগুলোকে। অবলা নির্বোধ পশুকে এমন দুর্যোগকালে নিয়ন্ত্রণ করা এবং নিরাপদে ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এবং কৌশলী ব্যাপার। এই দুঃসাধ্য কাজটি নিয়মিত করার মাধ্যমে কৈশোরকালেই নবিজি দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন

- **কষ্টসহিষ্ণুতা :** ছাগলচারণের জন্য মরুভূমির বৈরী আবহাওয়ায় টিকে থাকতে হয়, অর্জন করতে হয় ঝড়-ঝাপটা সহ্য করার সক্ষমতা। বুকে হিম্মত নিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে হয় প্রখর রোদ ও মরুঝড়ের বিপরীতে। মরুভূমির বুকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

Scanned by CamScanner

এসবকে সাথে নিয়েই রাখালকে দীর্ঘ মরুপথ চলতে হয়, সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয় যেকোনো দুর্যোগকে মোকাবিলার জন্য। ছাগলচারণের মধ্য দিয়ে রাসূল ﷺ নিজেকে কষ্টসহিষ্ণু করে গড়ে তুলেছেন, যা তাঁকে পরবর্তী দিনগুলোতে নবুয়তের কঠিন দায়িত্ব পালনে এবং কাফিরদের জুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে সাহায্য করেছে ব্যাপকভাবে।

- **নেতৃত্বের গুণ :** ছাগলচারণের সময় লাঠি পরিচালনা ও মমতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়, যা নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান গুণ। ছাগলচারণের সময় একজন রাখালকে একই সঙ্গে দুই পক্ষকে ম্যানেজ করতে হয়। একদিকে মালিকের স্বার্থ ও তার কাছে জবাবদিহিতার বিষয়টি মাথায় রাখতে হয়, আবার অন্যদিকে খেয়াল রাখতে হয়, অধস্তনের অধিকার ও নিরাপত্তা যাতে ক্ষুণ্ন না হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বের বিষয়টিও অনেকটা এ রকম। সেখানেও জনগণের অধিকার ও নিরাপত্তাবিধানের পাশাপাশি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করতে হয়। ইসলামে এই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হলো আল্লাহ তায়ালা। রাখালকে বহিঃশত্রু নেকড়ের হামলার ব্যাপারেও সদা সতর্ক থাকতে হয়। প্রয়োজনে বুক চিতিয়ে লড়াই করতে হয় নেকড়ের সাথে। একজন নেতার ক্ষেত্রেও বিষয়টি অনুরূপ। তাকেও বহিঃশত্রু ও তাদের গতিবিধি সম্পর্কে সর্বক্ষণ সজাগ থাকতে হয়; নিতে হয় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা।

এভাবে রাসূল ﷺ ছাগলচারণের মধ্য দিয়েই কিশোর বয়স থেকেই নেতৃত্বের প্রাথমিক অনেক গুণ অর্জন করেছিলেন। মূলত একজন মানুষের সৃজনশীলতা-নেতৃত্বগুণসহ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জিত হয় তার শৈশব থেকে যাপিত জীবনের বিভিন্ন কাজকর্ম ও অভ্যাসের মধ্য দিয়ে। এই ধরনের গুণ একদিনে বা রাতারাতি অর্জনের বিষয় নয়। তাই রাসূল ﷺ-এর শৈশব-কৈশোর থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের কিশোরদেরও এমন কাজে যুক্ত করা উচিত, যা তাদের উপরিউক্ত গুণসমূহ বিকাশে সাহায্য করবে। ছাগলই চরাতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আর সেটা আধুনিক সমাজে প্রায় অসম্ভবও বটে। সেক্ষেত্রে আমাদের বিকল্প কাজ খুঁজে নিতে হবে। কিশোরদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা বুঝে তাদের উপযোগী কিছু ছোটোখাটো কাজে ক্রমান্বয়ে যুক্ত করতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি এসব কাজে অভ্যস্ত হলে সার্বিক দিক থেকে যোগ্য হয়ে উঠবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

Scanned by CamScanner

লজ্জা ও ব্যক্তিত্ববোধ তৈরি : রাসূল ﷺ ছোটো থেকেই লজ্জাশীল ছিলেন। শালীনতা পরিপন্থি কোনো কাজে তিনি যুক্ত হতেন না। দু-একবার তিনি সমবয়সিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু এটা তার স্বভাববিরুদ্ধ হওয়ায় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে রক্ষা করেছেন।

কাবা ঘর পুনর্নির্মাণের সময় রাসূল ﷺ ও তাঁর চাচা আব্বাস (রা.) একসাথে মিলে পাথর বহন করছিলেন। সবাই সমাজের প্রথা অনুযায়ী পরনের লুঙ্গি খুলে কাঁধে রেখে তার ওপর পাথর নিল। আব্বাস (রা.) নবিজিকে বললেন—'তোমার লুঙ্গিটি কাঁধের ওপর দিয়ে নাও এবং সেটার ওপর পাথর রাখো। এতে তোমার কষ্ট কম হবে।' নবিজিও এমনটা করতে উদ্ধত হলেন। সহসাই তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তাঁর উভয় চোখ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল। তখন তিনি বললেন—'আমার লুঙ্গি দাও' এবং তা বেঁধে নিলেন। এরপর নবিজি কাপড় পরিধান করেই পাথর বহন করলেন।

কিশোর বয়সে আরেকদিন রাসূল ﷺ সহপাঠীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মক্কার জাহেলি গানের আসরে গিয়েছিলেন। আসরে বসামাত্রই কানে সজোরে আঘাত অনুভব করেন তিনি। আর সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। সকাল পর্যন্ত সেভাবেই ছিলেন। এভাবে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা অভিভাবক হয়ে স্বভাববিরুদ্ধ কাজ থেকে রক্ষা করেছেন তাঁকে।

আমাদের অভিভাবকদেরও উচিত শিশু-কিশোরদের মধ্যে এমন লজ্জা ও ব্যক্তিত্ববোধ জাগ্রত করা, যাতে তারা মন্দ বা শালীনতা পরিপন্থি কোনো কাজের নিকটবর্তী না হয়। কখনো মন্দ কাজের দিকে ধাবিত হলেও বিবেকের তাড়না এবং লজ্জাবোধ থেকেই ফিরে আসে সত্য সঠিক পথে।

বড়োদের সহবতে অভিজ্ঞতা অর্জন : একটু বড়ো হয়ে রাসূল ﷺ তাঁর চাচা আবু তালিবকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতেন। চাচার সাহচর্যে থেকে হাতেকলমে শিখে নিতেন ব্যবসায়ের নিয়মকানুন; এমনকী ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য চাচার সাথে সিরিয়া সফর করেছিলেন তিনি। তৎকালীন সময়ে ১৫শ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে সিরিয়ায় ভ্রমণ করা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না। উদ্যমী মনোভাব ছাড়া মালবোঝাই উটসমেত এমন কষ্টসাধ্য ভ্রমণ করা ছিল প্রায় অসম্ভব।

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনে আমাদের তরুণদেরও এমন উদ্যমী করে গড়ে তুলতে হবে। বড়োদের কাজে টুকটাক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞদের সাহচর্যে

Scanned by CamScanner

থেকে যেকোনো দক্ষতা অর্জন করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিরাত সমর্থিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতির আলোকে আমাদের তরুণদের পরিচালিত করা উচিত।

উত্তম বন্ধু নির্বাচন : মানুষ তার বন্ধুর দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। একজন লোক কেমন—সেটা তার বন্ধুদের দেখলেই টের পাওয়া যায়। যথার্থ বন্ধু নির্বাচন করার মধ্য দিয়ে মানুষ তার সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনকে সুষ্ঠু ও নিরাপদ করে তোলে। রাসূল ﷺ বন্ধু নির্বাচনে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন সব সময়। সাইয়্যেদুনা আবু বকর (রা.) ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর, পরামর্শক ও পরম বন্ধু। রাসূল ﷺ-এর জন্য আবু বকর (রা.)-এর আন্তরিকতা, আত্মত্যাগ আমাদের সকলেরই জানা। আর ব্যক্তি হিসেবে আবু বকর (রা.)-এর চারিত্রিক মাধুর্য, আল্লাহভীরুতা, বদান্যতা ইত্যাদি গুণাবলি ইতিহাসের পাতায় আজও সোনালি হরফে সংরক্ষিত।

উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণীদের ক্ষেত্রে সঙ্গদোষ একটি বড়ো সমস্যা। বর্তমান সময়ে অসৎসঙ্গে মিশে অনেক কিশোর-তরুণের পুরো ক্যারিয়ারটাই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ফেন্সিডিল, হিরোইন, ইয়াবা ইত্যাদি জীবনবিনাশী মাদকদ্রব্যের সাথে জড়িয়ে পড়ছে তারা। মাদকাসক্তিতে জড়িয়ে শুধু নিজের জীবন নয়; ধ্বংস করে দিচ্ছে পরিবার, সমাজ এমনকী রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা। আজকাল সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেমেয়েও মাদকের কবলে পড়ে লিপ্ত হচ্ছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে।

তাই আপনার উঠতি বয়সের আদরের সন্তান প্রতিদিন কোথায় যায়? কার সাথে মেশে? এসব ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজ নিন, মনিটরিং করুন। ভুল বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, বিপন্ন হতে পারে সম্ভাবনাময় সুন্দর জীবন। বিপথগামীদের সাথে মিশে তারা হয়ে যেতে পারে মাদকাসক্ত কিংবা জড়িয়ে পড়তে পারে কোনো কিশোর গ্যাংয়ের সাথে। আপনার পরম আদরের সন্তানটিও সঙ্গদোষে হয়ে উঠতে পারে অন্ধকার পথের যাত্রী। সুতরাং তরুণদের জন্য ভালো বন্ধু নির্বাচন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের আস্থা অর্জন : নিজের অতুলনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মেধা-সৃজনশীলতা-সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতার মাধ্যমে রাসূল ﷺ শৈশব থেকেই গণমানুষের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। লোকে তাঁকে 'আস-সাদিক' ও 'আল আমিন' (অর্থাৎ সত্যবাদী বিশ্বস্ত) বলে ডাকত। তিনি যা-ই বলতেন, নির্দ্বিধায় তা বিশ্বাস করত সবাই।

Scanned by CamScanner

কোনো কিশোর যখন মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনে সমর্থ হয়, তখন সেই কিশোরের জন্য বিপথে যাওয়া কিংবা কোনো খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়া কঠিন হয়ে পড়ে। তখন সাধারণ মানুষই তাকে খারাপ কাজে বাধা দেয়। আবার চক্ষুলজ্জার ভয়েও সে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। তাই আমাদের কিশোর-তরুণদের ছোটোবেলা থেকেই মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য উৎসাহ দিতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে—কারও প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস একদিনে তৈরি হয় না, সেটা অর্জন করতে হয় তিলে তিলে নিজেকে প্রমাণ করার মাধ্যমে।

সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ : তরুণ বয়সে উপনীত হয়ে তিনি বিভিন্ন জাতিগত সহিংসতা বন্ধের উপায় নিয়ে ভাবতেন। কীভাবে সমাজের অনিয়ম-বিশৃঙ্খলা দূর করা যায়, সেই ভাবনা আর সত্যানুসন্ধানেই অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকতেন তিনি।

ফিজারের যুদ্ধের ভয়াবহতা স্বচক্ষে দেখার পর রাসূল ﷺ-এর চিন্তার রাজ্যে ঝড় বয়ে যায়। যুদ্ধের পরপরই আপন চাচা ও গোত্রনেতা জোবায়ের ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে তিনি গঠন করেন 'হিলফুল ফুজুল' নামক একটি সামাজিক সংঘ। হাশিম ও জুহরাসহ বিভিন্ন বংশের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জুদআন আত-তামিমির গৃহে সমবেত হন এবং একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে, সেই চুক্তির ধারাগুলো ছিল—

১. আমরা দেশের অশান্তি দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

২. বিদেশি লোকদের জীবন-সম্পদ ও মান-সম্মান রক্ষা করব।

৩. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি সদ্ভাব বজায় রাখব।

৪. জনসাধারণকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করতে প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাব।[১]

এই সংগঠনের মাধ্যমেই তরুণ মুহাম্মাদ ﷺ মক্কার যুবসমাজকে একক প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করে শান্তি প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছিলেন। রাসূল ﷺ-এর এই শান্তিসংঘের নমুনায় আমাদের তরুণরাও নিজ নিজ এলাকায়

[১] *আর-রাহিকুল মাখতুম*

Scanned by CamScanner

ঐক্যবদ্ধভাবে সামাজিক অন্যায় অসংগতির বিরুদ্ধে জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে, গড়ে তুলতে পারে সামাজিক সংহতি। চালু করতে পারে নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প।

বিবাদ মীমাংসায় পদক্ষেপ গ্রহণ : যুবক বয়সে রাসূল ﷺ মক্কার প্রভাবশালী গোত্রগুলোর মধ্যে আসন্ন যুদ্ধকে ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন। প্রজ্ঞাপূর্ণ পথ উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিশ্চিত করেছিলেন শান্তিপূর্ণ সমাধান। সংকটের সূচনা হয়েছিল পবিত্র কাবাগৃহে হাজরে আসওয়াদ স্থাপনকে কেন্দ্র করে। কাবা সংস্কারের জন্য জান্নাতি পাথর হাজরে আসওয়াদকে যথাস্থান থেকে নামানো হয়। সংস্কারের পর এই পাথর যথাস্থানে বসানোকে কেন্দ্র করে শুরু হয় নতুন সংকট। প্রত্যেক গোত্রই মনে করল—এই পবিত্র পাথরকে আমরাই স্থাপন করব। কারণ, আমরাই এই বিরল সম্মান লাভের অধিক যোগ্য! সমস্যা এতটাই প্রকট আকার ধারণ করল যে, প্রায় যুদ্ধ বেধে যায় যায় অবস্থা! পরিশেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো—পরদিন প্রথম যে মসজিদুল হারামে আসবে, তার দেওয়া মীমাংসাই মেনে নেবে সবাই।

আশ্চর্যজনকভাবে পরদিন সকালে মসজিদুল হারামে এলেন বিশ্বনবি মুহাম্মাদ ﷺ। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁকেই বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব দেওয়া হলো। যুবক মুহাম্মাদ ﷺ সিদ্ধান্ত দিলেন—একটি চাদরে পাথরটি রেখে সকল গোত্রপ্রধান চাদরের চার কোনায় ধরবে এবং সকলে মিলে পাথরটি যথাস্থানে নিয়ে যাবে। রাসূল ﷺ-এর বিচক্ষণতায় সকলেই সন্তুষ্ট হলো। একটি অনিবার্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে বেঁচে গেল সবাই। এভাবে রাসূল ﷺ তাঁর কৈশোর ও তারুণ্য কাটিয়েছেন আত্মগঠন ও সমাজ পরিশুদ্ধির মহান ব্রতে।

তারুণ্যের যথাযথ ব্যবহার

রাসূল ﷺ ছিলেন একজন চৌকশ ট্যালেন্ট হান্টার। কার কী প্রতিভা আছে এবং কাকে দিয়ে কোন কাজ হবে—সেটা তিনি খুব ভালো করেই বুঝতেন। যে সাহাবি যে কাজে দক্ষ ছিলেন, তাঁকে ওই কাজের মাধ্যমে ইসলামের সেবা করতে উৎসাহ প্রদান করতেন তিনি। যখনই প্রতিভাবান কাউকে দেখেছেন, তার প্রতিভা ইসলামের জন্য কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। উদাহরণস্বরূপ মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর কথাই ধরা যাক। নবিজি তাঁকে প্রশাসনিক কাজে ইয়েমেনের গভর্নর করে পাঠিয়েছেন।

Scanned by CamScanner

হাসসান বিন সাবিত (রা.)-এর কাব্য প্রতিভাকে কাজে লাগিয়েছেন মুশরিকদের মানসিকভাবে প্রতিহত করতে। এ ছাড়া আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-কে ব্যাবসার জন্য উৎসাহ দান করেছেন। আবার আবু মুসা আল আশআরি (রা.)-কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ভাসিয়েছেন তাঁর সুমধুর কণ্ঠের জন্য। এভাবে যাকে দিয়ে যে কাজ হবে, তাকে সে কাজেই যুক্ত করেছেন তিনি।

অষ্টম হিজরিতে হুনাইন যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে বিলাল (রা.)-এর আজান শুনে কয়েকজন অমুসলিম কিশোর আজানকে ব্যঙ্গ করে বিকৃত স্বরে আজান দিচ্ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আজান নিয়ে ঠাট্টা করা। কিন্তু রাসূল ﷺ খেয়াল করে দেখলেন—কিশোরদের একজনের কণ্ঠ অসাধারণ শ্রুতিমধুর। তিনি বললেন—'সবাইকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো।' তারপর যে ছেলেটি সুমধুর কণ্ঠে আজানকে ব্যঙ্গ করছিল, তাকে রাসূল ﷺ বললেন—'তুমি আজান দাও।' সে বলল—'আমি তো আজানের সবগুলো বাক্য জানি না।' তখন রাসূল ﷺ নিজেই তাকে আজানের সবগুলো বাক্য শিক্ষা দিলেন। সেই কিশোর বালকটির নাম ছিল আবু মাহজুরা আল জামহি (রা.), যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁকে পবিত্র কাবা ঘরের মুয়াজ্জিন হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন রাসূল ﷺ। যিনি আজান নিয়ে ব্যঙ্গ করলেন, তিনিই কিনা হয়ে গেলেন ইসলামের শ্রেষ্ঠ মসজিদের মুয়াজ্জিন! শুধু তিনি নিজে নন, তাঁর ছেলে এবং নাতিও ধারাবাহিকভাবে মসজিদুল হারামের মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পালন করেন। এভাবেই রাসূল ﷺ মেধা ও তারুণ্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করেছেন।

রাসূলের হাতে গড়া সেরা তরুণ

রাসূল ﷺ তাঁর ২৩ বছরের নবুয়তি মিশনে এমন কিছু তরুণকে গড়ে তুলেছিলেন, যারা পরবর্তী সময়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে হয়েছিলেন জগদ্‌বিখ্যাত। একটি সোনালি সভ্যতা বিনির্মাণ এবং জ্ঞানজগতের পুরোধা হিসেবে তাঁরা অমর হয়ে থাকবেন চিরকাল। কেননা, তাঁদের হাত ধরেই পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল ইসলামের সুমহান বার্তা। এবারে এমনই কিছু দীপ্তিময় তরুণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে নেওয়া যাক—

আলি ইবনে আবু তালিব (রা.) : পিতা আবু তালিবের মৃত্যুর পর কিশোর বয়স থেকেই নবিজির সাথে সাথে থাকতেন আলি (রা.)। নবিজীবনের

Scanned by CamScanner

অকৃত্রিম স্নেহ ও সান্নিধ্য খুব কাছ থেকে উপভোগ করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। হাতেকলমে রপ্ত করেছিলেন ঐশী আলোয় জীবনযাপনের পদ্ধতি, সমরকৌশল ও অসাধারণ নেতৃত্বগুণ।

একবার কিশোর আলি (রা.) দেখলেন—রাসূল ﷺ নিজ গৃহে উম্মুল মুমিনিন খাদিজা (রা.)সহ সালাত আদায় করছেন। নতুন পদ্ধতির এই প্রার্থনা দেখে অবাক বনে গেলেন তিনি। গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন নবিজির দিকে। সালাত শেষ হতেই কৌতূহল মনে বিশ্বনবির নিকট জানতে চাইলেন নতুন এই ইবাদতের রহস্য। নবিজি তাঁর কৌতূহল উপশম করলেন; দাওয়াত দিলেন এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে। তাঁকে বোঝালেন, আল্লাহর প্রেরিত বার্তাবাহককে স্বীকৃতিদান এবং আখিরাতের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের মধ্যেই রয়েছে ইহ ও পরকালীন কল্যাণ। অতঃপর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও প্রশ্ন ছাড়াই আলি (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী তরুণ হিসেবে। আর এখান থেকেই শুরু হলো তাঁর সত্যের পথে গৌরবময় যাত্রা।

তারুণ্যের উত্তাল বয়সে রাসূল ﷺ-এর প্রতি যে গভীর ভালোবাসার নজির তিনি স্থাপন করেছেন, তা জগতে বিরল। হিজরতের পূর্বক্ষণে মক্কার মুশরিকরা 'দারুন-নাদওয়ার' গোপন বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিল—আজ রাতেই হত্যা করা হবে মুহাম্মাদ ﷺ-কে। এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ রাসূল ﷺ-কে জানিয়ে রাতেই মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। সন্ধ্যা নামতেই ঘাতকরা বিশ্বনবির ঘর ঘেরাও করল। আর অপেক্ষা করতে থাকল প্রত্যুষের। ভোরবেলায় দেখা গেল বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে একজন। কিন্তু মুখের ওপর থেকে চাদর সরাতেই অবাক হয়ে গেল ঘাতকদল। সেখানে যে মুহাম্মাদ ﷺ নেই; তাঁর জায়গায় নিশ্চিন্তে শুয়ে আছেন আলি (রা.)!

রাসূল ﷺ-এর প্রতি কত গভীর ভালোবাসা থাকলে নিজেকে এভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিপতিত করা যায়! ঘাতকরা যদি চাদর না সরিয়ে নবিজি ভেবে সরাসরি আঘাত বসিয়ে দিত, তাহলে মৃত্যু ছিল তাঁর জন্য অবধারিত। সেই অনিবার্য পরিণতিকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েই রাসূলের ভালোবাসায় নিশ্চিন্তে শুয়ে ছিলেন সাহসী তরুণ আলি (রা.)। তাঁর এই গভীর ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দিয়ে নবিজি বলেছিলেন—'হে আলি! তোমার সাথে আমার ভ্রাতৃত্বের

Scanned by CamScanner

বন্ধন শুধু ইহজগতে নয়; বরং পরজগতেও বিস্তৃত!' রাসূল ﷺ-এর সাথে আলি (রা.) সখ্যতার নজির এই উক্তি থেকেই অনুমান করা যায়। রাসূল ﷺ বলেন—'যে আমার বন্ধু, সে আলিরও বন্ধু। আর যে আলির বন্ধু, সে আমারও বন্ধু।'

আপন হতে গড়া এই তরুণের হাতেই বিশ্বনবি তুলে দিয়েছিলেন নিজের প্রিয় কন্যা ফাতিমা (রা.)-কে। সেই বিয়েতে মহর হিসেবে যে বর্মটি কন্যাকে দেওয়া হয়েছিল, সেটিও ছিল আলি (রা.)-কে দেওয়া রাসূল ﷺ-এর উপহার। এভাবেই নবিজি স্বয়ং আলি (রা.)-কে সার্বিক দিক থেকে পূর্ণতা দিয়ে একজন যোগ্য রাহবার হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। আলি (রা.)-কে বিশ্বনবি নিজের পরিবারের সদস্য বলে ঘোষণা দিতেন। নবিজি তাঁকে কতটা ভালোবাসতেন এবং গুরুত্ব দিতেন, তা এই হাদিস থেকেই অনুমান করা যায়—

> 'মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.) সাদ (রা.)-কে আমির বানানোর পর বললেন—আপনি আলি (রা.)-কে কেন মন্দ বলেন না? সাদ (রা.) জবাব দিলেন—রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সম্পর্কে যে তিনটি কথা বলেছেন, তা স্মরণ করে আমি কখনো তাঁকে মন্দ বলব না। ওই কথাগুলোর মধ্য হতে যদি একটিও আমি লাভ করতে পারতাম, তাহলে সেটি হতো আমার জন্য লাল উটের চেয়েও অধিক পছন্দনীয় (সাদ (রা.) সেই তিনটি কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন)—
>
> ১. রাসূল ﷺ কোনো এক যুদ্ধের সময় আলি (রা.)-কে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে মদিনায় রেখে গেলে তিনি বললেন—"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে মহিলা ও শিশুদের মাঝে রেখে যাচ্ছেন?" রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন—"তুমি কি এতে আনন্দবোধ করো না যে, আমার কাছে তোমার মর্যাদা তেমন, মুসা (আ.)-এর কাছে হারুন (আ.)-এর মর্যাদা যেমন। তবে আমার পর আর কোনো নবি নেই।"
>
> ২. খায়বারের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি—"আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দেবো, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালোবাসেন।" এ কথা শুনে আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম।

Scanned by CamScanner

তখন তিনি বললেন—"আলিকে ডাকো।" আলি (রা.) এলেন, তাঁর চোখ উঠেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ চোখে লালা মাখিয়ে পতাকা তুলে দিলেন তাঁর হাতে। পরিশেষে তাঁর হাতেই বিজয়ের গৌরব দান করেছিলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা।

৩. আর যখন (মুবাহালাসংক্রান্ত) আয়াত—"আমরা আমাদের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে ডাকি" অবতীর্ণ হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলি, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রা.)-কে ডাকলেন। অতঃপর বললেন—"হে আল্লাহ! এরাই আমার পরিবার।"' (মুসলিম : ২৪০৪)

মদিনায় হিজরতের কয়েক বছরের ব্যবধানে আলি (রা.)-ই হয়ে উঠেছিলেন ইসলাম ও রাসূল ﷺ-এর অন্যতম প্রধান মুখপাত্র। যেকোনো রাষ্ট্রীয় চুক্তি সম্পাদনের জন্য তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ-এর প্রধান সচিব। বিদায় হজের সময় ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বও পালন করেছিলেন তিনি।

বদর, উহুদ, খন্দক ও খায়বারসহ ইসলামের প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি অপরিহার্য সামরিক কর্তা হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন রণাঙ্গনের সম্মুখ লড়াইয়ে অন্যতম প্রধান অবলম্বন। গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে অসাধারণ বীরত্বের জন্য রাসূল ﷺ তাঁকে আসাদুল্লাহ (আল্লাহর সিংহ) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। ছোটো-বড়ো মিলিয়ে প্রায় ৮৩টি সশস্ত্র যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিলেন রাসূল ﷺ-এর হাতে গড়া এই সমরনায়ক।

বিচারের ক্ষেত্রেও আলি (রা.) ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ এবং অসামান্য প্রজ্ঞার অধিকারী। নবম হিজরি সনে তাবুক অভিযানকালে রাসূল ﷺ তাঁর হাতেই মদিনার দায়িত্বভার ন্যস্ত করে রোমানদের মোকাবিলায় যাত্রা করেছিলেন। নবিজির ওফাতের পর আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে তিনি রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা বা পরামর্শক হিসেবে ভূমিকা রাখেন। তৃতীয় খলিফা উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের পর মুসলিম জাহানের অত্যন্ত নাজুক ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বগুণেই মুসলিম সমাজে উদ্ভূত বিশৃঙ্খল পরিবেশ একটি যৌক্তিক সমাধানের দিকে যাত্রা করে। এ ছাড়াও অসামান্য দক্ষতায় খারেজিদের মতো চরমপন্থি গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিলেন তিনি।

Scanned by CamScanner

জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জগতেও তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। ইসলামের সূচনাকাল থেকেই রাসূলের সার্বক্ষণিক সাহচর্যে থাকার দরুন কুরআনের প্রায় সমস্ত আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তিনি চাক্ষুষ জ্ঞান রাখতেন। পরবর্তী সময়ে দায়িত্ব পালন করেছেন আল কুরআনের অন্যতম সংকলক হিসেবে। রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন প্রায় ৫৮৬টি মূল্যবান হাদিস। আরবি ভাষা ও সাহিত্যেও অগাধ দখল ছিল তাঁর। *দিওয়ান-ই-আলি* নামক জগৎখ্যাত কাব্য সংকলন তাঁর পাণ্ডিত্য ও কাব্য প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পৃথিবীতে ইসলাম যতদিন থাকবে, চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় ততদিন জাজ্বল্যমান থাকবে আলি (রা.)-এর অবদান।

জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) : রাসূল ﷺ-এর হাতে গড়া তরুণ শিক্ষাবিদের নাম জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)। সময়টা তখন দ্বিতীয় হিজরির রমজান মাস। আরব উপদ্বীপে বেজে উঠেছে বদর যুদ্ধের দামামা। মাত্র ১৩ বছরের কিশোর জায়েদ (রা.) মুসলিম সেনাবাহিনীতে অংশ নেওয়ার অনুমতি চাইলেন নবিজির কাছে, কিন্তু নবিজি তাঁকে অনুমতি দিলেন না। কারণ, একদিকে জায়েদ (রা.) বয়সে অপরিণত, অন্যদিকে তাঁকে নিয়ে ছিল নবিজির ভিন্ন পরিকল্পনা। বিশ্বনবি দেখলেন—জ্ঞানের প্রতি এক গভীর তৃষ্ণা আছে জায়েদ (রা.)-এর। এই প্রখর মেধাবী কিশোরকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য বিশ্বনবি তাঁকে ভাষা শিক্ষার পরামর্শ দিয়ে বললেন—'জায়েদ, তুমি হিব্রু ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করো।'

নবিজির এই পরামর্শে জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) ভীষণ উজ্জীবিত হলেন, আত্মনিয়োগ করলেন হিব্রু ভাষা শিক্ষার কঠোর মেহনতে। অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে তিনি প্রাচীন সিরিয়ার এই ভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করলেন এবং কাজ শুরু করলেন মদিনার রাষ্ট্রপ্রধান মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যক্তিগত সচিব ও দোভাষী হিসেবে। এই ঘটনা জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) নিজেই বর্ণনা করেছেন এভাবে—

> 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইহুদিদের লেখা (ভাষা) শেখার আদেশ দিলেন। আমি তদনুযায়ী ইহুদিদের লেখা শিখলাম। তিনি বললেন—"আল্লাহর শপথ! ইহুদিরা আমার পক্ষ থেকে সঠিক লিখবে বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।" বর্ণনাকারী বলেন—১৫ দিন যেতে না যেতেই আমি তাদের লেখা আয়ত্ত করে ফেললাম।

Scanned by CamScanner

> তিনি চিঠিপত্র লেখানোর ইচ্ছা করলে আমি লিখে দিতাম এবং তাঁর নিকট চিঠিপত্র এলে আমিই তা তাঁকে পড়ে শোনাতাম।' (আবু দাউদ : ৩৬৪৫)

পরবর্তী সময়ে প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলে এই তরুণের হাতেই অর্পিত হয় মহাগ্রন্থ আল কুরআন সংকলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ, স্পর্শকাতর ও বিশাল প্রকল্পের গুরুভার। কুরআনের ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানে তাঁর এতটাই দখল ছিল যে, স্বয়ং বিশ্বনবি তাঁর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পরে জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-ই ছিলেন কুরআন সংকলনের মতো সুবিশাল প্রকল্প পরিচালনার অধিক যোগ্যতর ব্যক্তি। এই দায়িত্ব তিনি পরিপূর্ণ সফলতার সাথে সমাপ্ত করেন। আজ পর্যন্ত কুরআনের যত কপি মানুষ স্পর্শ করে, তার মধ্যে মিশে আছে রাসূল ﷺ-এর হাতে গড়া এই তরুণ স্কলারের সাধনার ছোঁয়া।

জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর ঘটনার মাধ্যমে আমরা রাসূল ﷺ-এর জনশক্তি বাছাইয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা পাই। তিনি জায়েদ (রা.)-এর দক্ষতা ও আগ্রহকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে তাঁকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিয়োজিত করেছিলেন। এটাই ছিল জায়েদ (রা.)-এর সফলতার অন্যতম বড়ো কারণ। নবিজি যদি জায়েদ (রা.)-কে সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করতেন, হয়তো তিনি ততটা সফল হতেন না, যতটা সফল হয়েছিলেন ভাষা ও জ্ঞানের জগতে।

নবিজির এই কর্মনীতি থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদেরও তরুণ প্রজন্মের ব্যাপারে ঢালাও বিবেচনা থেকে ফিরে আসতে হবে। সবাইকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা বিসিএস ক্যাডার বানানোর যে গণপ্রতিযোগিতা আমাদের সমাজে চলমান, তার যথাযথ সমাধান হতে পারে বিশ্বনবির এই কর্মনীতি। সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে তরুণদের শ্রেণিবিভাগ করতে হবে তাদের বিশেষত্ব ও মেধার ধরন অনুযায়ী। যারা যেই অঙ্গনে দক্ষ, সেখানেই কাজে লাগাতে হবে তাদের।

মুসআব ইবনে উমাইর (রা.) : রাসূল ﷺ তরুণদের ওপর আস্থা রাখতেন; মদিনার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করতেন তাদের। যোগ্য তরুণদের কাঁধে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণে কখনোই ইতস্ততবোধ করতেন না তিনি। স্বয়ং রাসূল ﷺ দায়িত্বের ব্যাপারে তাদের ওপর আস্থা

Scanned by CamScanner

রেখেছেন, এই বিষয়টি তরুণদের মনে বিশেষ সম্মান ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করত। মুসআব ইবনে উমাইর (রা.) ছিলেন এর অনন্য দৃষ্টান্ত।

নবুয়তের দ্বাদশ বছরের হজের মৌসুম। ইয়াসরিব থেকে আগত ১২ জনকে রাসূল ﷺ আকাবা নামক স্থানে শপথবাক্য পাঠ করালেন। শপথের পর ইয়াসরিবের নওমুসলিমদের হাতেকলমে ইসলামি তারবিয়াত-মুআমালাত ও নিয়মকানুন শিক্ষাদান এবং ইসলাম প্রচারের জন্য রাসূল ﷺ একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই অ্যাম্বাসেডর ছিলেন তরুণ সাহাবি মুসআব ইবনে উমাইর (রা.)।

মুসআব (রা.) ছিলেন মক্কার ধনাঢ্য পরিবারের আদরের দুলাল। অতিশয় শান-শওকতের মধ্য দিয়ে তিনি বড়ো হয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি মক্কার কোনো রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে মানুষ তাঁর দিকে না তাকিয়েও বলতে পারত—মুসআব যাচ্ছে। কারণ, যে উন্নতমানের সুগন্ধি তিনি ব্যবহার করতেন, তা মক্কার দ্বিতীয় কোনো লোক ব্যবহার করত না। এতটাই সৌন্দর্য সচেতন, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও সুভাষী তরুণ ছিলেন মুসআব ইবনে উমাইর (রা.)।

ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁর মা তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে বেধড়ক মেরেছিলেন। বলেছিলেন—'যদি মুহাম্মাদকে ত্যাগ না করো, তাহলে ধনসম্পদ, বাড়ি, বাগান—সবকিছু থেকে বঞ্চিত হবে তুমি।' মুসআব (রা.) জবাব দিয়েছিলেন—'যদি আমাকে সমস্ত কিছু থেকেও বঞ্চিত করা হয়, তবুও আমি ইসলাম ত্যাগ করব না।' এ কথা শুনে মুসআব (রা.)-এর মা মুসআব (রা.)-কে ঘরে শেকলবন্দি করে রাখেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আটকে রাখতে পারেননি তাঁকে। শেকল ছিন্ন করে মুসআব (রা.) বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যান এবং রাসূল ﷺ-এর অনুমতিক্রমে হাবশায় হিজরত করেন। রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসার সামনে প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন কুরবানি দিয়ে কবুল করেন অতি সাধারণ আটপৌরে জীবন।

আকাবার প্রথম শপথের সময় চারপাশে আবু বকর, উমর ও আলি (রা.)-এর মতো অনেক অভিজ্ঞ ও জ্যেষ্ঠ সাহাবি থাকলেও মদিনার মানুষদের দ্বীন শিক্ষার জন্য মুসআবকেই কেন নির্বাচন করেছিলেন রাসূল ﷺ?

কারণ তিনি জানতেন, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য মুসআব (রা.)-ই অধিক যোগ্য। মদিনার জনসাধারণ ছিল নিজ নিজ গোত্রপতিদের দ্বারা দারুণভাবে

Scanned by CamScanner

প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। গোত্রপতিদের প্রতি তারা এতটাই অনুগত ছিল যে, তাদের কথায় বছরকে বছর যুদ্ধ-বিবাদে লিপ্ত থাকত অন্য গোত্রের সঙ্গে। গোত্রপতিরা যে মতের অনুসারী হতো, জনসাধারণও ধাবিত হতো সেই দিকে। আবার সেখানকার গোত্রনেতারা ছিল অভিজাত জীবনাচারে অভ্যস্ত। তাই ইয়াসরিববাসীকে দ্বীনের পথে আহ্বানের জন্য এমন একজনকে দরকার ছিল, যে গোত্রপতি জীবনাচারের সাথে মানানসই পদ্ধতিতে দ্বীনকে উপস্থাপন করার সক্ষমতা রাখে।

সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান হওয়ায় অভিজাত রীতি সম্পর্কে মুসআব (রা.) ছিলেন অভিজ্ঞ। মদিনার নেতৃত্বস্থানীয়রা আলাপচারিতার যে ধরনকে আদর্শ মান বলে মনে করত, মুসআব (রা.) পারিবারিকভাবেই অভ্যস্ত ছিলেন তাতে। তাই খুব সহজেই ইয়াসরিবের গোত্রপতিদের সামনে তাদের উপযোগী করে দ্বীন উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। মদিনার আউস গোত্রের প্রভাবশালী নেতা সাদ ইবনে মুয়াজকে তিনি বলেছিলেন—'যদি আমাদের কথা আপনার পছন্দ হয়, তবে গ্রহণ করবেন। আর যদি অপছন্দ হয়, তবে কথা দিচ্ছি—আপনার সামনে অপছন্দনীয় কথা বলে আপনাকে বিরক্ত করব না।'

মুসআব (রা.)-এর এমন কথায় মুয়াজ ভাবলেন, ঠিকই তো বলছে লোকটা। সুতরাং তিনি মুসআব (রা.)-এর নিকট বসলেন এবং কুরআনের অমিয় বাণী শুনে যারপরনাই মুগ্ধ হলেন। এরপরই তিনি নিজেকে শামিল করলেন ইসলামের ছায়াতলে। গোত্রপতি সাদ ইবনে মুয়াজ (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনে মাত্র এক দিনের ব্যবধানে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করল তাঁর পুরো গোত্র।

এভাবেই নবিজির জনশক্তি নির্বাচন পদ্ধতিকে আবারও সফল বলে প্রমাণিত করেছিলেন মুসআব ইবনে উমাইর (রা.)। তাঁর অসাধারণ কর্মকৌশলে মদিনার মাটি এতটাই উর্বর হলো যে, সেখানকার প্রায় প্রতিটি গোত্রের অধিকাংশ সদস্য ইসলাম গ্রহণ করে নিল মাত্র এক বছরের ব্যবধানে। নবুয়তের ত্রয়োদশ বছরে মক্কা যখন মুসলিমদের জন্য বিপদসংকুল হয়ে পড়ল, তখন মুসআব (রা.) বিকল্প নিরাপদ ভূমি হিসেবে ইয়াসরিবকে উপস্থাপন করলেন। সেখানেই হিজরত করে নবোদ্যমে দ্বীন কায়েমের পবিত্র কাজ শুরু করলেন বিশ্বনবি ﷺ। মুসআব (রা.)-এর হাতে গড়া ভূমি থেকেই সূচিত হলো ইসলামি সোনালি সভ্যতার প্রায়োগিক অধ্যায়।

Scanned by CamScanner

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) : রাসূল ﷺ-এর হাতে গড়া আরেক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)। শৈশব থেকেই তিনি নবিজির সংস্পর্শে থাকতে পছন্দ করতেন। জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতেন নবিজির পাশে পাশে থেকে। জ্ঞানের প্রতি তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা দেখে নবিজিও তাঁকে বিভিন্ন বিষয় হাতেকলমে শিক্ষা দিতেন, আল্লাহর নিকট দুআ করতেন—দয়াময় রব যেন তাঁর জ্ঞানকে আরও বাড়িয়ে দেন।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই আবদুল্লাহ (রা.)-কে এক টুকরো কাপড়ে মুড়িয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসা হয়। নবিজি আবদুল্লাহ (রা.)-কে কোলে নিয়ে নিজের মুখের একটু লালা তাঁর মুখে লাগিয়ে তাহনিক করান।[১০] এভাবেই আবদুল্লাহ (রা.)-এর দুনিয়াবি জীবন শুরু হয়েছিল নবিজির পবিত্র মুখের বরকত লাভের মধ্য দিয়ে। অনেক মনীষী মনে করেন, এর মাধ্যমেই নবিজির কাছ থেকে হিকমত ও জ্ঞান লাভ করেছিলেন তিনি।

পারিবারিক সম্পর্কের দিক থেকে আবদুল্লাহ (রা.) ছিলেন রাসূল ﷺ-এর আপন চাচাতো ভাই এবং বড়ো শ্যালিকার পুত্র। নবিজির চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.) তাঁর শ্যালিকার সাথে ভাতিজাকে বিবাহ দিয়েছিলেন। সেদিক থেকে নবিজির স্ত্রী মাইমুনা বিনতে হারিস (রা.) ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আপন খালা। শৈশবে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মাঝেমধ্যেই খালার বাসায় থাকতেন এবং রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে রাতের ইবাদত সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষা নিতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) নিজেই বর্ণনা করেন—

> 'একদিন আমি আমার খালা মাইমুনা বিনতে হারিসের ঘরে রাত্রিযাপন করছিলাম। আমি বালিশের প্রস্থের দিক দিয়ে শয়ন করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পরিবার সেটির দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে শয়ন করলেন। রাসূল ﷺ রাতের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত ঘুমালেন। এরপর তিনি জাগ্রত হলেন এবং চেহারা থেকে ঘুমের আবেশ দূর করলেন। এরপর সূরা আলে ইমরানের (শেষ) ১০ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর একটি ঝুলন্ত মশকের নিকট গিয়ে অজু করলেন।

[১০] মুসলিম : ১৩৪, বুখারি : ২৪৭৭

Scanned by CamScanner

> এরপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর মতোই করলাম এবং তাঁর (বাম) পাশে দাঁড়ালাম। তিনি তাঁর ডান হাত আমার মাথার ওপর রাখলেন এবং আমার কান ধরলেন (এবং আমাকে পেছন থেকে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন)। এরপর তিনি দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। এভাবে দুই দুই রাকাত করে আট রাকাত সালাত আদায়ের পর বিতর আদায় করলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। অবশেষে মুয়াজ্জিন তাঁর কাছে এলো। তখন তিনি দাঁড়িয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। তারপর বের হয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন।' (বুখারি : ৬৩৮)

এখানে রাসূল ﷺ ছোট্ট আবদুল্লাহকে আদরের সাথে কান টেনে শিখিয়ে দিলেন—দুজন সালাতে দাঁড়ালে মুক্তাদিকে ইমামের ডানে দাঁড়াতে হয়। একই সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)ও রাতের ইবাদত সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ও বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করলেন।

আরেক দিনের কথা। কিশোর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূল ﷺ -এর সাথে একটি বাহনে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথ চলতে চলতে নবিজি তাঁর কিশোর মনে এমন কিছু কার্যকর উপদেশ দিলেন, যা ছিল তাঁর পুরো জীবনকে সঠিক পথে অবিচল রাখার জন্য যথেষ্ট। এটি শুধু তাঁর জন্যই খাস নয়; বরং পুরো মানবজাতির জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রেও দ্বীন ও দুনিয়ার মাঝে ভারসাম্য রক্ষার মূলমন্ত্র। সেই উপদেশ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন—

> 'একদিন বাহনে চড়ে আমি নবিজির সাথে যাচ্ছিলাম। তিনি আমায় বললেন—"শোনো কিশোর, তোমায় শিক্ষণীয় কিছু কথা বলি। সর্বদা আল্লাহর নির্দেশ রক্ষা করে চলবে, তাহলে তিনিও তোমায় রক্ষা করবেন। আল্লাহর নির্দেশ পালন করবে, তাহলে তাঁকে তোমার সামনে পাবে। কিছু চাইলে কেবল আল্লাহর কাছেই চাইবে। সাহায্যের দরকার হলে কেবল আল্লাহর কাছেই চাইবে। জেনে রেখ, সমস্ত মানুষ যদি একত্রিত হয়েও তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তবে তারা ততটুকুই পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আবার সমস্ত মানুষ যদি একত্রিত হয়ে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায়,

Scanned by CamScanner

তবে তারা ততটুকুই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। (মনে রেখ, তাকদির লেখার) কলম তুলে নেওয়া হয়েছে। কাগজ শুকিয়ে গেছে।"' (তিরমিজি : ২৫১৬)

এভাবেই রাসূল ﷺ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে হাতেকলমে শিক্ষা দিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের জন্য প্রস্তুত করেছেন। একই সঙ্গে তাঁর জন্য মহান মনিবের নিকট দুআ করেছেন প্রাণ খুলে। দুআর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন—

'একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ অজু করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি দ্রুত পানির ব্যবস্থা করে দিলাম। আমার কাজে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং নামাজে দাঁড়ানোর সময় আমাকে ইঙ্গিত করলেন তাঁর পাশে দাঁড়াতে, কিন্তু আমি তাঁর পেছনেই দাঁড়ালাম। নামাজ শেষে তিনি আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন—"আবদুল্লাহ! আমার পাশে দাঁড়ানো থেকে কীসে তোমাকে বিরত রাখল?" আমি বললাম—"ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার নিকট আপনি সর্বাধিক সম্মানিত। আমি কিছুতেই নিজেকে আপনার পাশে দাঁড়ানোর উপযুক্ত বলে মনে করিনি।" এই কথা শুনে নবিজি দুআ করলেন— "আল্লাহুম্মা আতিহিল হিকমাহ—অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা দান করুন)।"'

একইভাবে আরেক রাতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূল ﷺ-কে অজুর পানি এগিয়ে দিয়েছিলেন। এতে নবিজি খুশি হয়ে তাঁর জন্য দুআ করেছিলেন—

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ-

'হে আল্লাহ! তাঁকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করুন এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পদ্ধতি শেখান।' (সহিহ ইবনে হিব্বান : ৭০৫৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই দুআকে ছোট্ট আবদুল্লাহ মনে-প্রাণে গেঁথে নিয়েছিলেন। ফলে জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাঁর স্পৃহা বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণে। পরবর্তী সময়ে কুরআনের তাফসির, ফিকাহ ও হাদিসশাস্ত্রের জন্য সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। রাসূলের দুআর বরকতে হয়েছিলেন জগৎখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন। তাফসিরশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি

Scanned by CamScanner

'রাইসুল মুফাসসিরিন' বা মুফাসসিরদের সর্দার হিসেবে খ্যাত। তিনি সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিদের মধ্যে অন্যতম। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনির মতে, তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১৬৬০টি।

খলিফা উমর (রা.)-এর শাসনামলে তিনি যুবক বয়সে উপনীত হন। এ সময় বয়সের অপরিপক্বতা সত্ত্বেও উমর (রা.) তাঁকে নিজের কাছাকাছি রাখতেন। কুরআন-হাদিসের কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে পরামর্শ নিতেন তাঁর কাছ থেকে। ইবনে আব্বাস (রা.) সম্পর্কে তিনি লোকদের বলতেন—'ইবনে আব্বাস তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিদ্বান।' তিনি আরও বলতেন—'ইবনে আব্বাস বয়সে নবীন হলেও প্রজ্ঞায় প্রবীণ!'

জ্ঞানের পাশাপাশি ইবনে আব্বাস (রা.) রাজনৈতিক বোঝাপড়াতেও ছিলেন দারুণ দূরদর্শী। তৃতীয় খলিফা উসমান (রা.)-এর যুগে মুসলিমদের আফ্রিকা অভিযানে রাষ্ট্রীয় দূত হিসেবে আফ্রিকার রাজা জারজিরের সাথে বৈঠক করেছিলেন তিনি। রাজা তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও মেধায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—'আমার মনে হচ্ছে, আপনি আরবদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি।'

চতুর্থ খলিফা আলি (রা.)-এর খিলাফতকালে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, পারস্পরিক বিবাদ নিরসন এবং চরমপন্থি খারেজিদের নিয়ন্ত্রণে তিনি প্রধান মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করেন। আলি (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে তিনি যে আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছিলেন এবং কুফার মানুষের আচরণ সম্পর্কে নবি-দৌহিত্র হুসাইন (রা.)-কে যে সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন, পরবর্তী সময়ে তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এখান থেকেই উপলব্ধি করা যায়, রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় কতটা পরিপক্ব ছিলেন জ্ঞানসম্রাট আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)।

আনাস ইবনে মালেক (রা.) : শৈশব থেকেই আনাস (রা.) নবিজির বাড়িতে খাদেম হিসেবে থাকতেন। তাঁর মা উম্মে সুলাইম (রা.) নিজের ১০ বছর বয়সি কিশোর পুত্রকে উপহার দিয়েছিলেন রাসূল ﷺ-এর সমীপে। সেই দিনের বর্ণনা দিয়ে আনাস (রা.) বলেন—

> 'মা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন—"ইয়া রাসূলুল্লাহ! আনসারদের সকল নারী-পুরুষই আপনাকে কিছু না কিছু উপহার দিয়েছে। আমার তো তেমন কিছু নেই,

Scanned by CamScanner

> এই ছেলেটি ছাড়া। ওকে আপনার খেদমতে দিলাম। ও লেখাপড়া জানে; এখনও বালেগ হয়নি। আপনি তাকে গ্রহণ করুন।' (তারিখে ইবনে আসাকির : ৩/১৪১)

তখন থেকেই নবিজির সাথে আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর পথচলা শুরু। কী ঘর কী বাইর, সব জায়গায় নবিজির খেদমতে লেগে থাকতেন তিনি। খাদেম হলেও নবিজি তাঁকে পরিবারের সদস্য বলেই গণ্য করতেন। অকৃত্রিম স্নেহে আগলে রাখতেন সব সময়। আদর করে কখনো 'বাছা' আবার কখনো-বা ডাকতেন 'উনাইস' বলে। তাঁর সাথে বাজে ব্যবহার তো দূরের কথা, সামান্য উচ্চবাচ্য করেননি কোনোদিন। এ প্রসঙ্গে আনাস (রা.) বলেন—

> 'আমি একাধারে ১০ বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত করেছি; কিন্তু কখনো তিনি আমাকে বলেননি—এটা কেন করোনি কিংবা ওটা কেন করেছ?' (বুখারি : ৬০৩৮)

নবিজি সর্বক্ষণ আনাস (রা.)-কে নিজের সান্নিধ্যে রেখে জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয় ও দ্বীনের গভীর জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। আনাস (রা.)ও গভীর মনোযোগ দিয়ে নবিজির সমস্ত কর্মকাণ্ড খেয়াল করতেন; অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন তাঁর সমস্ত উপদেশ। তিনি বলেন—

> 'আমার জন্য রাসূল ﷺ-এর প্রথম অসিয়ত ছিল—"ছেলে, তুমি আমার গোপন কথা গোপনই রেখ। তাহলে ঈমানদার হবে (অর্থাৎ, ঈমানদারির হক পূর্ণ করবে)।" এরপর থেকে কখনো আমার মা কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ আমাকে রাসূলের গোপন কথার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, কিছুই বলিনি। আমি তাঁর কোনো গোপন কথা কারও নিকট প্রকাশ করিনি।' (তারিখে ইবনে আসাকির : ৩/১৪১)

বয়ঃসন্ধিকালের বিভিন্ন সংকট ও আচরণ সম্পর্কেও নবিজি তাঁকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতেন। সচেতন করতেন জীবনের নতুন এই ধাপের করণীয় ও বর্জনীয় দিকগুলো সম্পর্কে। কৈশোর পেরিয়ে সবেমাত্র যৌবনে পা দেওয়া তরুণদের জন্য জ্যেষ্ঠদের নিকট থেকে এমন উপদেশ খুবই প্রয়োজনীয়। আনাস (রা.) বলেন—

Scanned by CamScanner

'আমি যেদিন বালেগ হলাম, রাসূল ﷺ-কে সে ব্যাপারে জানালাম। তিনি বললেন—"এখন থেকে অনুমতি ছাড়া মেয়েদের নিকট যাবে না।" সেই দিনটির মতো কঠিন দিন আমার জীবনে আর আসেনি।' (তারিখে ইবনে আসাকির : ৩/১৪৪)

কী চমৎকার বিষয়! নবিজি সদ্য যৌবনে পা দেওয়া বালককে তাঁর করণীয় সম্পর্কে জানালেন, বালকও তৎক্ষণাৎ তা বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করলেন। বালক আনাস (রা.)-এর এতকালের অভ্যাসে মেয়ে-ছেলে বলে কোনো পার্থক্য ছিল না। শৈশবের আচরণ অনুযায়ী সবার ঘরেই অহরহ প্রবেশ করতেন, সবার সাথে কথা বলতেন। সবাই খুব আদরও করত তাঁকে। কিন্তু হঠাৎ মেয়েদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলার হুকুমে এতদিনের অভ্যাসে ছন্দপতন হলো তাঁর; কিন্তু আস্তে আস্তে সবই মানিয়ে নিলেন বাধ্য সন্তানের মতো।

নিজের অধীনস্থ শিশু কিংবা খাদেমকে কীভাবে স্নেহের ছায়ায় রেখে যাবতীয় অধিকার প্রদানপূর্বক একজন যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যায়, রাসূল ﷺ-এর ঘরে আনাস (রা.) ছিলেন তার যথার্থ উপমা। রাসূল ﷺ-এর হাতে গড়া এই তরুণ পরবর্তী সময়ে একজন সেরা মুহাদ্দিস, ফকিহ ও খ্যাতিমান হাদিস বর্ণনাকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলে আনাস ইবনে মালেক (রা.) বাহরাইনে 'আমিলে সাদাকা' তথা জাকাত উত্তোলন কর্মকর্তার পদে নিয়োগ পান। বসরার গভর্নর মুগিরা ইবনে শুবা (রা.)-এর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ উত্থাপিত হলে খলিফা পাঁচ সদস্যের যে তদন্ত কমিটি প্রেরণ করেন, আনাস ইবনে মালেক (রা.) ছিলেন তার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এরপর থেকেই তিনি বসরায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.)-এর শাসনামলে দায়িত্ব পান বসরার মুফতি ও বিচারক হিসেবে। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন ওই অঞ্চলের একজন সেরা শিক্ষক, মুহাদ্দিস ও ফকিহ। তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রে জ্ঞান আহরণ করতে ভিড় জমাত হাজারো শিক্ষার্থী। রাসূল ﷺ-এর দুআর বরকতে এই সাহাবি অধিক সন্তানের জনক হয়েছিলেন, লাভ করেছিলেন প্রভূত ধনসম্পদ ও দীর্ঘ হায়াত। অনেকের মতে, সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আনাস ইবনে মালেক (রা.)।

Scanned by CamScanner

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংস্পর্শে গড়ে ওঠা আরেক তরুণের নাম আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)। মক্কাতে থাকাকালীন নাবালেগ অবস্থাতেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন বাবা উমর ফারুক (রা.)-এর সাথে। এরপর সফর, অভিযান কিংবা বাড়ি; মদিনার ১০ বছর রাসূল ﷺ-এর সহবতেই কাটিয়েছেন তিনি। অন্তরে লালন করেছেন বিশ্বনবির প্রতিটি কথা ও কাজ মেনে চলার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকা সময়টুকুর কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও তিনি অন্যদের থেকে জেনে নিতেন এবং স্মৃতিতে ধরে রাখতেন।

পরবর্তী সময়ে মুসলিম জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও ইসলামি আইনবিশারদ হয়েছিলেন নবিজীবনের পরশধন্য এই তরুণ। কুরআন, হাদিস ও ফিকাহশাস্ত্রে অর্জন করেছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্য। পবিত্র কুরআনের গবেষণায় তিনি এতটাই একনিষ্ঠ ছিলেন যে, কেবল সূরা বাকারার ওপর গবেষণাতেই ব্যয় করেছিলেন ১৪টি বছর। হাদিসশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্র, প্রথম কাতারের একজন হাফেজে হাদিস। রাসূল ﷺ থেকে মোট ১৬৩০টি হাদিস তিনি বর্ণনা করে গেছেন।

ইসলামি আইনে তিনি ছিলেন মদিনার প্রখ্যাত মুফতিদের একজন। সমকালীন শ্রেষ্ঠ ইসলামি বিশেষজ্ঞরাও তাঁর নিকট বিভিন্ন আইনি বা ফিকহি সমস্যার সমাধান চাইতেন। তাঁর দেওয়া ফতোয়ার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে মালেকি মাজহাব, যা আজও আরব উপদ্বীপে সমাদৃত। ইমাম মালেক (রহ.) বলতেন—'ইবনে উমর (রা.) হলেন দ্বীনের অন্যতম ইমাম।'

শুধু জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রেই নয়; বরং অর্জিত জ্ঞান, নিজের কথা ও কাজে পূর্ণ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অনন্য। রাসূল ﷺ কোনো সফরে যেখানে বিশ্রাম নিতেন, যে গাছের নিচে বসতেন, যেখানে যা করতেন, পরবর্তী সময়ে ইবনে উমর (রা.) হুবহু তেমনটাই করতেন। তাঁকে বলা হতো 'মাজমাউল বাহরাইন' বা জ্ঞান ও আমলের দুই সমুদ্রের মধ্যে সেতুবন্ধনকারী। রাসূল ﷺ তাঁর এই স্বভাব দেখে তাঁকে বলেছিলেন—'রাজুলুস-সালেহ তথা নেককার বান্দা।' খলিফার পুত্র হওয়ার পরও কোনো রকম রাষ্ট্রীয় সুবিধা ভোগ কিংবা ক্ষমতার মোহ কখনো তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। আমৃত্যু ব্যস্ত থেকেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ বাস্তবায়নে।

Scanned by CamScanner

জায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) : জায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) ছিলেন দাসদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। আট বছর বয়সে তিনি ডাকাতদল কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়ে দাস হিসেবে বিক্রি হন। হাকিম ইবনে হিজাম তাঁকে ক্রয় করে আপন ফুফু খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.)-কে উপহার দেন। নবিজির সঙ্গে বিবাহের পর খাদিজা (রা.) নিজের বুদ্ধিমান দাস জায়েদ (রা.)-কে উপহার হিসেবে তুলে দেন বিশ্বনবির হাতে। সেই সূত্রে শৈশব থেকেই জায়েদ (রা.) নবিজির খাদেম হিসেবে তাঁর মহান সাহচর্য লাভের সুযোগ পান। নবিজিও তাঁকে আপন স্নেহের ছায়ায় গড়ে তুলতে থাকেন।

জায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-এর মা পুত্রশোকে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পুত্রের সন্ধান পেয়ে তিনি স্বামীকে পাঠালেন জায়েদ (রা.)-কে মুক্ত করতে। জায়েদ (রা.)-এর বাবা ও চাচা সুদূর ইয়েমেন থেকে মক্কায় রাসূল ﷺ-এর বাড়িতে এলেন। তাঁদের অভিপ্রায় জানতে পেরে নবিজি বিষয়টি ছেড়ে দিলেন জায়েদ (রা.)-এর ওপর। অর্থাৎ, ইচ্ছা করলে জায়েদ (রা.) নবিজির সাথে থাকবে, নইলে মুক্ত হয়ে চলে যাবে বাবার সাথে। মুক্ত হওয়ার এমন প্রস্তাব পেয়েও জায়েদ (রা.) রাসূল ﷺ-এর সাহচর্য হারাতে রাজি হলেন না; বরং নির্দ্বিধায় বললেন—'রাসূল ﷺ-কে ছেড়ে কখনো যাব না আমি। কারণ, আমি তাঁর মাঝে এমন কিছু দেখেছি, যা আর কারও মাঝেই দেখিনি।' জায়েদ (রা.)-এর এমন সিদ্ধান্তের পর রাসূল ﷺ তাঁকে মুক্ত করে আপন পুত্র বলে ঘোষণা দিলেন। পরবর্তী সময়ে দত্তক সন্তানের বিধানসংবলিত আয়াত নাজিল হলে রাসূল ﷺ বলেন—'জায়েদ আমাদের ভাই ও বন্ধু।' মক্কা থেকেই রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে থাকতেন তিনি। তায়েফের কঠিন দিনগুলোতে তিনিই ছিলেন বিশ্বনবির সফরসঙ্গী। পবিত্র কুরআনে কেবল একজন সাহাবির নাম সরাসরি উল্লেখ হয়েছে। আর তিনি হচ্ছেন—জায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)।

নবিজির একান্ত সাহচর্যে ধন্য এই কিশোর পরবর্তীকালে সেনাবাহিনীর কমান্ডার এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুপস্থিতিতে মদিনার তত্ত্বাবধায়ক হয়েছিলেন। নবিজি তাঁকে মুতার যুদ্ধে সেনাপতি নিয়োগ করেছিলেন। বীরদর্পে লড়াই করে সেই যুদ্ধে তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন।

একজন কিশোর দাসকে কীভাবে আদর, ভালোবাসা ও পরিচর্যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে রূপান্তর করা যায়, জায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-এর মাধ্যমে তা উম্মাহকে দেখিয়ে দিয়েছেন রাসূল ﷺ।

Scanned by CamScanner

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) : ইসলামের আবির্ভাবকালে কিশোর আবদুল্লাহ (রা.) কুরাইশ সর্দার উকবা ইবনে আবু মুইতের ছাগল চরাতেন। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন সকালে উঠে উকবার ছাগলের পাল নিয়ে বের হয়ে যেতেন, ফিরতেন সন্ধ্যায়। একদিন এক বিস্ময়কর ঘটনা দেখে তিনি রাসূল ﷺ-এর প্রতি আগ্রহী হন এবং রাসূল ﷺ-এর অসাধারণ মোহনীয় গুণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম কবুল করে নেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই কিশোর আবদুল্লাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সেবক হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানেই যেতেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) ছায়ার মতো অনুসরণ করেন তাঁকে।

পরবর্তী সময়ে এই ইবনে মাসউদ (রা.) একজন ছাগলের রাখাল থেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও যোগ্য প্রশাসকে পরিণত হন। তিনি ছিলেন কুরআনের সর্বোত্তম ক্বারি, কুরআনের ভাব ও অর্থ বোঝার দিক থেকে অগ্রগণ্য এবং ইসলামি আইনশাস্ত্রে অন্যতম সেরা পণ্ডিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—

> 'কুরআন যেভাবে নাজিল হয়েছে, সে রকম বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করে কেউ যদি আনন্দিত হতে চায়, সে যেন ইবনে উম্মে আবদের (ইবনে মাসউদ) মতো করে তিলাওয়াত করে।' (ইবনে মাজাহ : ১৩৮)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) নিজের ব্যাপারে বলতেন—

> 'যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, সেই আল্লাহর কসম! আল্লাহর কিতাবের এমন কোনো একটি আয়াত নাজিল হয়নি, যার সম্পর্কে আমি জানি না—তা কোথায় নাজিল হয়েছে এবং কী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।' (মুসলিম : ২৪৬৩)

জ্ঞানের জগতের বাইরে তিনি ছিলেন একজন কর্মঠ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং রণাঙ্গনের বীর মুজাহিদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর তিনিই প্রথম কাবার চত্বরে প্রকাশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করেন। আল্লাহর জমিনে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য প্রথম নির্যাতিত এবং রক্ত ঝরানো ব্যক্তি তিনিই। বদর, উহুদ, খন্দক ও খায়বারসহ বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি সাহসের সাথে লড়াই করেছেন, কঠিন সময়ে জীবনবাজি রেখে নিরাপত্তা দিয়েছেন রাসূল ﷺ-কে। জীবনের বিরাট একটা সময় রাসূল ﷺ-এর সাথে কাটানোর সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। রাসূল ﷺ-এর পরিবারের সাথেও তাঁর ছিল দারুণ সখ্যতা। এজন্য দূরবর্তী অনেক সাহাবি রাসূল ﷺ-এর পরিবারেরই একজন মনে করতেন তাঁকে।

Scanned by CamScanner

রাসূল ﷺ-এর আপন হস্তে গড়া এই তরুণ সাহাবি খলিফা উমর (রা.)-এর শাসনামলে কুফার কাজি (বিচারক) হিসেবে ১০ বছর দায়িত্ব পালন করেন। কাজির দায়িত্ব ছাড়াও তিনি বায়তুলমাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার), শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং উজিরের দায়িত্বও সফলতার সাথে পালন করেন। ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ফিকহি জ্ঞানের ধারা আলকামা, ইবরাহিম নাখায়ি, হাম্মাদ ইবনে সোলায়মান হয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং এই ফিকহি জ্ঞানের ধারাকে কেন্দ্র করেই মূলত গড়ে উঠেছে হানাফি মাজহাব।

উসামা ইবনে জায়েদ (রা.) : তরুণদের হাতে নেতৃত্বের ভার তুলে দেওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ একটি কাজ। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত তরুণ যদি হয় যথোপযুক্ত ও যোগ্য কান্ডারি, তবে তরুণ নেতৃত্বও বয়ে আনতে পারে বিস্ময়কর ফলাফল। উসামা ইবনে জায়েদ (রা.) ছিলেন তারই বাস্তব নমুনা। উসামা (রা.) ছিলেন জায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-এর পুত্র। বিশ্বনবি ﷺ এই তরুণকে নতুন সেনাপতিরূপে আবিষ্কার করেছিলেন।

বিদায় হজের পর সিরিয়া অভিযানে রাসূল ﷺ বিশাল এক বাহিনী প্রেরণ করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আবু বকর, উমর ও আলি (রা.)-এর মতো জ্যেষ্ঠ সাহাবিগণ থাকলেও রাসূল ﷺ সেনাপতির দায়িত্বভার তুলে দেন ২০ বছর বয়সি টগবগে তরুণ উসামা ইবনে জায়েদ (রা.)-এর হাতে।

এটা ছিল তরুণ উসামা (রা.)-এর প্রতি এক মহাসম্মান, তাঁর বাবা জায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-এর জন্যও সম্মান! একই সঙ্গে রাসূল ﷺ-এর এই নিয়োগ ছিল তারুণ্যের উজ্জীবন শক্তি, লক্ষ্য অর্জনে অনড় মনোভাব এবং তাদের বীরত্বের প্রতি অপরিসীম আস্থার প্রতীক। রাসূল ﷺ-এর এই নিয়োগ তরুণ প্রজন্মকে ইসলামি রাষ্ট্রের গুরুদায়িত্ব বহনে উজ্জীবিত করেছিল দারুণভাবে।

স্বাভাবিকভাবেই কিছু ব্যক্তিবর্গ এই নিয়োগে অস্বস্তিবোধ করছিলেন; কিন্তু রাসূল ﷺ নিজ সিদ্ধান্তে অনড় থেকে বললেন—

> 'হে লোকসকল! আজ তোমরা তাঁর সেনাপতিত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করছ, অবশ্য ইতঃপূর্বে তোমরা তাঁর পিতার সেনাপতিত্বের ব্যাপারেও সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর কসম!

Scanned by CamScanner

> সে (জায়েদ ইবনে হারেসা রা.) ছিল সেনাপতি হওয়ার জন্য যথাযোগ্য ব্যক্তি এবং আমার প্রিয়ভাজন। তাঁর মৃত্যুর পর উসামা ইবনে জায়েদও আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি।'
> (বুখারি : ৪২৫০)

এই ব্যাপারে সালিম (রহ.) তাঁর পিতা থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বলেছেন—

> 'তোমরা যদি তাঁর (উসামা) নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করো, তবে তোমরা তো ইতঃপূর্বে তাঁর পিতার নেতৃত্ব নিয়েও সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর শপথ! সে নেতৃত্বের যোগ্য ছিল। সে ছিল আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। এও খুব যোগ্য; এ ছাড়া সে আমার অধিক প্রিয়ও। সুতরাং আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, উসামার সাথে সুন্দর ব্যবহার করো। সে তোমাদের মধ্যে সৎকর্মশীলদের অন্যতম।' (মুসলিম : ২৪২৬)

এমনিভাবে রাসূল ﷺ-এর হাতে গড়া তরুণদের প্রত্যেকেই ছিলেন উম্মাহর একেকজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। আল্লাহভীরুতায়, বিশুদ্ধ জ্ঞান বিতরণে, বিচারকার্য পরিচালনায়, চারিত্রিক মাধুর্যতায়, বীরত্ব প্রদর্শনে, সমাজ সংস্কারে, অনুপ্রেরণায় তাঁরা তাঁদের সময়টাকে আলোকিত করে রেখেছিলেন। পথ দেখিয়েছিলেন সাহসিকতার সাথে এবং ধারা পরম্পরায় তৈরি করে গিয়েছেন পরবর্তী শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম।

তারুণ্য উঠতি বয়সের একটি উদ্দীপনার নাম। তারুণ্য মানে শক্তি, উচ্ছ্বাস ও বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে দুর্বার গতিতে সামনে ছুটে চলা। স্রোতের বিপরীতে সাঁতারে পাড়ি দেওয়াই তারুণ্যের ধর্ম। চেতনাদীপ্ত তরুণরা যখন জেগে ওঠে, তখন প্রতিবন্ধকতার সকল চড়াই-উতরাই মাড়িয়ে ছিনিয়ে আনে বিজয়ের গৌরব। বিজয়ের পুষ্পমালা তাদের পদচুম্বন করে। মাত্র ১৭ বছর বয়সের তরুণ মুহাম্মাদ বিন কাসিম ভারতবর্ষে ইসলামের পতাকা সমুন্নত করেছিলেন। তরুণ উসামা ইবনে জায়েদ (রা.) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পরাক্রমশালী রোমানদের বিরুদ্ধে। বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরে উমর (রা.)-এর পরামর্শ সভায় বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবিদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন প্রাজ্ঞ তরুণ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)। এমনিভাবে প্রত্যেক প্রজন্মে আমাদের জন্য সম্ভাবনার আলোকবর্তিকাস্বরূপ হাজির ছিলেন একদল চৌকশ মুসলিম তরুণ।

Scanned by CamScanner

একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে তরুণদেরই জেগে উঠতে হবে, পথ দেখাতে হবে জাতিকে। তারুণ্যের হাত ধরেই এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। দেশের মোট জনসংখ্যার বিশাল একটা অংশই তরুণ। এই প্রাণোচ্ছল প্রজন্ম বর্তমানে আমাদের সামাজিক সমস্যা সমাধানের এক অভিনব শক্তি। সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব এবং আন্তরিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে দেশের অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে তাদেরই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু তাদের গাইড করার দায়িত্বটা আমাদের কাঁধেই বর্তায়। আমরা যদি তাদের গড়ে তুলতে ব্যর্থ হই, তাহলে অভিশাপ হয়ে পুরো জাতির ঘাড়ে চেপে বসবে এই তারুণ্য। এক্ষেত্রে নবিদের কর্মতৎপরতা হতে পারে মুসলিম তরুণদের জন্য প্রেরণার বাতিঘর। রাসূল ﷺ স্বয়ং আমাদের দেখিয়ে গিয়েছেন—কীভাবে তারুণ্যের এই শক্তিকে কাজে লাগাতে হয়। তারুণ্য বিনির্মাণে সেই নববি কৌশলগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারি, তবে জাতীয় জীবনে আলোর ছোঁয়া লাগবেই।

Scanned by CamScanner

আল্লাহর চাদর

আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি নৈপুণ্যে ভরপুর সমগ্র পৃথিবী। কত বৈচিত্র্য তাঁর সৃজনে! একেক সৃষ্টিকে তিনি তৈরি করেছেন একেক রকম নৈপুণ্যে। কারও মধ্যে প্রাণ দিয়েছেন, আবার কাউকে রেখেছেন প্রাণহীন করে। প্রাণিকুলের মাঝেও রেখেছেন বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য। এক প্রজাতির সাথে অন্যটির পার্থক্য বিস্তর। প্রত্যেকের মাঝে এই স্বতন্ত্র স্বভাব দিয়েই তিনি সৃষ্টিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন।

সৃষ্টিকুলের মাঝে জাতিগত পার্থক্য যেমন রয়েছে, তেমনই নিজ জাতির মধ্যেও রয়েছে বহুবিধ তারতম্য। এক জাতিরই কত শত প্রজাতি, কত বর্ণ, তার ইয়ত্তা নেই। শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মধ্যেই কত বিভিন্নতা, কত ঢং, কত রং! একেক মানুষ একেক রকম। কেউ উঁচু, তো কেউ লম্বা; কেউ সাদা, কেউ আবার কালো-বাদামি বা গৌড় বর্ণের। রাজা-প্রজা, আমির-ফকির—কত বিবিধ স্তরে সজ্জিত মানবসমাজ! সৃষ্টির এই সমস্ত পার্থক্য আল্লাহ তায়ালারই দান। তিনিই আমাদের বিভিন্ন বৈচিত্র্যে সাজিয়েছেন, যেন আমরা চিনে নিতে পারি একে অন্যকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا-

Scanned by CamScanner

'হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে; পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো।'
(সূরা হুজুরাত : ১৩)

এসব সৃষ্টিগত তারতম্যের মাঝে যেন ভারসাম্য রক্ষা করতে পারি, একে পুঁজি করে যেন হেয় প্রতিপন্ন না করি অন্যকে, এজন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদের আকল বা বিবেকসম্পন্ন করে ভূষিত করেছেন সৃষ্টির সেরা জীবের মর্যাদায়। তিনি বলেন—

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-

'তিনি তোমাদের কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন, চিন্তা-ভাবনা করার মতো হৃদয় (বিবেক) দিয়েছেন—যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।' (সূরা নাহল : ৭৮)

মানুষের মধ্যে সাধারণত তারতম্য হয়ে থাকে দৈহিক আকার-আকৃতি, চলন-বলন, জাতি-বর্ণ, সম্পদ-প্রতিপত্তি, জ্ঞান-গরিমা প্রভৃতির দিক থেকে। এই তারতম্যকে যখন আল্লাহর সৃষ্টির ধরন হিসেবে গ্রহণ না করে গণ্য করা হয় শ্রেষ্ঠত্বের উপকরণ বলে, তখনই ব্যক্তির হৃদয়ে নিজের প্রতি বড়োত্ব এবং অন্যের প্রতি নীচ ধারণা তৈরি হয়। আর এই মনোভাবই মানুষকে ঠেলে দেয় অহংকারের অতল গহ্বরে।

রবের দেওয়া নিয়ামত পেয়ে অহংকারে মত্ত হওয়া এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে জাহির করা আল্লাহ তায়ালার নিকট খুবই অপছন্দনীয় ও গর্হিত একটি কাজ। কারণ, অহংকার তো তাঁরই সাজে—যিনি কারও নিকট মুখাপেক্ষী নন; বরং সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল। যাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি; বরং তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। যাঁর কোনো শুরু নেই, ধ্বংসও নেই। কিন্তু যে অন্য সত্তার দ্বারা সৃষ্ট, বাঁচার জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল, ধ্বংস যার অনিবার্য নিয়তি, বড়োত্বের বড়াই তার কী করে সাজে? অহংকার করার জন্য যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার, তা তো কেবল মহান আল্লাহরই আছে। অন্য কারও সেই সাধ্য কোথায়? সুতরাং অহমিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকারান্তরে নিজেকেই সর্বেসর্বা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঘোষণা করে; যা স্রষ্টার ভূষণ নিয়ে টানাটানির শামিল। এজন্য হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

Scanned by CamScanner

'অহংকার আমার চাদর। এই চাদর নিয়ে যে টানাটানি করে, তাকে আমি নিক্ষেপ করব জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে।'
(আবু দাউদ : ৪০৯০)

আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে কেবল তাঁরই ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন। অহংকার প্রদর্শনকে তিনি সাব্যস্ত করেছেন হুকুম অমান্য বা অবাধ্যতা হিসেবে। আর অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী অপেক্ষা অধিক অপছন্দনীয় ব্যক্তি রবের নিকট আর কে আছে!

তিনি বলেন—

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا-

'আর উপাসনা করো আল্লাহর, তাঁর সাথে শরিক করো না অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো। ভালো ব্যবহার করো নিকটাত্মীয়, এতিম-মিসকিন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক-গর্বিতজনকে পছন্দ করেন না।' (সূরা নিসা : ৩৬)

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় হতে পারেন আপনি অন্যদের চেয়ে সুন্দর, আত্মীয়দের তুলনায় বেশি সম্পত্তির মালিক, প্রতিবেশীর তুলনায় অধিক সন্তানের জনক। এই সব নিয়ামত যদি আপনাকে আল্লাহর রাহে নত করে দেয়, হৃদয়কে ভরিয়ে তোলে মালিকের শুকরিয়ায়, তাহলেই কেবল প্রতিভাত হবে প্রকৃত গোলামির নমুনা। কিন্তু এর বিপরীতে যদি আপনার ভেতরে অহমিকাবোধ প্রাধান্য পায়, অন্তরে জেগে ওঠে বড়োত্বের ভাব, তাহলে সেটি চূড়ান্ত অহংকারের আস্ফালন বই অন্য কিছুই নয়। আর দাম্ভিকতার এমন চূড়ান্ত প্রকাশ ইহ ও পরকালীন সমূহ ক্ষতিই বয়ে আনবে কেবল।

কেউ একটু খাটো হলে তাকে 'বেঁটে-বাইট্টা-গাটু' ইত্যাদি বলে তাচ্ছিল্য করা, গায়ের রং কালো হলে কাউকে 'কালটু-উগান্ডা' বলে অবজ্ঞা করা,

Scanned by CamScanner

ফকির বা পরিচ্ছন্নকর্মী গায়ে হাত দিয়েছে বলে গা ঘিনঘিন করা কিংবা কাউকে 'ছোটোলোকের বাচ্চা' বলে গালি দেওয়া ইত্যাদি আচরণ মানুষের দাম্ভিকতার ন্যক্কারজনক বহিঃপ্রকাশ। এর মাধ্যমে 'আশরাফুল মাখলুকাত' তথা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে চরমভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়। অথচ মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন ও তুচ্ছজ্ঞান করতে আল্লাহ তায়ালা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন—

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ -

> 'অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' (সূরা লোকমান : ১৮)

অহংকারের পরিচয়

আল কুরআনে অহংকার বোঝাতে مُتَكَبِّرٍ- فَخُورٍ- مُخْتَالٍ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দগুলোর মূলধাতু যে অর্থ প্রদান করে, তা হলো—অহংকার, বড়োত্ব, অহমিকা, আত্মম্ভরিতা, অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে অন্যের তুলনায় নিজেকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করাই হলো অহংকার। অহংকারের সংজ্ঞা পাওয়া যায় রাসূল ﷺ-এর মুখনিঃসৃত ভাষ্যে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি করিম ﷺ ইরশাদ করেন—

> 'সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার আছে। এক ব্যক্তি বলল—"সবাই তো পছন্দ করে, নিজের জামা ও জুতাটা ভালো হোক।" নবিজি জবাব দিলেন—"নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর; তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। আর সত্যকে উপেক্ষা করা এবং মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার নামই অহংকার।"' (মুসলিম : ৯১)

Scanned by CamScanner

রাসূল ﷺ-এর বক্তব্যের সপক্ষে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

اِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ-

'আমাদের ইলাহ তো একজন। যারা পরজীবনে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকার প্রদর্শন করেছে।' (সূরা নাহল : ২২)

অহংকারী ব্যক্তি নিজের বড়োত্বের গরিমায় এতটাই মোহাচ্ছন্ন থাকে যে, স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আদেশকেও সে তুচ্ছজ্ঞান করে। আর মহান সৃষ্টিকর্তার হুকুমের ব্যাপারে যখন কেউ বেপরোয়া হয়ে যায়, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই দুনিয়ার সবকিছু তার কাছে ক্ষুদ্রকায় বলে বিবেচিত হতে থাকে। এই জন্য অহংকারের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ হলো—মহাসত্যকে উপেক্ষা করা এবং ঈমান আনয়নে অস্বীকৃতি জানানো। আর স্বাভাবিক প্রকাশ হলো—মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা।

অহংকারীদের পরিণতি

অহংকারীদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। তারা দুনিয়াতেও শাস্তি ভোগ করবে, আখিরাতেও হবে সীমাহীন লজ্জা আর নিদারুণ আজাবের মুখোমুখি। তাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে যন্ত্রণাদায়ক আবাসস্থল!

দুনিয়াবি শাস্তি : অহংকারী লোকেরা যত প্রতাবশালী-ই হোক না কেন, শেষমেশ চূড়ান্ত পরিণতি ভোগ না করে তাদের গত্যন্তর নেই। দুনিয়া অথবা আখিরাতে, যেখানেই হোক—শাস্তি তাদের সুনিশ্চিত। তবে সব অহংকারী-ই সাধারণত দুনিয়ায় কিছু না কিছু শাস্তি ভোগ করে। ইমাম গাজালি (রহ.) বলেন—

'অহংকারী ব্যক্তি দুনিয়ায় তিন ধরনের শাস্তি ভোগ করে। প্রথমত, সে জোর করে সম্মান আদায় করতে চায় বলে মানুষ তাকে মন থেকে অসম্মান ও ঘৃণা করে। ফলে অহংকারী মানসিক অশান্তি ও অতৃপ্তিতে ভোগে। দ্বিতীয়ত, দ্বীনের হিদায়াত তার কপালে জোটে না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলেন—"যারা কোনো

Scanned by CamScanner

অধিকার ছাড়াই জমিনে অহংকার করে বেড়ায়, তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ থেকে অবশ্যই ফিরিয়ে রাখব।"[১১] তৃতীয়ত, সে বঞ্চিত হয় আল্লাহর যাবতীয় নিয়ামত থেকে।'

পরকালীন শাস্তি : কিয়ামতের দিন বড়োত্ব প্রদর্শনকারীরা ভীষণ লজ্জিত হবে। হাশরের মাঠে তাদের ওঠানো হবে অতিশয় ক্ষুদ্র পিপীলিকার আকৃতিতে। ইবনে শুয়াইব (রা.)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

> 'কিয়ামতের দিন অহংকারীদের ক্ষুদ্র পিপীলিকার আকারে ওঠানো হবে।' (তিরমিজি : ২৪৯২)

শুধু তা-ই নয়, কিয়ামতের দিন অহংকারীদের ওপর ভীষণ রেগে থাকবেন আল্লাহ তায়ালা; এমনকী তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিও দেবেন না। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'যে ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে বড়ো মনে করে এবং দম্ভভরে হাঁটে, আল্লাহর সাথে সে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, যখন আল্লাহ তার ওপর থাকবেন রাগান্বিত।'
> (মুসনাদে আহমদ : ৫৯৯৫; আদাবুল মুফরাদ : ৫৪৯)

আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনায় রাসূল ﷺ অন্যত্র আরও বলেন—

> 'তিন ব্যক্তির প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ রহমতের নজরে তাকাবেন না। তাদের পবিত্রতাও দান করবেন না। এমনকী তাদের সঙ্গে কোনো কথাও বলবেন না; বরং নিমজ্জিত করবেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে। এরা হচ্ছে—বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যুক শাসক ও দাম্ভিক ফকির।' (মুসলিম : ১০৭)

অহংকারীদের ওপর আল্লাহ এতটাই অসন্তুষ্ট হবেন যে, তাদের জাহান্নামে পাঠানো হবে কোনো হিসাব ব্যতিরেকেই। রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'কিয়ামতের দিন ছয় শ্রেণির অপরাধীকে কোনো বিচার ছাড়াই সরাসরি জাহান্নামে পাঠানো হবে। এর মধ্যে প্রথম অপরাধী হলো অহংকারী।' (জামিউল আহাদিস : ১৩০৯০)

---

[১১] সূরা আ'রাফ : ১৪৬

Scanned by CamScanner

অহংকারী ব্যক্তিরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হবে জান্নাতের দরজা। আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> 'যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' (ইবনে মাজাহ : ৫৯)

অপর বর্ণনায় এসেছে—

> 'আমি কি তোমাদের বলে দেবো—কারা জাহান্নামে যাবে? তারা হলো—অহংকারী, দাম্ভিক ও হটকারী লোক।' (বুখারি : ৪৯১৮)

অহংকারীদের আবাসস্থল হবে জাহান্নামের নিকৃষ্টতম স্থানে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ-

> '(অহংকারীদের) বলা হবে, তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করো চিরকাল অবস্থানের জন্য। কতই-না নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল!' (সূরা জুমার : ৭২)

অহংকারীদের খাবার হবে জাহান্নামিদের পিত্ত, পুঁজ ও বমি। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'অহংকারীকে অপমান-অপদস্থ সব দিক থেকে গ্রাস করে ফেলবে। তারপর তাকে জাহান্নামের মধ্যে বুলাস নামক একটি জেলখানার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে টেনে-হিঁচড়ে। জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুন চতুর্দিক থেকে তাদের গ্রাস করে ফেলবে। আর তাদের পান করতে দেওয়া হবে জাহান্নামিদের পিত্ত, বমি ও পুঁজ।' (তিরমিজি : ২৪৯২)

অহংকারের পতনের দৃষ্টান্ত

আল্লাহ যুগে যুগে অহংকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছেন এবং তাদের পতনকে বানিয়েছেন গোটা মানবজাতির জন্য নিদর্শন। আবার কুরআনে সেই সব ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে বান্দাদের সতর্ক হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

Scanned by CamScanner

পৃথিবীর ইতিহাসে যুগে যুগে যারা অহংকারের কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তাদের পরিণতি ব্যাখ্যা করে মহান আল্লাহ আমাদের সংশোধনের সুযোগ দিয়েছেন বারবার। অহংকারের কারণে অভিশপ্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি ও ব্যক্তিরা হলো—

ইবলিস : একসময়ে ইবলিস ছিল আল্লাহর পুণ্যবান বান্দাদের একজন। সেও মহান রবের তাসবিহ জপত একাগ্রচিত্তে। ইবাদতের বরকতে জাতিতে জিন হয়েও সে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ফেরেশতাদের দলে। অবিশ্বাস্য অধ্যবসায় আর ইবাদতের বরাতে সে নিজেকে এতটাই উচ্চতায় উন্নীত করেছিল যে, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং কথা বলতেন তার সাথে। আল্লাহর মহাপরিকল্পনার অনেক কিছু সম্পর্কেই সে ছিল ওয়াকিবহাল; কিন্তু একমাত্র অহংকারই তার জীবনে ডেকে আনে ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়। ফলে রাতারাতি সে হয়ে যায় বিতাড়িত শয়তান, অন্তর্ভুক্ত হয় ধিকৃত ও অভিশপ্তদের দলে।

প্রথম মানুষ আদম (আ.)-কে সৃষ্টির পর যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেন, তখনই ইবলিসের মনে তৈরি হয় তীব্র অহংকারবোধ। সে ভাবতে থাকে—আমি তো আগুনের শিখা থেকে তৈরি, আর আদম তৈরি কাদামাটি থেকে। তবুও কেন তাঁকেই শ্রেষ্ঠ করা হলো? এই দাম্ভিকতাই তাকে আল্লাহর আদেশের অবাধ্যতা করতে প্ররোচিত করে। আল্লাহ তাকে ও ফেরেশতাদের আদেশ দেন আদম (আ.)-কে সিজদা করতে, কিন্তু নিতান্ত অহংকার বশে সে প্রত্যাখ্যান করে বসে আল্লাহর নির্দেশ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সেদিন ইবলিসের অন্তরের সুপ্ত অহমিকাবোধ প্রকাশ করে দিলেন। ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে বিবৃত হয়েছে এভাবে—

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ
فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۗ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ-

'আর আমি তোমাদের (আদি পিতা আদমকে) সৃষ্টি করলাম এবং তাঁকে আকৃতি দান করলাম। অতঃপর ফেরেশতাদের বললাম, "আদমকে সিজদা করো।" সবাই সিজদা করল, শুধু ইবলিস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (সূরা আ'রাফ : ১১)

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۗ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ
مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ-

Scanned by CamScanner

'আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন—"আমি হুকুম দেওয়ার পরও কীসে তোকে সিজদা করতে বাধা দিলো?" সে জবাব দিলো—"আমি তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ, আমাকে সৃষ্টি করেছ আগুন থেকে আর তাঁকে সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে।"' (সূরা আ'রাফ : ১২)

এভাবে আল্লাহর সাথে সে যুক্তিতর্ক জুড়ে দিলো। বোঝাতে চাইল—আগুনের বৈশিষ্ট্য উর্ধ্বমুখী। আগুন জ্বালালে তার লেলিহান শিখা দাউদাউ করে ওপরে উঠতে থাকে। আর পক্ষান্তরে মাটির ধর্ম হচ্ছে নিম্নমুখী। সুতরাং উর্ধ্বমুখী কোনো জিনিস কখনো নিম্নমুখীর কাছে নত হতে পারে না। যোগ্যতা প্রমাণে সে নিজের ওপর এতটা আত্মবিশ্বাসী ছিল যে, শ্রেষ্ঠত্বে তাকে কেউ কখনো ছাড়িয়ে যেতে পারে—সেটা ছিল তার ধারণার অতীত।

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ-

'আল্লাহ বললেন—"নেমে যা এখান থেকে। এই পবিত্র জায়গায় থেকে তুই অহংকার করবি, তা হতে পারে না। বের হয়ে যা! আসলে তুই এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা নিজেরাই নিজেদের লাঞ্ছিত করতে চায়।' (সূরা আ'রাফ : ১৩)

এভাবে অহংকারে অন্ধ হয়ে অবাধ্যতার কালিমা গায়ে মেখেছিল ইবলিস। ফলে ধ্বংস হয়ে যায় তার সমস্ত ইবাদত, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব। আল্লাহ তায়ালা তাকে অভিশপ্ত বলে ঘোষণা দেন; চিরতরে বিতাড়িত করেন জান্নাত থেকে। আল্লাহর সেরা বান্দা থেকে ইবলিস হয়ে যায় চূড়ান্ত নাফরমান। শুধু দাম্ভিকতার কারণেই এত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী একজন সত্তার সকল অর্জন মুহূর্তেই ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। একসময়ের একান্ত অনুগত ইবলিস পরিণত হলো বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে অহংকারী আর নিকৃষ্ট শয়তানে।

কাবিল : মানবজাতির আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়া (আ.)-এর দুই সন্তান ছিল হাবিল ও কাবিল। একবার তারা দুজনে আল্লাহর রাহে কুরবানি করে। হাবিল ছিল মেষপালক, আর কাবিল উৎপাদন করত কৃষিজাত দ্রব্য। হাবিল তাঁর পাল হতে একটি মেষ আর কাবিল তার ভান্ডার হতে এক বস্তা গম কুরবানি করল। নেককার বান্দা হওয়ায় আল্লাহ কেবল হাবিলের কুরবানিই কবুল করেন; কাবিলের কুরবানি রয়ে যায় অগ্রহণযোগ্য।

Scanned by CamScanner

এতে ভীষণ অপমানবোধ করে কাবিল। ভাবে—এর মাধ্যমে হাবিলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো, ছোটো হয়ে গেল সে। অহংকারী এই ভাবনা থেকেই তার মনে জন্ম নেয় ভয়াবহ জিঘাংসা। প্রতিহিংসার অনলে দগ্ধ হয়ে শয়তানের কুমন্ত্রণায় সে আপন ভ্রাতা হাবিলকে হত্যা করে। নিজেকে রঞ্জিত করে পৃথিবীর প্রথম খুনের রক্তে। দুনিয়া যতদিন থাকবে, মানুষের কাছে একজন ভ্রাতৃ হত্যাকারী হিসেবে ততদিন ধিকৃত হবে সে।

আদ ও সামুদ : প্রাচীন আরবে দুটো প্রসিদ্ধ মানবগোষ্ঠীর নাম আদ ও সামুদ। তারা ছিল জাগতিক শক্তি-সামর্থ্য ও উন্নত সভ্যতার অধিকারী। বর্তমান ইয়েমেন ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছিল আদ জাতির বাস। উঁচু স্থাপনা নির্মাণের দক্ষতায় তারা ছিল অনন্য। আর সামুদ জাতি বাস করত আরবের উত্তরাংশে। তারা পাহাড় কেটে আবাসন তৈরির পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিল। খোদাই শিল্প ও পাহাড়ের প্রকোষ্ঠে কারুকাজ খচিত স্থাপত্য নির্মাণের অভিনব কৌশলও উদ্ভাবন করেছিল তারা। কিন্তু নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের অহংকারে অন্ধ হয়ে উভয় জাতিই একে একে অস্বীকার করতে থাকল আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত পয়গম্বরগণকে। তারা ভেবেছিল—শক্ত প্রাসাদ ভেদ করে কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এই ঔদ্ধত্যের কারণে আল্লাহ তায়ালা তীব্র ঠান্ডা ও ঝড়ো শৈত্যপ্রবাহ দিয়ে ধ্বংস করলেন আদ জাতিকে। আর সামুদ জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন প্রচণ্ড ভূমিকম্প আর বিকট শব্দতরঙ্গের গজব দিয়ে।

আল্লাহ তায়ালা আদ জাতি সম্পর্কে কুরআনে বলেন—

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ- فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ-

'তাদের অবস্থা ছিল এমন, পৃথিবীতে তারা অন্যায়ভাবে নিজেদের বড়ো ভেবে বসেছিল এবং বলতে শুরু করেছিল—"আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে?" তারা কি দেখে না—যে

Scanned by CamScanner

আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তারা আমার আয়াতসমূহকেই অস্বীকার করে চলল। অবশেষে আমি কতিপয় অমঙ্গলকর দিনে তাদের ওপর প্রবল ঝড়ো বাতাস পাঠালাম। যেন পার্থিব জীবনেই তাদের অপমান ও লাঞ্ছনাকর আজাবের মজা চাখাতে পারি। আখিরাতের আজাব তো এর চেয়েও অধিক অপমানকর। সেখানে কেউ তাদের সাহায্যকারী থাকবে না।' (সূরা হা-মিম সাজদাহ : ১৫-১৬)

আর সামুদ জাতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ- فَعَقَرُوا
النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ
مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ- فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ-

'ওই অহংকারীরা বলল—"তোমরা যা বিশ্বাস করো, আমরা তা অস্বীকার করি।" তারপর তারা সেই উটনীকে মেরে ফেলল, পূর্ণ দাম্ভিকতা সহকারে নিজেদের রবের হুকুম অমান্য করল এবং সালেহকে বলল—"যদি সত্যিই নবি হয়ে থাকো, তাহলে নিয়ে এসো সেই আজাব, যার হুমকি তুমি আমাদের দিয়ে থাকো।" অবশেষে একটি প্রলয়ংকর দুর্যোগ তাদের গ্রাস করল এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল।'
(সূরা আ'রাফ : ৭৬-৭৮)

ফেরাউন : মিশরের বাদশাহ ফেরাউন শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে এতটাই উন্মাদ ছিল যে, নিজেকে দাবি করে বসেছিল বিশ্বজাহানের প্রভু। এমনকী এই মিথ্যা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সে ভয়াবহ নির্যাতন চালাত মানুষের ওপর। মহান আল্লাহ তখন মুসা (আ.)-কে পাঠান তাওহিদের বার্তা দিয়ে। মুসা (আ.) আল্লাহর দিকে আহ্বান করলে চরম ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতায় প্রত্যাখ্যান করে সে। লোক ডেকে ঘোষণা দেয়—'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রভু।' এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন—

فَكَذَّبَ وَعَصٰى- ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى- فَحَشَرَ فَنَادٰى- فَقَالَ اَنَا
رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى- فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى-

Scanned by CamScanner

'কিন্তু সে (ফেরাউন) মিথ্যা মনে করে প্রত্যাখ্যান করল এবং অমান্য করল। অতঃপর সে (আল্লাহর বিরুদ্ধে) জোর প্রচেষ্টা চালানোর জন্য (সত্যের) উলটো পথে ফিরে গেল। সে সকলকে সমবেত করে জোরগলায় ঘোষণা করল—"আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড়ো রব (পালনকর্তা)।" অতঃপর আল্লাহ তাকে পরকাল ও ইহকালের শাস্তি দিলেন।' (সূরা নাজিয়াত : ২১-২৫)

ফেরাউনের এই আত্ম-অহমিকা ও দাম্ভিকতার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে সদলবলে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে মারেন। মৃত্যুর পর আল্লাহ তায়ালা তার দেহটাকে নষ্ট হতে দেননি; টিকিয়ে রেখেছেন বিশেষ কুদরতে। সকল দাম্ভিক আর অহংকারীর জন্য নিদর্শনস্বরূপ আজও তার লাশের মমি মিশরের জাতীয় জাদুঘরে রয়েল মমিস চেম্বারে সংরক্ষিত আছে।

কারুন : প্রাচুর্যের অধিকারী ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী কারুন ছিল মুসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। মুসা (আ.) ও কারুনের পিতা উভয়ই ছিল পরস্পর সহোদর ভাই। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (আ.)-এর মতে, কারুন ছিল মুসা (আ.)-এর চাচাতো ভাই। কথিত আছে, কারুনের মতো এত অধিক সম্পদ আল্লাহ দুনিয়াতে আর কাউকেই দেননি। মিশরের রাজধানী কায়রো থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ফাইউম শহরে কারুন বাস করত। তবে কোনো কোনো ইতিহাসবিদ তার আবাসস্থল হিসেবে তিহ কিংবা ইরাকের নিনওয়া অঞ্চলের কথাও উল্লেখ করেছেন। অগণিত পশুর খামার, ফুলে-ফলে সজ্জিত নান্দনিক বাগিচা, হিরা-জহরতের অঢেল প্রাচুর্য আর আকাশচুম্বী অট্টালিকার অধিকারী ছিল সে। তার সম্পদের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ-

'নিশ্চয় কারুন ছিল মুসার কওমভুক্ত। অতঃপর সে তাদের ওপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। অথচ আমি তাকে এমন ধনভান্ডার দান করেছিলাম, যার চাবিগুলো একদল শক্তিশালী লোকের ওপর

Scanned by CamScanner

ভারী হয়ে যেত। স্মরণ করো, যখন তার কওম তাকে বলল—"দম্ভ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদের ভালোবাসেন না।"' (সূরা কাসাস : ৭৬)

কারুন প্রথমদিকে তাওরাতে বিশ্বাসী একজন নিপাট ধার্মিক লোক ছিল বটে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সম্পদের লোভ আর প্রাচুর্যের অহংকার তাকে বিপথগামী করে তোলে। মুসা (আ.) আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে আহ্বান করেন—আল্লাহর পথে দান করতে, কিন্তু সে আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে দাবি তোলে আল্লাহর অনুগ্রহে নয়; বরং নিজের মেধা ও প্রচেষ্টাতেই সে সমস্ত সম্পদ অর্জন করেছে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُه عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ ۚ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِه مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْاَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ-

'এতে সে বলল—"এ সবকিছু তো আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি, তার ভিত্তিতে আমাকে দেওয়া হয়েছে।" সে কি এ কথা জানত না, আল্লাহ এর পূর্বে এমন বহু লোককে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা এর চেয়ে বেশি বাহুবল ও জনবলের অধিকারী ছিল? অপরাধীদের তো তাদের গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় না।' (সূরা কাসাস : ৭৮)

রবের অবাধ্যতা ও অহংকারের শাস্তিস্বরূপ মহান আল্লাহ তাকে মাটির নিচে ধসিয়ে দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَخَسَفْنَا بِه وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَه مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَه مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ-

'শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার ঘরকে মাটির নিচে পুঁতে ফেললাম। তখন আল্লাহর মোকাবিলায় তার সাহায্যে এগিয়ে আসার মতো সাহায্যকারী কোনো দল ছিল না এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে পারেনি।' (সূরা কাসাস : ৮১)

Scanned by CamScanner

কারুনের ধ্বংস কীভাবে হয়েছিল, এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি বর্ণনা *তাফসিরে তাবারি*তে উল্লেখ হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন—

> 'একদিন কারুন এক ব্যভিচারী নারীকে কিছু অর্থ দিলো এই শর্তে, সে জনতার সামনে প্রকাশ্যে বলবে—"হে মুসা! তুমি আমার সঙ্গে ব্যভিচার করেছ!" মুসা (আ.) ওই মহিলার ষড়যন্ত্রের কথা শুনে আঁতকে উঠলেন এবং ডেকে পাঠালেন তাকে। একপর্যায়ে ওই নারী স্বীকারোক্তি দেয়, কারুনই তাকে অর্থের বিনিময়ে মিথ্যা অপবাদ রচনায় প্ররোচিত করেছে। সব জেনে আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে গেলেন মুসা (আ.); কাঁদতে লাগলেন অঝোর ধারায়। আল্লাহ তাঁর পয়গম্বরের কাছে ওহি প্রেরণ করলেন—"ভূমিকে নির্দেশ মান্য করতে বলা হয়েছে।" মুসা (আ.) বললেন—"হে ভূমি! তাকে গ্রাস করো।" এতে কারুনের হাঁটু পর্যন্ত ধসে গেল। তিনি আবার বললেন—"হে ভূমি! গ্রাস করো তাকে!" এতে তার কোমর পর্যন্ত প্রোথিত হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন—"হে ভূমি! তাকে ধরো।" তাতে তার বুক পর্যন্ত ডেবে গেল। সে বাঁচার জন্য সাহায্য কামনা করল। মুসা (আ.) বললেন—"হে ভূমি! ধরে ফেলো তাকে।" অতঃপর সে সম্পূর্ণ তলিয়ে গেল।'

এভাবেই কারুনের প্রাচুর্যের অহংকার নিমিষেই চূর্ণ হয়ে যায়, মানবেতিহাসে সে রয়ে যায় অহংকারীদের জন্য এক নিদর্শন হয়ে।

প্রাচীন যুগের এক অহংকারী : আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ববর্তী যুগের এক অহংকারী ব্যক্তির উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন—

> **'তোমাদের পূর্বের যুগের এক লোক একটি কাপড় ও লুঙ্গি পরিধান করে এবং চুলগুলো কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে দম্ভভরে হাঁটছিল। তার পোশাকদ্বয় তাকে অহংকারের দিকে নিয়ে যায়। এরপর অকস্মাৎ আল্লাহ তাকে মাটির নিচে ধসিয়ে দেন। কিয়ামত অবধি এভাবে সে মাটির নিচে যেতেই থাকবে আর নাড়াচাড়া করতে থাকবে এদিক-সেদিক।' (মুসলিম : ৫৫৮৬)**

Scanned by CamScanner

আবু জাহেল : কুরাইশদের নেতা আবু জাহেল সারাজীবন দুশমনি করেছে বিশ্বনবির সাথে। জমিনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করেছে নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে। আত্ম-অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে সে ভাবত—আমার মতো অভিজাত নেতা থাকতে ইয়াতিম ও অসহায় এক যুবক নবি হলো কেন? মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবি হিসেবে মেনে নেওয়ার অর্থ হলো—নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে কুরবানি দিয়ে একজন ইয়াতিমের নেতৃত্বকে মেনে নেওয়া। এটা কি আবু জাহেলের আত্মমর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ! এই অহমিকার প্রভাবে বিশ্বনবির নবুয়তকে চরম অবজ্ঞার সাথে অস্বীকার করে সে। এমনকী আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হয় কয়েক দফায়। সিরাতগ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়—আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে মক্কায় সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছিল আবু জাহেল। এজন্য তার পরিণতিও হয়েছিল অত্যন্ত লজ্জাজনক। মক্কার এই প্রতাপশালী নেতা বদর যুদ্ধে ধরাশায়ী হয়েছিল আনাড়ি দুই খুদে যোদ্ধার হাতে।

যেসব কারণে মনে অহংকার আসে

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে আমাদের একেকজনকে পাঠিয়েছেন একেক নিয়ামত দিয়ে। কাউকে এক দিক থেকে বেশি অনুগ্রহ করেছেন তো আরেকজনকে সমৃদ্ধ করেছেন অন্য নিয়ামত দ্বারা। এভাবে তিনি বান্দাদের প্রতি তাঁর মহানুভবতা ও করুণার ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। আর এই অনুগ্রহসমূহের যথাযথ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই নিশ্চিত করতে হয় পরকালের চিরস্থায়ী ঠিকানা জান্নাত; কিন্তু বাহ্যিক কিছু নিয়ামতকে মানুষ অপরাপর অসংখ্য অনুগ্রহের ওপর প্রাধান্য দেয়। সেগুলোকেই মনে করে জীবনের একমাত্র সম্বল। অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে মানুষ অহংবোধে হেয় প্রতিপন্ন করে অন্যকে, যা স্পষ্টত গর্হিত কাজ। যে সমস্ত নিয়ামত ও কাজ মানুষের মনে অহংকারের প্রবেশ ঘটায়, তার মধ্যে অন্যতম হলো—

সৌন্দর্য বা রূপ-লাবণ্য : আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মানুষকে সুন্দর গঠন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন—

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ-

'অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম অবয়বে।'
(সূরা ত্বিন : ০৪)

Scanned by CamScanner

মানুষ মাত্রই সুন্দর। তথাপি কিছু মানুষ রূপ-লাবণ্যের দিক থেকে তুলনামূলক বেশি নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। আল্লাহর এই অতিরিক্ত দয়ার পরশ পেয়ে তাদের উচিত নিয়ত শোকরগোজার করা; কিন্তু তা না করে উলটো অনেকে মত্ত হয় প্রগল্‌ভ অহংকারে। এরূপ অহংকারীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন—

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا-

'মানুষের ওপর এমন কিছু সময় কি অতিবাহিত হয়নি, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না (তাহলে এত কেন তার অহংকার)?' (সূরা দাহর : ১-২)

এ প্রসঙ্গে আলি (রা.) বলেন—

'মানুষের কীসের এত অহংকার! যার শুরু এক ফোঁটা রক্তবিন্দু থেকে, আর শেষ হয় মৃত্তিকায়!'

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও সুদর্শন মানুষ ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। আয়িশা (রা.) বলেন—

'ইউসুফ (আ.)-কে দেখে আঙুল কাটা নারীরা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখত, তবে রাসূলের সৌন্দর্যে তারা আঙুল কাটতে কাটতে কবজি পর্যন্ত কেটে ফেলত!'

এত সৌন্দর্যের অধিকারী হয়েও নবিজি কখনো সৌন্দর্যের গৌরব করতেন না; বরং আয়নায় নিজের চেহারা মোবারক দেখে দুআ করতেন—

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ-

'আল্লাহ! তুমি আমার চেহারাকে যেমন সুন্দর করেছ, তেমনই আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও।' (সহিহ ইবনে হিব্বান : ৯৫৯)

দৈহিক সৌষ্ঠব বা সুন্দর অবয়ব নিয়ে অহংকার করা নিতান্তই সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক। কারণ, এতে ব্যক্তির নিজের কোনো হাত নেই। এটা একান্তই আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ। যাকে দেখে সুন্দর চেহারার লোকটি নাক সিটকায়, আল্লাহ চাইলে সেই লোকটিকেও বানাতে পারতেন তার মতো করে। তাই অন্য কারও গড়ন নিয়ে তাচ্ছিল্য করা মানে আল্লাহ

Scanned by CamScanner

তায়ালার সৃষ্টিকেই অবজ্ঞা করা। এজন্য আমাদের উচিত দৈহিক অবয়ব ও সৌন্দর্যের জন্য সব সময় আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করা।

অর্থ-সম্পদ : সম্পদের প্রাচুর্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষকে অহংকারী করে তোলে। অর্থ-বিত্তের মালিক হয়ে মানুষ ভাবে—বিস্তর জমিজমা, অভিজাত বাড়ি, বিলাসবহুল গাড়ি সবই তো হলো; এবার খানিক সামাজিক মর্যাদা না হলে চলে কী করে! ফলে সে চায় ভয়ে ও শ্রদ্ধায় সবাই তাকে সমীহ করে চলুক। এই সকল চিন্তা থেকেই তার মনে জন্ম নেয় অহংকার। একপর্যায়ে সে স্রষ্টা ও তাঁর হুকুমকেই ভুলে যায়। এমনকী কখনো কখনো অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করে রবের সার্বভৌমত্বকেই, যেমনটা করেছিল অভিশপ্ত ধনকুবের কারুন।

আমাদের সমাজে প্রায়শই একজন আরেকজনকে ফকিন্নি, ছোটোলোকের বাচ্চা, দুই টাকার লোক ইত্যাদি বলে তাচ্ছিল্য করতে দেখা যায়। তুচ্ছ ঘটনাতেও রিকশাওয়ালা, কাজের মেয়ে অথবা শ্রমিকের গায়ে হাত তুলে বসে স্রেফ গরিব বলে; এমনকী কখনো কখনো চালায় অকথ্য নির্যাতন। সম্পদের গরিমায় কেউ কেউ শত্রুকে হুমকি দেয়—'যত টাকা লাগে লাগুক, তবুও তোকে দেখে ছাড়ব!' এগুলো ভয়াবহ অহংকারের বহিঃপ্রকাশ! এই ধরনের বদগুণ আমাদের মধ্যে থাকলে উচিত এখনই তওবা করা এবং কায়মনোবাক্যে মহান রবের দরবারে ক্ষমা চাওয়া, যেন ফিরে আসতে পারি সত্য-সরল পথে। নয়তো পরকালে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই মিলবে না।

প্রভাব-প্রতিপত্তি : প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও উচ্চ পদমর্যাদা মানুষের মনে অহংকার উৎপত্তির আরেকটি কারণ। বিশ্ব ইতিহাসে অনেক ক্ষমতাধর ব্যক্তি ও জাতি অহংকারের কারণে অস্বীকার করেছে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রভুত্বকে। আবু জাহেল, ফেরাউন, নমরুদ, সাদ্দাদ ও আদ-সামুদ জাতি তার নিকৃষ্টতম উদাহরণ। আমাদের সমাজেও তাদের বহু উত্তরসূরি দেখা যায়। ক্ষমতার দাপটে অন্ধ হয়ে তারা তুচ্ছ করে চলে আল্লাহর বিধান। মানুষের হক মেরে খায়, জবরদখল করে অন্যের জমি, নিরীহ লোকদের উৎখাত করে ভিটা থেকে; চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজিসহ শত নির্যাতনে অতিষ্ঠ করে তোলে চারপাশ। এরা মজুদদারি কারবার করে বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে। সিন্ডিকেটের মাধ্যমে জিম্মি করে

Scanned by CamScanner

ফেলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন। দেশকে দুর্নীতির আঁতুড়ঘর বানিয়ে এরা পাড়ি জমায় ভিনদেশে, স্বার্থের মোহে উলটে দেয় বিচারের রায়। অপরাধীকে মুক্তি দিয়ে নিরপরাধ মানুষের ওপর জারি করে শাস্তির ফরমান। তারা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয় অবলীলায়। ভাবে—তাদের ঠেকানোর মতো কেউ নেই। অথচ আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে বলেন—

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ-

'আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের বাড়াবাড়ির জন্য তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করতেন, তাহলে ভূপৃষ্ঠে একটি জীবকেও ছাড়তেন না; কিন্তু তিনি সবাইকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন। তারপর যখন সেই সময়টি এসে যায়, তখন এক মুহূর্তও আগপিছ হতে পারে না।' (সূরা নাহল : ৬১)

কিয়ামতের দিন তারা বলবে—

مَآ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ- هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ-

'আজ আমার অর্থ-সম্পদ কোনো কাজে এলো না। আমার সব ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিনাশ হয়েছে।' (সূরা হাক্কাহ : ২৮-২৯)

সেদিন জাহান্নামই হবে তাদের শেষ ঠিকানা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ-

'(অহংকারীদের) বলা হবে, জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। তোমাদের চিরকাল এখানেই থাকতে হবে। অহংকারীদের জন্য এটা অত্যন্ত জঘন্য ঠিকানা।' (সূরা জুমার : ৭১)

বিশেষ যোগ্যতা : প্রত্যেক মানুষই পৃথক পৃথক কিছু বিশেষ গুণের অধিকারী হয়ে থাকে। যেমন : কেউ ভালো লিখতে পারে, কেউ-বা পারে ভালো বলতে।

Scanned by CamScanner

কারও গানের গলা ভালো তো কারও আঁকার হাত অসাধারণ। রাসূল ﷺ-এর সাথিরাও ছিলেন প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন গুণের অধিকারী।

জ্ঞানের দিক দিয়ে এগিয়ে ছিলেন আলি, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আয়িশা ও উম্মে সালামা (রা.)-এর মতো সাহাবিগণ। আবার হাদিসের জ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন আবু হুরায়রা, আনাস ইবনে মালিক, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আবু সাইদ খুদরি (রা.)। ভাষাগত জ্ঞানে এগিয়ে ছিলেন জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)। আবু বকর, উমর, উসমান, আলি, মুয়াবিয়া, আমর ইবনুল আস, মুআজ ইবনে জাবাল (রা.) প্রমুখ সাহাবিগণ ছিলেন নেতৃত্বগুণে অনন্য। কাব্য রচনায় অসাধারণ ছিলেন হাসসান বিন সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ, কাব ইবনে মালিক ও খুবাইব (রা.)। হাসসান বিন সাবিত (রা.) মসজিদে নববির মিম্বারে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করতেন চমৎকার সব কবিতা। জাফর ইবনে আবু তালিব বক্তৃতা দিতেন জাদুময়ী শব্দমালায়। সাহাবিদের মধ্যে ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও দুজানা (রা.)-এর মতো দিগ্‌বিজয়ী সাহসী বীর এবং সাদ ইবনে ওয়াক্কাস (রা.)-এর মতো দুর্ধর্ষ সমরনায়ক।

এমন বিশেষ গুণের অধিকারী হয়েও সাহাবিগণ কখনো অহংকার পোষণ করেননি; বরং আল্লাহ প্রদত্ত এ সকল অনুগ্রহের জন্য বিনয়াবনত চিত্তে বারংবার লুটিয়ে পড়েছেন শুকরিয়ার সিজদায়। আমাদেরও উচিত তাঁদের অনুসরণে নিজের বিশেষ গুণের জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় প্রণত হওয়া এবং নিজের যোগ্যতাকে আল্লাহর দ্বীন ও মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা।

সফলতা : জীবনের কাঙ্ক্ষিত সফলতা অনেককেই অহংকারী করে তোলে। এই সাফল্য হতে পারে বিভিন্ন ধরনের। যেমন—ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ, পরীক্ষায় ভালো ফলাফল, ব্যবসায় সমৃদ্ধি, নতুন বাড়ি-গাড়ি কিংবা জমি ক্রয়; এর যেকোনো একটিই কারও মনে অহংকার জাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট।

সফলতা অর্জনের সাথে সাথেই অনেকে ভাবেন—আমাকে আর ঠেকায় কে! এত কষ্ট করে সাফল্য পেয়েছি, এখন আর কাউকে হিসাব করার সময় কোথায়! অনেকে তো অবজ্ঞার স্বরে বলে—'তুমি মিয়া জীবনে করছটা কী? সফলতা ক্যামনে অর্জন করতে হয়, আমারে দেখ।' ভালো চাকরি বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেলে অনেকেই অকতকার্য সহপাঠীদের খোঁচা

Scanned by CamScanner

দিয়ে বলে—'দুঃখ করিস না, সবাই কি আর এসব পায়!' এমন কথা বলার মাধ্যমে তারা মূলত অপরের কষ্ট বাড়িয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে চায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেই অনেকে কথায় কথায় চড়াও হয় রিকশাওয়ালা কিংবা বাস-কন্ডাক্টরদের ওপর। এভাবে অহংকার যেন আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। নারী তার সৌন্দর্যের অহংকারে বিভোর, ধনীরা তাদের ধনের গৌরবে দিশাহারা, আলিমগণ অতিশয় উচ্ছ্বসিত নিজেদের ইলম নিয়ে। দলনেতা অহংকার করেন তাদের অনুসারী দল নিয়ে, রাষ্ট্রনেতা করেন শক্তি ও ক্ষমতার বড়াই। অথচ এ সবকিছুই একদিন ধুলোয় মিশে যাবে।

কেউ কেউ তো নিজের ইবাদত নিয়েও প্রগল্‌ভ অহংকারে মশগুল। হজ করে আসার পর কেউ 'হাজি সাহেব' কিংবা নামের শুরুতে 'আলহাজ' না লাগালে প্রচণ্ড রেগে যান। কোনো কোনো আলিম নাখোশ হন নামের আগে 'শাইখ', 'আল্লামা' বা 'হজরত' না যুক্ত করলে। কেউ-বা কুরবানির সময় এলেই মেতে উঠে সব থেকে বড়ো পশু কুরবানি দেওয়ার উন্মত্ত প্রতিযোগিতায়। অথচ এ সকল বাহ্যিক দেখনদারি ঘৃণ্য শয়তানি ছাড়া কিছুই নয়। ইসলামে এর ন্যূনতম স্থান নেই।

নিজেকে নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকা : নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকার অভ্যাস মানুষকে ধীরে ধীরে স্বার্থপর ও আত্মমগ্ন করে দেয়। ব্যক্তি তখন নিজের গুণকে সেরা ভেবে প্রবল আত্মমর্যাদায় ভুগতে থাকে সর্বক্ষণ। এই অতিমাত্রায় আত্মগৌরবই তাকে নিমজ্জিত করে অহংকারের অতল গহ্বরে। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'মানুষ যখন কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তখন একপর্যায়ে তাকে দাম্ভিকের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়। তারপর দাম্ভিকের প্রাপ্ত শাস্তি সে ভোগ করে।' (সুনানে তিরমিজি : ২১৩১)

অহংকার থেকে বাঁচার উপায়

অহংকার ঈমানের জন্য দুরারোগ্য ক্যান্সারস্বরূপ। যে অন্তরে অহংকার বাসা বাঁধে, সে অন্তর আস্তে আস্তে ঈমানশূন্য হয়ে যায়। কেননা, দাম্ভিক হৃদয়ে ঈমানের সৌন্দর্য ও সৌরভ শোভা পায় না। ফলে অহংকারী ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে ধাবিত হয় চূড়ান্ত নাফরমানির দিকে। প্রকাশ্য শত্রু শয়তান এজন্যই আমাদের মনে অহংকারের বিষবাষ্প প্রবেশ করার জন্য বদ্ধপরিকর।

Scanned by CamScanner

কারণ, এর মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয় তার পরিকল্পনা, পূরণ হয় আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করার দুরভিসন্ধি।

অহংকারের বিষাক্ত ছোবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য ওই সকল আচরণ ও উচ্চারণ থেকে আমাদের বেঁচে থাকা জরুরি, যেগুলো অন্তরে বড়োত্বের অনুভূতি তৈরি করে। আমাদের উচিত হবে নিজেদের এমন সব কাজে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত রাখা, যেগুলো অহংকারের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখবে কার্যকর ঢাল হিসেবে। এ রকম কিছু কাজের দৃষ্টান্ত—

আল্লাহর ভয় : আল্লাহর ভয় মন থেকে যাবতীয় পঙ্কিলতা দূরীভূত করে। আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হলো—তাঁর শাস্তির আতঙ্ক এবং সন্তুষ্টির আশায় নিষিদ্ধ ঘোষিত কাজ থেকে দূরে থাকা, জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে তাঁর নির্দেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা। অহংকার আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত একটি কাজ। সুতরাং আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা ও অমান্য করে অহংকারে পতিত হওয়া নিশ্চিতভাবেই গর্হিত অপরাধ, সুস্পষ্ট কবিরা গুনাহ। রবের ভয়কে হৃদয়ে ধারণ করে প্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরলেই কেবল এই অহংকারের পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা সম্ভব। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

'তাই যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করে চলো। শোনো, আনুগত্য করো এবং নিজেদের সম্পদ ব্যয় করো। এটা তোমাদের জন্যই ভালো। যে মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থাকল, সেই সফলতা লাভ করবে।' (সূরা তাগাবুন : ১৬)

মৃত্যুর ভয় : মৃত্যুর অমোঘ বাস্তবতা স্মরণের মাধ্যমে মানুষ তার চূড়ান্ত অসহায়ত্বকে উপলব্ধি করতে পারে। মানুষ তখন চোখের সামনে নিজের প্রকৃত অবস্থা ও সীমাবদ্ধতা দেখতে পায়, ভুলে যায় সমস্ত দম্ভ। এভাবে সর্বক্ষণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকলে অহংকারসহ যেকোনো পাপ থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয়। কেননা, বিবেক তখন বলে—'আজ বাদে কাল তো তুমি নিথর লাশ মাত্র।'

আমাদের অন্তরে নিরন্তর মৃত্যুচিন্তা জারি রাখা উচিত। মানুষ জন্মের সময় ছিল নিতান্ত দুর্বল ও অসহায়। মৃত্যুর পরও সে তেমনই নিঃসঙ্গ ও স্থবির

Scanned by CamScanner

লাশে পরিণত হবে। অধিক মৃত্যুর স্মরণ এ বিষয়টি আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয়।

মানুষের মাথার ওপর সর্বক্ষণ ঝুলছে এক অনিবার্য ও অনিশ্চিত মৃত্যুর পরোয়ানা। হুকুম হওয়ামাত্র যেকোনো মুহূর্তে মালাকুল মওত ছুটে আসবে তার প্রাণবায়ু ছিনিয়ে নিতে। নির্ধারিত সময়ের আগে কিংবা পরে এক ন্যানো সেকেন্ড সময় তাকে দেওয়া হবে না। প্রাণহীন দেহটা মাটিতে পড়ে থাকবে পোকামাকড়ের খাবার হওয়ার অপেক্ষায়। মৃত্যুর কথা এভাবে চিন্তা করলে কারও মনে অহংকার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব।

নিজেকে তুচ্ছজ্ঞান করা : নিজেকে ছোটো ভাবা, নিজের তুলনায় অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া এবং বিনয়ী হওয়া মুমিন জীবনের অন্যতম গুণ। নিজেকে মহান আল্লাহর একজন ক্ষুদ্র অনুগত দাস ভাবলেই হৃদয় হবে বিনীত, দুচোখ সিক্ত হবে অনুতাপের অশ্রুধারায়, বিচূর্ণ হয়ে যাবে যাবতীয় অহংকার। এজন্য বিনয়ের পূর্ণতা প্রতিভাত হয়, এমন লোককে মহান আল্লাহ ভালোবাসেন সব থেকে বেশি। রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ সমগ্র জীবনজুড়ে বিনয় ও নম্রতার অনুশীলন জারি রেখেছেন। অহংকার প্রকাশ পায়—এমন কোনো কাজ থেকে তাঁরা ছিলেন সর্বোচ্চ মাত্রায় সতর্ক। বিশ্বমানবতার জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, হিদায়াত ও মুক্তির দিশারি মুহাম্মাদ ﷺ নিজেও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন এই বলে—

> 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ধৈর্যশীল বানাও, শোকরগোজারকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো, নিজের চোখে আমাকে ছোটো বানাও আর মানুষের চোখে বানাও বড়ো।'

আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'আল্লাহর রাসূল ﷺ কখনো ঠেস দিয়ে বসে খাবার খাননি। তিনি বলতেন—"আমি এমনভাবে আহার করি, যেভাবে গোলাম করে থাকে। এমনভাবে বসি, যেমনিভাবে গোলাম বসে।"'
>
> (মাজমাউজ জাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদ : ১৪২১০)

ছোটোখাটো কাজ করা : সমাজে হেয় চোখে দেখা হয়, এমন প্রয়োজনীয় ছোটোখাটো গৃহস্থালি কর্ম ব্যক্তির অহমিকা দমন করে। এতে মনের কোনে জমে থাকা শ্রেষ্ঠভাব গলে যায়। হতে পারে সেটি বকরি চরানো,

Scanned by CamScanner

জুতা সেলাই করা কিংবা ঘর-দুয়ার ও ব্যক্তিগত টয়লেট পরিষ্কার করা। তামাম জাহানের নবি, সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর অনন্য মর্যাদার অধিকারী হয়েও এসব কাজে অংশগ্রহণ করতে কখনো দ্বিধাবোধ করেননি। ওরওয়া (রহ.) বলেন—

> 'এক ব্যক্তি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন—"রাসূলুল্লাহ কি ঘরে কাজ করতেন?" তিনি বললেন—"হ্যাঁ। জুতায় কালি লাগাতেন, কাপড় সেলাই করতেন; তোমাদের মধ্যে কেউ ঘরে যেমন কাজ করে থাকে।"' (মুসনাদে আহমদ : ২৫৩৪১)

অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আম্মাজান আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো—

> 'রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে অবস্থানকালে কী করতেন?' জবাবে তিনি বলেন—'রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন একজন মানুষ। পোশাকের মধ্যে তিনি উকুন তালাশ করতেন, ছাগলের দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই সম্পন্ন করতেন।'
> (মুসনাদে আহমদ : ২৬১৯৪)

মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী অধ্যয়ন : পৃথিবীর সমস্ত মহৎ ব্যক্তি ছিলেন নিরহংকারী, বিনয়ী, ধৈর্যশীল ও কঠোর পরিশ্রমী। তাঁরা কীভাবে অহংকারমুক্ত থেকে জীবনে সফলতা লাভ করেছিলেন, তা জানার মাধ্যমেও আমরা অহংকার থেকে বাঁচার পদ্ধতি শিখে নিতে পারি। আর এজন্য প্রয়োজন তাঁদের জীবনী অধ্যয়ন। হোক তিনি নবি-রাসূল, সাহাবি-তাবেয়ি, ওলি-সাধক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক কিংবা সুফি। তাঁদের জীবনী থেকে মণি-মুক্তা কুড়িয়ে নিতে পারলেই আমরা শামিল হতে পারব সফল ও নেককার বান্দাদের কাতারে।

শ্রেষ্ঠ মানুষদের বিনয় ও নম্রতা

অহংকারমুক্ত ব্যক্তি সমাজের অন্যান্য লোকদের গুরুত্ব দিতে জানে, জানে সম্মান করতে। সে নিজেকে তুচ্ছ ভেবে অন্যদের প্রাধান্য দেয়। ফলে মানুষও তাকে ভালোবাসে এবং সম্মান করে সব থেকে বেশি। এমন ব্যক্তি থাকে মহান আল্লাহ তায়ালার রহমতের চাদর দ্বারা পরিবেষ্টিত। পৃথিবীর ইতিহাসে যারাই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, প্রত্যেকেই ছিলেন অহংকারমুক্ত, বিনয়ী। ফলে তারা শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে মানুষের নিকট সমাদৃত হয়েছেন যুগে যুগে।

Scanned by CamScanner

রাসূল ﷺ-এর বিনয় : রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন বিনয়ের উজ্জ্বলতম নিদর্শন। শিশু বয়স থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্র ও মার্জিত স্বভাবের। অহংকারের কালিমা কখনোই স্পর্শ করতে পারেনি তাঁকে। স্বয়ং মহান আল্লাহ তাঁর চরিত্র সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন—

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ -

'নিশ্চয়ই তুমি সুমহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।' (সূরা কালাম : ৪)

বিশ্বনবি ও রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও তিনি অতি সাধারণ পোশাক পরতেন, ঘুমোতেন খেজুরের চাটাই বিছিয়ে, এড়িয়ে চলতেন অভিজাত আসন। রাসূল ﷺ-এর খাদেম আনাস ইবনে মালেক (রহ.) বলেন—

> 'রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি পুরোনো আসনে বসে হজ পালন করেন। তাঁর আসনের ওপর একটি কাপড় ছিল, যার মূল্য ছিল চার দিরহামেরও কম। অতঃপর তিনি বললেন—"হে আল্লাহ! তুমি এ হজকে লৌকিকতা ও প্রচার বিলাসিতা হতে মুক্ত করো।"'

নবিজি সর্বদা হাসিমুখে কথা বলতেন, মানুষকে সালাম দিতেন সবার আগে। রাস্তায় চলার সময় মাথা নিচু করে হাঁটতেন। কাপড় পরতেন টাখনুর ওপর, যেন কোনোভাবে অহংকারত্ব প্রকাশিত না হয়ে পড়ে। নিজের সম্পর্কে যাবতীয় বাড়াবাড়িই অপছন্দ করতেন তিনি। বলতেন—

> 'তোমরা আমার সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করো না, যেমনিভাবে খ্রিষ্টানরা ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে থাকে। আমি আল্লাহর বান্দা। তাই আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূলই বলো।' (বুখারি : ৩৪৪৫)

এমনকী তাঁর সম্মানে কারও দাঁড়িয়ে যাওয়াকেও তিনি পছন্দ করতেন না মোটেই। কারণ, এতে মনে বড়োত্ব ভাব জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন—

> 'সাহাবিগণের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে প্রিয় কোনো ব্যক্তি পৃথিবীতে ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে দাঁড়াতেন না। কারণ, তাঁরা জানতেন—তাঁকে দেখে দাঁড়ানোকে তিনি অপছন্দ করেন।' (তিরমিজি : ২৭৫৪)

Scanned by CamScanner

মহানবি ﷺ ছিলেন মদিনার রাষ্ট্রপ্রধান। অথচ কেউ তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলে কোনো ধরনের প্রটোকল ছাড়াই হাজির হতেন তিনি। সকলকে সাক্ষাৎ দিতেন, সকলের কথা শুনতেন মনোযোগ ও সম্মানের সাথে; প্রয়োজনে নিতেন যথাযোগ্য ব্যবস্থা। একবার এক লোক তাঁর কাছে এসে ভয়ে কাঁপতে লাগল; এমনকী তার ঘাড়ের রগ স্পন্দিত হচ্ছিল তখন। রাসূল ﷺ তার এই দুরবস্থা দেখে অভয় দিয়ে বললেন—

> 'তুমি শান্ত হও! আমি তো কোনো প্রতাপশালী বাদশাহ নই; বরং আমি এমন এক নারীর সন্তান, যার আহার ছিল শুকনো গোশত।' (ইবনে মাজাহ : ৩৩১২)

রাসূল ﷺ-এর দরবারে আগত সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সাথে তিনি কেমন আচরণ করেতন, সে ব্যাপারে হুসাইন (রা.) এক দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেছেন—

> 'রাসূল ﷺ উপস্থিত সকলেরই কথা শুনতেন। সকলেই মনে করত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকেই বেশি মর্যাদা দিচ্ছেন। তাঁর কাছে কেউ এলে, সে নিজে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত নবিজি উঠতেন না। কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। না থাকলে নম্রভাবে বুঝিয়ে বলতেন। সকলেই তাঁর নিকট সমান মর্যাদা পেতেন। তবে একে অন্যের ওপর মর্যাদাসম্পন্ন হতেন কেবল তাকওয়ার বিচারে। নবিজি সকলের সঙ্গে বিনম্র ব্যবহার করতেন। বড়োকে শ্রদ্ধা আর ছোটোকে করতেন স্নেহ।'

সমাজপতি হওয়ায় লোকজন চাইত, রাসূল ﷺ তাদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করুক। মানুষের এই সাধারণ আবেগ ও ভালোবাসাকে তিনি কখনোই অবজ্ঞার চোখে দেখেননি। গরিব-ধনী সকলের বাড়িতেই তিনি দাওয়াত নিতেন, অতি সাধারণ খাবার হলেও কাউকে ফেরাতেন না। ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন—

> 'আওয়ালি গ্রামের কোনো ব্যক্তিও যদি অর্ধরাত্রিতে রাসূল ﷺ-কে জবের রুটি খাওয়ার দাওয়াত দিতেন, তাহলেও তিনি সে দাওয়াত গ্রহণ করতেন।'
> (আল মুজামুস সগির লিত তাবরানি : ৪১)

Scanned by CamScanner

অধস্তনদের সাথে কখনো কর্তৃত্বমূলক আচরণ করতেন না তিনি। তাদের সাথে মিশতেন সহকর্মী ও বন্ধুর মতোই সাবলীল ভঙ্গিতে। মালিকসুলভ আধিপত্য নিয়ে কখনো বলেননি—'এটা কেন করেছ, ওটা কেন করোনি?' রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একনিষ্ঠ খাদেম, তরুণ সাহাবি আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন—

> 'আমি ১০ বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত করেছি। তিনি একবারের জন্যও কখনো আমাকে ধমক দেননি। কোনো কাজ করে ফেললে বলেননি—"তুমি এ কাজ কেন করলে!" কোনো কাজ না করলে বলেননি—"তুমি এটা কেন করলে না?"'
> (বুখারি : ৬০৩৮)

খোলাফায়ে রাশেদিনের বিনয় : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যোগ্য সাহাবিগণ ছিলেন বিনয় ও নম্রতার অন্যতম উৎকৃষ্ট উদাহরণ। খোলাফায়ে রাশেদিনের বিনয়াবনত জিন্দেগির দিকে তাকালেই তা পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

আবু বকর (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত সহচর এবং মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন—

> 'আমার উম্মাহর মধ্যে আবু বকর সবচেয়ে রহম দিল ও বিনয়ী।'
> (ইবনে মাজাহ : ১৫৪)

লোকেরা ছোটোখাটো কাজের জন্যও তাঁর কাছে চলে আসত। আর তিনি বিয়নয়াবনত চিত্তে সেসব কাজ করে দিতেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন—

> 'পাড়ার মেয়েরা বকরির দুধ দোহন করানোর জন্য আবু বকর (রা.)-এর নিকট আসত। তিনি বলতেন—"আচ্ছা! ইবনে আকরার ন্যায় দোহন করে দিলে তোমরা খুশি তো?"'

খলিফা হওয়ার পর পাড়ার মেয়েরা বলতে শুরু করল—'এবার তো তিনি খলিফা হয়েছেন। এখন আর কেউ আমাদের বকরির দুধ দোহন করে দেবে না।' এ কথা শুনে আবু বকর (রা.) বলেন—'আমার জিন্দেগির কসম! অবশ্যই আমি দুধ দোহন করে দেবো। আশা করি, খিলাফতের কাজে নিযুক্ত হওয়ার পর আমার চরিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না।'

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.)-এর চরিত্রও ছিল অনুরূপ। কতটা নিরহংকারী হলে অর্ধ পৃথিবীর শাসক খেজুর পাতার ছাউনিতে বসবাস করতে পারেন! কতটা বিনম্র হলে ক্ষুধার্ত প্রজার জন্য নিজের ঘাড়ে খাদ্যের বোঝা বহন করতে পারেন আমিরুল মুমিনিন। তিনি তো সেই উমর, কৃতদাসকে উটে চড়িয়ে যে উটের রশি ধরে হেঁটেছিল উত্তপ্ত মরুর বুকে! জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম চমৎকারভাবে বলেছেন—

'ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি
মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী।'

তৃতীয় খলিফা উসমান (রা.) একটা চাদর জড়িয়ে মসজিদের মেঝেতে ঘুমিয়ে পড়তেন; অথচ একদিন তাঁর প্রাচুর্যের কারণেই আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন 'গনি'। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর বায়তুলমাল থেকে কোনো বেতন নিতেন না তিনি। তাঁর নিজের সম্পদই এতটা যথেষ্ট ছিল যে, আলাদা করে কোনো অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নেওয়ার প্রয়োজনই পড়েনি কখনো। তবে মানুষের দেওয়া উপহার তিনি সানন্দে গ্রহণ করতেন; যেমনটা করতেন বিশ্বনবি ﷺ। এভাবে প্রভূত ধন-সম্পদের মালিক হয়েও নিরহংকার ও সাদামাটা জীবনযাপন করেছেন উসমান (রা.)।

চতুর্থ খলিফা আলি (রা.) ছিলেন অনন্য প্রজ্ঞার অধিকারী। অথচ বিনয়ের কমতি ছিল না তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে। তিনি উটের জন্য নিজ হাতে ঘাস কাটতেন এবং বিক্রি করতেন। বিনয় সম্পর্কে তিনি বলেন—

'তিনটি জিনিস বিনয়ের মূল। যথা :

১. দেখা হলে সালাম দেওয়া
২. মজলিশের উঁচু জায়গার পরিবর্তে নিচু জায়গায় সন্তুষ্ট থাকা এবং
৩. রিয়া ও সুনামকে অপছন্দ করা।'

নবি নন্দিনী, খাতুনে জান্নাত ফাতিমা (রা.) নিজ হাতে জাঁতা পিষে শস্যদানা ভাঙতেন, আর তা বাজারে বিক্রি করতেন আলি (রা.)।

এমনই ছিল পৃথিবীর সেরা প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ মানুষদের বিনয়। অহংকারকে তাঁরা এক মুহূর্তের জন্যও ঠাঁই দেননি মনে। সদা সতর্ক থাকতেন অহমিকা ও দাম্ভিকতার ব্যাপারে। আর এই বিনয়ই তাঁদের পৌঁছে দিয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায়,

Scanned by CamScanner

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন স্বর্ণ খচিত অক্ষরমালায়। মহান আল্লাহ বলেন—

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا-

'তারাই দয়াময়ের প্রিয় বান্দা, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে। আর যখন মূর্খরা তাদের সাথে তর্ক করে, তারা বলে সালাম।' (সূরা ফুরকান : ৬৩)

অহংকার পতনের প্রধান কারণ। এটি এমন এক রোগ—ভালো কোনো গুণই যার কারণে ব্যক্তির মধ্যে আর অক্ষত থাকতে পারে না। ফলে জেনে-বুঝে সত্য গ্রহণে গড়িমসি করতে থাকে মানুষ। অনেক সময় প্রত্যাখ্যান করে বসে মহাসত্য আল কুরআনকেই। দুনিয়ার ইতিহাসে শীর্ষ অহংকারী হলো ইবলিস। পৃথিবীর সকল অহংকারীদের সর্দার সে। অপরপক্ষে নিরহংকারী ও বিনয়ীদের নেতৃত্বে রয়েছেন নবি-রাসূলগণ। তাই কাকে আমরা আমির বানাচ্ছি, সেটা গভীর বিবেচনার দাবি রাখে। আর এটি চিরন্তন সত্য যে, দাম্ভিকদের শেষ পরিণতি মোটেও শুভ হয় না। অথচ বিনয়ী মানুষকে সবাই মন থেকে ভালোবাসে। সুতরাং আল্লাহ ও মানুষের ভালোবাসা পেতে হলে অহংবোধ বর্জন করে বিনয়ী হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। যে আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর মর্যাদাকে উচ্চকিত করেন। এটাই আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা।

ইসলাম সব সময় আমাদের উদার, বিনয়ী আর ভদ্র হওয়ার শিক্ষা দেয়। ইসলামের উদার সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের কারণেই সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশীয় সাহাবি আবু বকর, উমর, উসমান ও আলি (রা.)-এর পায়ে পা লাগিয়ে সালাতে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন আবিসিনিয়ার বিলাল হাবশি, রোমের সুহাইব রুমি, পারস্যের সালমান ফারসি (রা.)-এর মতো ক্রীতদাস সাহাবিগণ। এজন্য নামাজের কাতারে দাঁড়িয়ে আমরাও বেমালুম ভুলে যাই নিজেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত অবস্থানের কথা। বড়োত্ব আর অহংকার ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিজেকে শামিল করি এক আল্লাহর গোলামদের কাতারে। এটাই তো ইসলামের অমিয় শিক্ষা।

Scanned by CamScanner

ইসলাম শেখায়—বড়োত্ব আর অহংকার শুধু একজনের জন্যই প্রযোজ্য। তিনি হচ্ছেন মহীয়ান গরীয়ান অসীম ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ; যিনি অমুখাপেক্ষী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁর কোনো ঘাটতি, কমতি বা চাহিদা নেই, নেই কোনো দুর্বলতা। তাই রূপকার্থে অহংকারকে তিনি ঘোষণা করেছেন নিজের চাদর বলে। সুতরাং কে আছে এমন—যে মহান আল্লাহর চাদর ধরে টান দেওয়ার স্পর্ধা দেখায়? এত দুঃসাহস কার বুকে—যে কেড়ে নেবে একচ্ছত্র প্রভুর ভূষণ?

Scanned by CamScanner

সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানারস

আজকের দুনিয়ায় অন্যতম আশীর্বাদ এবং একই সাথে সবচেয়ে বড়ো অভিশাপের নাম সোশ্যাল মিডিয়া। বিগত কয়েক বছরে এটি অনলাইন যোগাযোগ ও তথ্য আদান-প্রদানের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ভার্চুয়াল জগৎকে যদি একটি দেশ হিসেবে কল্পনা করা হয়, তাহলে পৃথিবীর বৃহত্তম ও জনবহুল দেশটি হবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম।

সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। বলতে গেলে, তথ্য দুনিয়ার ধারণাই বদলে দিয়েছে এই মাধ্যমটি। একটি ম্যাসেজ এক ক্লিকে হাজারো মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, নাড়িয়ে দিচ্ছে লাখো বনি আদমের চিন্তাজগৎ। ফেসবুকের একটি পোস্ট, একটি টুইট কিংবা একটি স্ন্যাপ ইথারের ডানায় ভর করে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বময়; যার নেই কোনো সীমানা কিংবা কাঁটাতারের বেড়া। প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য, উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণ গোলার্ধ; গোটা দুনিয়ার সকল মানুষকে এটি এক মোহনায় এনে মিলিয়েছে। এই বিস্ময়কর অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আন্তঃসংযোগ পাসপোর্টকে গৌণ করে দিয়েছে, বেমালুম গায়েব করে দিয়েছে সীমানাপ্রাচীর।

সময়ের এই সবচেয়ে বড়ো বৈপ্লবিক বদলটি ঘটেছে সকলের অজান্তেই। কিন্তু আজ থেকে ২০ বছর পূর্বেও চিত্রটা এমন ছিল না। তখন সমাজের উচ্চাসনে বসে থাকা মানুষগুলোই কেবল কথা বলার মঞ্চ পেত। বাকি সবাই ছিল তাদের বাধ্যগত শ্রোতা। সোশ্যাল মিডিয়া এসে এই বিভাজন

Scanned by CamScanner

মাটির সাথে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। দুনিয়ার সকলকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে অভিন্ন মঞ্চে। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে দারোয়ান; প্রত্যেকেই এখন তার নিজস্ব মত ও চিন্তা প্রকাশ করার সুযোগ পাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব সম্ভবত এখানেই।

আবার এর উলটো দিক নির্ণয় করতে গেলে একেবারেই মুষড়ে পড়তে বাধ্য হবেন। অতীতে অপরাধ করতে ঘরের বাইরে যেতে হতো। আর জনপরিসরে অপকর্ম করাও কোনো সহজ বিষয় ছিল না; কিন্তু এখন ঘরে বসেই নিরাপদে বিচিত্র অপরাধে জড়িয়ে পড়া সম্ভব হচ্ছে। সন্তানদের অশ্লীলতার নোংরা পানি থেকে বাঁচাতে যে বাবা-মা দিন-রাত ব্যতিব্যস্ত, ডিজিটাল ডিভাইসের বদৌলতে সবার অলক্ষ্যে ঘরে বসেই অশ্লীলতার সমুদ্রে অবগাহন করছে তারা। ভার্চুয়াল সম্পর্ক আত্মাকে কলুষিত করছে প্রতিনিয়ত। ভালোবাসা, মায়া, মমতা, আবেগ যেন ভার্চুয়াল আকাশেই হারিয়ে যাচ্ছে। সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে আস্থাহীনতা। পুরো একটি প্রজন্ম ডিভাইস আসক্তিতে ডুবে যাচ্ছে, ইবাদতে আগ্রহ হারাচ্ছে, বাড়ছে ঘৃণার চাষাবাদ।

এভাবে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াকে দেখতে পারি। আমাদের আলোচনার বিষয়—একজন মুসলমান হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়াকে আমরা কীভাবে ডিল করব, কীভাবে পরিচালনা করব। সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকটিভিজম অনেক মানুষকে জান্নাতের দিকে যেমন নিতে পারে, একই সঙ্গে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে পারে জাহান্নামের দিকে। তবে টেকনোলজি কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া নিজে কোনো শয়তানের বাক্স নয়; ভালো কিংবা খারাপের মধ্যস্থতা করে মূলত এর ব্যবহারকারীরাই।

এর মাধ্যমে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, দূরের মানুষকে আপন করা যায় নিমিষেই। এ ছাড়াও উপকারী জ্ঞান মুহূর্তের মধ্যে জনপরিসরে ছড়িয়ে দিতে সোশ্যাল মিডিয়ার চেয়ে অধিক কার্যকর আর কীই-বা হতে পারে? আপনি চাইলেই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকতে পারবেন না। চাইলেই অস্বীকার করতে পারবেন না এর আবেদন ও প্রভাবকে। ক্রমবর্ধমান এই শক্তিশালী গণমাধ্যমটিকে কতটা ইতিবাচক উপায়ে কাজে লাগাতে পারেন, সেটাই আপনার যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

Scanned by CamScanner

সোশ্যাল মিডিয়ার বাস্তবতা

মুহূর্তেই হাজারো মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করার আউটলেটের নাম সোশ্যাল মিডিয়া। প্রায়শই আমরা এর উদ্দেশ্য ও ভূমিকাকে ভুল বুঝি, বিভ্রান্ত হই। কখনো না বুঝে অতিরিক্ত প্রত্যাশা করি, কখনো-বা ভাসি অলীক স্বপ্নের দুনিয়ায়। বিশেষ করে ইসলামি পরিমণ্ডল থেকে আমরা এই জগৎকে ঠিকঠাক বুঝতে চাইনি কখনো। সোশ্যাল মিডিয়া কোনো ইসলামিক ইউনিভার্সিটি নয় যে, এখান থেকে পড়াশোনা করে একজন মুসলিম স্কলার বনে যাবে। এটা জটিল ও বিশদ বিষয়গুলোর ওপর গভীর আলোচনা কিংবা বিতর্কের জায়গাও নয়। বিতর্কের জন্য প্রয়োজন ইসলামের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে বছরের পর বছর গভীর অধ্যয়ন, প্রেক্ষিত ও বাস্তবতার সঠিক বোধ, দ্বীনের প্রাণসত্তার যথাযথ উপলব্ধি।

ফেসবুকে সবচেয়ে বেশি 'লাইক' পাওয়া কিংবা টুইটারে মিলিয়ন 'ফলোয়ার'-এর সেলিব্রেটিরাই সবচেয়ে জ্ঞানী, প্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত—এমনটা ভাবার কোনো অবকাশ নেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় অবস্থান দেখে কারও যোগ্যতা ও তাকওয়ার পরিমাপ করা একেবারেই অনুচিত। ইউটিউব ভিউ-এর অর্থ এই নয় যে, কোনো বক্তৃতা সবচেয়ে প্রামাণিক। কোনো পোস্টে, টুইটে কিংবা ভিডিওর নিচে 'সহমত, সহমত' বলে জিকির তুললেই সেটা অকাট্য জ্ঞান হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না, যতক্ষণ না তা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সত্যায়িত হয়। সেলিব্রেটিজম কোনো রেফারেন্স নয়; রেফারেন্সের বাহক মাত্র।

সোশ্যাল মিডিয়ার দাবানল

আমরা ভুয়া খবরের রমরমা যুগে বাস করছি; চারদিকে ভার্চুয়াল ফতোয়াবাজির ছড়াছড়ি। প্রায়শই দেখা যায়, সোশ্যাল মিডিয়া আলিম, ইমাম ও দাঈদের সম্মান ক্ষুণ্ন করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আলিমদের কথার অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে, সময় ও প্রেক্ষিত না বুঝেই তুলে ধরা হচ্ছে বিতর্কিত ফতোয়া ও মতামত। সোশ্যাল মিডিয়াকে বলা হয়ে থাকে গুজবের প্ল্যাটফর্ম। কোনো তথ্য যাচাই-বাছাই ছাড়াই মুহূর্তের মধ্যে ফরোয়ার্ডিং কিংবা শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে অসত্য তথ্য; যেগুলোর প্রত্যেকটির সমাপ্তি অত্যন্ত লজ্জাজনক।

Scanned by CamScanner

আমরা কেবল নিজেদের লেখা বা বলার জন্য দায়বদ্ধ নই, একই সঙ্গে যা কিছু ছড়াতে সাহায্য করছি, সেগুলোর দায়ও আমাদের কাঁধে বর্তায়। কোনো কিছু ছড়ানোর আগে আপনাকে অবশ্যই সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। প্রায়শই ইনবক্সে ম্যাসেজ আসে—'আপনি যদি আল্লাহ ও নবিকে ভালোবাসেন, তাহলে এটি ফরওয়ার্ড করুন।' কখনো এসবকে পাত্তা দেবেন না; বরং এসব মিথ্যাকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করলে আল্লাহর অসন্তোষ আপনার ওপরই বর্ষিত হবে। একটি হাদিস থেকে মিথ্যা ছড়ানোর শাস্তি কিছুটা উপলব্ধি করা যায়।

সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) বর্ণনা করেন—

> 'নবিজি (ফজর) সালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন—"তোমাদের কেউ গত রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছ কি?" (বর্ণনাকারী বলেন) কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে তিনি তা বিবৃত করতেন। নবিজি তখন আল্লাহর মর্জি মোতাবেক স্বপ্নের তাবির বলতেন। একদা আমাদের প্রশ্ন করলেন—"তোমাদের কেউ কি কোনো স্বপ্ন দেখেছ?" আমরা বললাম—"জি না।" নবিজি বললেন—"গত রাতে আমি দেখলাম, দুজন লোক এসে আমার দুহাত ধরে আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে চলল। হঠাৎ দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া হাতে দাঁড়িয়ে। দাঁড়ানো ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তির (এক পাশের) চোয়ালটা এমনভাবে আঁকড়া বিদ্ধ করছিল যে, তা (চোয়াল বিদীর্ণ করে) মস্তকের পেছনের দিক পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল। অতঃপর অপর চোয়ালটিও আগের মতো বিদীর্ণ করল। ততক্ষণে প্রথম চোয়ালটা জোড়া লেগে যাচ্ছিল। আঁকড়াধারী ব্যক্তি পুনরায় সেরূপ করছিল।" আমি জিজ্ঞেস করলাম—"এ কী হচ্ছে এসব?" তাঁরা বললেন—"আপনি যে ব্যক্তির চোয়াল বিদীর্ণ করার দৃশ্য দেখলেন, সে মিথ্যাবাদী। মিথ্যা কথা বলে বেড়াত, তার বিবৃত মিথ্যা বর্ণনা ক্রমাগত বর্ণিত হয়ে পৌঁছে যেত দূরদূরান্তে। কিয়ামত পর্যন্ত তার সঙ্গে এ ব্যবহার করা হবে।"' (বুখারি : ১৩৮৬)

Scanned by CamScanner

আপনার উদ্দেশ্য কী

সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি কী উদ্দেশ্যে সংযুক্ত হয়েছেন, নিজের কাছে তা পরিষ্কার করুন। প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে বের করুন। আর দশজন বন্ধুর মতো আপনিও কি উদ্দেশ্যহীনভাবে গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাচ্ছেন? আপনার লক্ষ ও উদ্দেশ্য-ই আপনার কর্মের পথ নির্ধারণ করে দেয়। একটি পোস্ট, একটি শেয়ার, টুইট কিংবা ভিডিওর জন্য হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে পুরস্কার পাবেন, নয়তো ভোগ করবেন কঠিন শাস্তি!

আপনিই ঠিক করে নিন—সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কী জানতে চাইছেন, কী জানাতে চাইছেন, কী শিখতে চাইছেন এবং কী শেখাতে চাইছেন। নাকি কেবল আড্ডা আর সময় কাটানোর জন্যই ব্যবহৃত হচ্ছে অপার সম্ভাবনার এই মাধ্যমটি? কীভাবে এটিকে সবচেয়ে প্রোডাক্টিভ উপায়ে কাজে লাগাবেন এবং কল্যাণের পথে ব্যবহার করবেন, তার একটা স্কেচ অবশ্যই আপনাকে এঁকে ফেলতে হবে।

স্ক্রিনের আড়ালে লুকিয়ে থেকে কিংবা ছদ্মনামে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করলেই আপনি যা খুশি তা লিখতে পারেন না; বরং মস্তিষ্কে সব সময় রাখা দরকার—আল্লাহ সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন। আপনি যা করেন, ফেরেশতারা অবিকল তা লিপিবদ্ধ করে চলেছেন প্রতিমুহূর্তে। কুরআনের এই আয়াতগুলোর দিকে লক্ষ করুন—

وَإِذَآ أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا- لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا-

‘কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষের ভালোমন্দ কাজের নিদর্শন আমি তার গলায় ঝুলিয়ে রেখে তার জন্য বের করব একটি খাতা, যাকে সে খোলা কিতাবের আকারে দেখতে পাবে।’ (সূরা ফুরকান : ১৩)

اِقْرَاْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا

‘(এরপর তাকে বলা হবে) তোমার (নিজের) নথি পাঠ করো। আজ তুমি নিজেই তোমার কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।’ (সূরা বনি ইসরাইল : ১৪)

Scanned by CamScanner

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ-

'যে কথাই মানুষ উচ্চারণ করে (তা সংরক্ষণের জন্য) তার নিকটে একজন সদা তৎপর প্রহরী আছে।' (সূরা ক্বফ : ১৮)

কেবল ফেরেশতারাই নয়, অনলাইনে অনেকেই আপনার লেখার সাক্ষী হচ্ছেন। সুতরাং যখনই ইসলামকে উপস্থাপন করবেন, তখন অবশ্যই নিজেকে ইসলামের একজন ভালো অ্যাম্বাসেডর হিসেবে পরিচিত করুন। আপনার উপস্থাপনা দেখে কেউ যেন ইসলামকে ভুল না বোঝে—এতটুকু চিন্তা মাথায় রাখুন।

কী-বোর্ডকে কারও সামনে উপস্থিত হয়ে বলার মতো ভাবা

কারও সামনে উপস্থিত হয়ে কথা বলার সময় আমাদের আচরণ কেমন হয়? জাতশত্রুর সামনেও ন্যূনতম শিষ্টাচার মেনে চলি, তাই না? তখন আমাদের শরীরী ভাষায় স্থিরতা আসে, চোখের ভাষা হয়ে ওঠে আন্তরিক। কিন্তু অনুপস্থিত কারও ব্যাপারে আমরা আমরা কঠিন ভাষায় কথা বলে ফেলি। তখন ব্যক্তির সম্মানের দিকে খুব একটা খেয়াল রাখা হয় না। বাস্তবে কোনো ব্যক্তির সামনে আমরা হয়তো বিনয়ে আড়ষ্ট হই। তার ব্যক্তিত্ব অথবা সম্মানের দিকে খেয়াল রেখে চোখে চোখ রেখে কথা বলার হিম্মত রাখি না। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় এই একই ব্যক্তিকে যা-তা কথা বলে দিচ্ছি অবলীলায়। এখানে কোনো সংকোচ কিংবা শ্রদ্ধাবোধ কাজ করে না।

সোশ্যাল মিডিয়াতে এই অনুপস্থিতির জায়গাটা প্রবল। শ্রোতা বা পাঠক সামনাসামনি থাকে না। ফলে আমরা যেমন খুশি লিখে ফেলি। কাউকে কুচ পরওয়া করি না।

আর সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানারস ঠিক এখানেই। অনলাইনে কিছু বলা ও লেখার সময় মাথায় রাখা দরকার—লোকটি আমার সামনে থাকলে এমন করে বলতাম কি না। আমার পক্ষে তার চোখে চোখ রেখে কথা বলা সম্ভব কি না। কারও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যা করতাম না, অসাক্ষাতেও তা করব না; বরং মুখোমুখির চেয়ে বেশি বিনয়, সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করব।

Scanned by CamScanner

অনলাইন ভদ্রতা

সোশ্যাল মিডিয়ার বিপদগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো—লোকেরা এটিকে অন্যের পাপকর্ম প্রকাশের প্ল্যাটফর্ম মনে করে। এখানে তারা এমন কিছু উন্মুক্ত করে, যা হয়তো অন্যত্র কখনো প্রকাশ করত না। অনলাইন সিকিউরিটির একটা ভুল ধারণা আমাদের মস্তিষ্কে বিরাজমান। আমরা ধরেই নিই—অনলাইনে ছদ্মনামে কিছু করলে তা আদতেই গোপন থাকে। কিন্তু বাস্তবতা বলে ভিন্ন কিছু। অনলাইনে গোপনীয়তা বলে কিছু নেই। এখানে চুপিচুপি যা কিছুই করুন না কেন, তা জনসম্মুখে প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

অন্যের পাপ গোপন করুন, আপনার পাপও আল্লাহ তায়ালা গোপন করবেন। সুতরাং কারও কোনো অন্যায় কাজ নিয়ে আলাপ করতে হলে তার সাথে ইনবক্সে করুন, জনপরিসরে নয়।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

> ‘যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো মুসলিমের দোষক্রটি গোপন করে নেবে, আল্লাহ তার দোষক্রটিকে দুনিয়া ও আখিরাতে গোপন করে নেবেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দার সহায় থাকেন; যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।’ (মুসলিম : ৭০২৮)

কখনো অনলাইনে বিপরীত লিঙ্গের মানুষের সাথে পর্দার খেলাপ করবেন না। এতে একদিকে যেমন ভার্চুয়াল মাধ্যমে অপমানিত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবেন, তেমনিই পরকালে রয়েছে ভয়াবহ শাস্তির সম্ভাবনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারিমে বলেছেন—

> قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۭ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ- وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ-

> ‘মুমিন পুরুষদের বলো, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে। এটাই তাদের জন্য

Scanned by CamScanner

> অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে।' (সূরা নুর : ৩০-৩১)

কখনো কারও ইনবক্স কিংবা ইমেইলে ঢুকবেন না। কারও ব্যক্তিগত আলাপ পাবলিক পোস্টে নিয়ে আসবেন না। এটি নিঃসন্দেহে ভদ্রতার পরিপন্থি এবং নীচ মানসিকতার পরিচায়ক। আল্লাহ তায়ালা অন্যের ত্রুটি খুঁজতে কিংবা ছিদ্রান্বেষী হতে নিষেধ করেছেন।

> يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اجۡتَنِبُوۡا كَثِيۡرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعۡضَ الظَّنِّ اِثۡمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوۡا وَلَا يَغۡتَبْ بَّعۡضُكُمۡ بَعۡضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمۡ اَنۡ يَّاۡكُلَ لَحۡمَ اَخِيۡهِ مَيۡتًا فَكَرِهۡتُمُوۡهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيۡمٌ-

> 'হে ঈমানদারগণ! বেশি ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো। কারণ, কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গুনাহ। অন্যের দোষ অন্বেষণ করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কারও গিবত না করে। এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে, যে তার নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? দেখ, তা খেতে তোমাদের ঘৃণা হয়। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ অধিক পরিমাণে তাওবা কবুলকারী ও দয়ালু।' (সূরা হুজুরাত : ১২)

ইনবক্সে কেউ নক করলে যথাসম্ভব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। একান্তই সম্ভব না হলে অন্তত ছোট্ট একটি টেক্সট করে রাখুন নিজের ব্যস্ততার কথা জানিয়ে। একই সঙ্গে কাউকে নক দেওয়ার ক্ষেত্রে সময়ের দিকেও খেয়াল রাখা জরুরি। আপনার হয়তো পর্যাপ্ত সময় আছে, কিন্তু যাকে নক দিতে চাচ্ছেন তার হাতে সেই মুহূর্তে আপনাকে দেওয়ার মতো সময় না-ও থাকতে পারে। নিজেকে প্রশ্ন করুন—আপনি কারও সময় নষ্ট কিংবা বিরক্তির কারণ হচ্ছেন না তো?

সোশ্যাল মিডিয়ার ম্যানারস হলো—অফিসিয়াল টাইম, নামাজ, বিশ্রাম, ঘুমের সময় কাউকে নক করা থেকে বিরত থাকা। এর আরেকটি ম্যানার হলো—

Scanned by CamScanner

অপরিচিত কাউকে ইনবক্স করার সময় নিজের নাম-পরিচয় জানিয়ে প্রয়োজনীয় কথা একসঙ্গে লিখে ফেলা।

প্রায়োরিটি ঠিক করা

সোশ্যাল মিডিয়াতে যা কিছু সামনে আসে, সবকিছুই আপনার জন্য নয়। ট্রেন্ডে গা ভাসানো কোনো যোগ্যতা নয়; বরং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে বাছাই করে পথ চলতে শেখাই কৃতিত্ব। দুনিয়ার সবকিছুতে নাক গলানোর চেষ্টা না করাই ভালো। তাই যে ইস্যুটি আপনার নয়, তা ছেড়ে দিন। মানবিক সত্তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—কোনো বিষয়ে জানার পর তা অপরের সামনে উপস্থাপন না করা অবধি মানুষ স্থির হতে পারে না। কিন্তু এই প্রবণতা মানবীয় ত্রুটির অন্তর্ভুক্ত। কোনো বিষয়ে ওয়াকিবহাল হলেই তা প্রকাশের জন্য অস্থির হতে হবে, এমনটি হওয়া মোটেই সমীচীন নয়। জ্ঞান তো অন্তর্নিহিত ব্যাপার।

আমাদের অবচেতন মন তাড়া দেয়—'আমি তো অনেক কিছু জানি, তা মানুষ না জানলে কেমন হয়!' সোশ্যাল মিডিয়া অসাধারণ সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে বলেই কারও ভালো লাগুক আর না লাগুক, কেউ বীতশ্রদ্ধ হোক বা না হোক, কারও উপকারে আসুক কিংবা না আসুক; সব সময় নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করতে হবে—এমনটি একেবারেই কাম্য নয়।

তাই সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি ঠিক করুন। কী বিষয়ে মুখ খুলবেন, কলম চালাবেন; তা সুনির্দিষ্ট করুন। এর বাইরে নীরবতাকে আলিঙ্গন করাই বৃহত্তর কল্যাণ।

লেখার সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন—

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ

أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا-

Scanned by CamScanner

> ‘আর সে বিষয়ের পেছনে ছুটো না, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই। কান, চোখ আর অন্তর: এগুলোর সকল বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।’ (সূরা বনি ইসরাইল : ৩৬)

অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, আপনার লেখা নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সত্যায়িত কি না। শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কিছু লিখে ফেলবেন না। মিথ্যা, ভুয়া ও গুজবনির্ভর কোনো লেখা যাচাই না করে ছড়িয়ে দেওয়া নিজের অপমানেরই নামান্তর। এতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ে, ভেঙে পড়ে সামাজিক শৃঙ্খলায়। ক্রমাগত ভুল তথ্য শেয়ারকারী একসময় তার ভার্চুয়াল দুনিয়ার অনুসারীদের কাছেই হয়ে ওঠে চরম নিন্দনীয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟

قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ-

> ‘হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ এ আশঙ্কায় যে, অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে বসবে। ফলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে।’ (সূরা হুজুরাত : ০৬)

জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে কোনো সংবাদ প্রচার করার আগে যত দূর সম্ভব বেশি করে যাচাই করুন। এমন কিছু প্রচার করবেন না, যাতে পরে লজ্জিত হতে হয়। নবিজি বলেছেন—

> ‘একজন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট—সে যা শোনে, তা হুবহু মানুষকে বলে বেড়ায়।’ (আবু দাউদ : ৪৯৯২)

জ্ঞান ছাড়া কথা না বলা

সোশ্যাল মিডিয়াতে কেবল সে বিষয়ে কথা বলুন, যে বিষয়ে আপনি পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন। বিশেষ করে ইসলামের কোনো ইস্যুতে কথা বলার আগে নিজের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস থাকা চাই। আমার কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না

Scanned by CamScanner

হওয়া সত্ত্বেও হামেশাই মন্তব্য করে বসি। এই প্রবণতা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনছে, বিতর্ক ও জিঘাংসা উসকে দিচ্ছে, উম্মাহকে ঠেলে দিচ্ছে পতনের দ্বারপ্রান্তে।

সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারকে ইবাদতে পরিণত করা

যেকোনো দুনিয়াবি কর্মকেই ইবাদতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। একটু চেষ্টা করলেই সোশ্যাল মিডিয়াতে দুনিয়াবি খ্যাতি জোটে, সেলিব্রেটিজমের স্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু এর কোনো কিছুই আখিরাতে কোনো উপকার বয়ে আনবে না; বরং সেলিব্রেটিজম একজন মুমিনকে ভয়ানক বিপদে ফেলার জন্য যথেষ্ট। আত্মঅহমিকা, দাম্ভিকতা ও প্রদর্শনেচ্ছার রোগ তাকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। অথচ আমরা চাইলেই সোশ্যাল মিডিয়াকে ইবাদতের মাধ্যম বানাতে পারি, লাখো বনি আদমের কাছে পৌঁছতে পারি ইসলামের শাশ্বত আহ্বান।

দুনিয়াব্যাপী বহু স্কলার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত ছড়িয়ে দিচ্ছেন। কেউ বলছেন, কেউ-বা কলম হাতে লিখে চলেছেন হিদায়াতের পথচিত্র।

মুদ্রার অপর পিঠের মতোই ভার্চুয়াল দুনিয়ায় ইসলামবিদ্বেষ পরিকল্পিতভাবে সাজানো আছে। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ইসলামের বিরুদ্ধে বহু নিবন্ধ, গবেষণাপত্র, লেখালিখি ও ভিডিও। সার্চ ইঞ্জিনে ইসলামের যেকোনো ইস্যুতে ঘুরে আসুন, দেখবেন ভয়াবহ সব ইসলামবিদ্বেষী কন্টেন্ট। মুমিন হিসেবে আমাদের উচিত ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ইসলামের সঠিক শিক্ষা তুলে ধরে প্রচুর পরিমাণে গঠনমূলক ইসলামি কন্টেন্ট তৈরিতে ভূমিকা রাখা। ইসলামের ভুল ব্যাখ্যার অপনোদন করে সঠিক চিন্তাধারাকে উপস্থাপন করা। মুসলমান হিসেবে এটি আমাদের ঈমানি দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ-

'আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে—"অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।"' (সূরা হা-মিম আস-সাজদা : ৩৩)

Scanned by CamScanner

মন্দের নয়, হয়ে উঠি ভালোর চাবিকাঠি

অন্যদের সৎকর্মে অনুপ্রাণিত করতে, অন্ধকার থেকে তুলে এনে আলোর পথ দেখাতে আপনার ফেসবুক আইডিকে কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও অবাধ্যতা, নোংরামি ও গুজব-মিথ্যাচার ছড়াতে আপনার অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করবেন না। নিজে গান শুনে কিংবা পর্দার খেলাপ করে অন্যকে তাতে উদ্‌বুদ্ধ করবেন না। আত্মীয়স্বজনের পারিবারিক জীবনের ছবি ও ভিডিও গায়রে মাহরামদের সামনে অযথা উপস্থাপন করবেন না।

আপাতদৃষ্টিতে এসবকে স্মার্ট কাজ মনে হলেও আদতে এগুলো অপরিণামদর্শিতা এবং নৈতিক স্খলনের পরিচায়ক। মানবিক মর্যাদা ও নৈতিকতা পরিপন্থি এসব কাজ সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনোভাবেই প্রকাশ করা উচিত নয়।

ফেইক পরিচয়ে অপকর্ম না করা

সোশ্যাল মিডিয়ার একটা সুবিধা হলো, এখানে ছদ্মনামে থাকা যায়। অনেক কিছু করে ফেলা যায় পরিচয় গোপন রেখেই। ছদ্মাবরণ মানুষের সামনে এই অপার স্বাধীনতা উন্মুক্ত করে দেয়। আত্মপরিচয়ে যে কাজ করতে বার চিন্তা করতে হয়, ফেইক আইডি দিয়ে তা নিমিষেই করে ফেলা যায়। কিন্তু আপনি তো আল্লাহ তায়ালার কাছে ফেইক পরিচয়ে থাকতে পারবেন না। ফেরেশতাদের কাছে নিজেকে গোপন করতে পারবেন না। রব আপনার অন্তরের সবটুকুই জানেন। প্রতিটি কাজের জন্যই শেষ বিচারের দিন জবাবদিহি করতে হবে আপনাকে।

তা ছাড়া ফেইক আইডি মানেই প্রতারণা। তবে একান্তই বাধ্য হয়ে ছদ্মনামে থাকতে হলে অন্তত তা দিয়ে যেন কারও সম্মান ও মর্যাদার ক্ষতি না হয়, সে ব্যাপারটা নিশ্চিত করা জরুরি। নিজের নিরাপত্তার জন্য ছদ্মনাম ব্যবহার করে আপনি আরেকজনের নিরাপত্তা ও সম্মানে আঘাত হানতে পারেন না।

আপনি কি মনে করছেন, ফেইক আইডি খুলে আপনার অপকর্ম করলে তা কেউ বুঝতে পারবে না? আপনি কি আপনার ভালোর আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকা কদার্য রূপটি সহজে লুকাতে পারবেন? প্রযুক্তি এখন এত বেশি উন্নত হয়েছে যে, আপনার অবস্থান নির্ণয় করা মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। আমরা প্রযুক্তির কথা বাদ দিলাম। আল্লাহ সুবহানু ওয়া তায়ালার চোখে ফাঁকি দিতে পারবেন কখনো? দেওয়া সম্ভব? আল্লাহ তায়ালা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলছেন—

Scanned by CamScanner

يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ الۡاَعۡیُنِ وَمَا تُخۡفِی الصُّدُوۡرُ-

'আল্লাহ চক্ষুর অন্যায় কর্ম সম্পর্কেও অবগত, আর অন্তর যা গোপন করে সে সম্পর্কেও।' (সূরা মুমিন : ১৯)

সোশ্যাল মিডিয়াতে তাড়াহুড়ো না করা

কী-বোর্ডের ইন্টার বাটন চাপার আগে কী লিখেছেন তা নিয়ে একবার ভাবুন। আবার ভাবুন এবং পুনরায় ভাবুন। পর্যাপ্ত সময় নিন। একজন ব্যক্তির জিহ্বা তার নিয়ন্ত্রণে থাকে, যতক্ষণ না সে একটি শব্দ উচ্চারণ করে। শব্দটি উচ্চারণ করার সাথে সাথেই সে আর চালকের আসনে থাকে না। একইভাবে যতক্ষণ না আপনি আপনার টুইট, শেয়ার কিংবা পোস্ট প্রকাশ করেন, ততক্ষণ সেসব আপনার নিয়ন্ত্রাণাধীন। এগুলো বারবার যাচাই করে ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা সম্ভব। কিন্তু একবার প্রকাশ হয়ে গেলে আপনার আর কিছুই করার থাকে না। ডিলিট করার আগেই সাক্ষী হয়ে যায় অসংখ্য মানুষ। খানিক সময়ের মধ্যেই হয়তো স্ক্রিনশটও নেওয়া হয়ে যায়। তাই অযথা তাড়াহুড়ো করবেন না; সময় নিন। ১০ মিনিট লিখলে তা নিয়ে অন্তত ২০ মিনিট ভাবুন, তারপর পোস্ট করুন। নবিজি বলেছেন—

> 'ধৈর্য ও চিন্তাশীলতা আল্লাহর পক্ষ থেকে; তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে।' (তিরমিজি : ২০১২)

সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট আপনার মৃত্যুর পরও থাকবে

চোখ বন্ধ করে একটু কল্পনা করুন তো! আপনি ইন্তেকাল করেছেন। তখনও সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনার নামে এক কিংবা একাধিক অ্যাকাউন্ট সচল। সেগুলো কি অটোমেটিক গায়েব হয়ে যাবে? না; বরং মৃত্যুর পরও আপনার পোস্ট, টুইট, ছবি, ভিডিও ঠিক আগের মতোই থাকবে—একটুও হেরফের হবে না। আপনার অবর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাক্টিভিটিগুলো তখনও আপনার প্রতিনিধিত্ব করে চলবে। লোকে পূর্বের মতোই সেসব দেখতে থাকবে; বরং মৃত্যুর পর আরও বেশি সংখ্যক মানুষ কৌতূহল কিংবা আবেগ নিয়ে ভিজিট করবে আপনার কৃতকর্মের নমুনা।

Scanned by CamScanner

ভাবুন! লোকে তখন কী দেখবে, কী পড়বে? আপনার দুনিয়ার জিন্দেগির পুরো চিত্র সেখানে থাকবে, তাই না? এমনকী বহু বছর পর আপনার উত্তরপ্রজন্ম সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাক্টিভিটি দিয়ে আপনাকে বিচার করবে, উপলব্ধি করবে। কখনো ভেবে দেখেন কি এসব?

সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম ব্যক্তিগত ডায়েরি নয়

সোশ্যাল মিডিয়া কোনো ব্যক্তিগত ডায়েরি নয়। এটি একটা উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম। এখানে নিজের একান্ত ভেতরের কথা প্রকাশ করা অনুচিত। ব্যক্তিগত ডায়েরিতে মানুষ তার মনের গোপন কথা, আবেগ, স্বপ্ন, ভালো লাগা, খারাপ লাগা লিখে রাখে। ডায়েরি মানেই কখনো দুঃখের পসরা, কখনো-বা অনাবিল সুখের উচ্ছ্বসিত স্ফূরণ। সোশ্যাল মিডিয়া ঠিক এমন নয়। এখানে আপনি মন চাইলেই ডায়েরির মতো লিখতে পারেন না। এই উন্মুক্ত পরিসরে বৃহত্তর স্বার্থ আর মানুষের কল্যাণের বড়ো উপলক্ষ্যকে সামনে রাখতে হয়। একটু মন খারাপ হলে কিংবা একটু ভালো লাগলেই এখানে যা তা লেখা অসমীচীন।

ভালো ইমেজ বজায় রাখা

আমরা উপলব্ধি করি বা না করি, আমাদের দিকে অনেকেই নজর রাখে। অধিকাংশ অমুসলিম ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য কুরআন বা হাদিসের কাছে যায় না, আমাদের আচরণ দেখে। আমাদের দেখেই ইসলাম সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে। আপনি লাইফস্টাইলকে যেভাবে তুলে ধরেন, যেভাবে পোস্ট করেন, সমসাময়িক ইস্যুতে যেভাবে মন্তব্য করেন, যেভাবে বিতর্ক করেন, সেসব দেখেই তারা আপনার আদর্শ ও বিশ্বাসকে মূল্যায়ন করে। আপনার জীবনধারা যেমনই হোক, ভার্চুয়াল মাধ্যমে তারা জানে—আপনি একজন মুসলিম এবং মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

আপনি ভার্চুয়ালি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিতর্ক করতে পারবেন; তবে বিতর্কের ভাষা যেন উত্তম হয়। কোনোভাবেই কাউকে আঘাত করে কিংবা অপমান করে কথা বলবেন না। আর কাউকে উপহাস করার তো প্রশ্নই ওঠে না। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন—

Scanned by CamScanner

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٌ مِّنۡ قَوۡمٍ عَسٰۤى اَنۡ يَّكُوۡنُوۡا خَيۡرًا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٌ مِّنۡ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنۡ يَّكُنَّ خَيۡرًا مِّنۡهُنَّ‌ۚ وَلَا تَلۡمِزُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُوۡا بِالۡاَلۡقَابِ‌ؕ بِئۡسَ الِاسۡمُ الۡفُسُوۡقُ بَعۡدَ الۡاِيۡمَانِ‌ۚ وَمَنۡ لَّمۡ يَتُبۡ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ-

'হে ঈমানদারগণ! কোনো সম্প্রদায় যেন অপর কোনো সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোনো নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রুপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেক না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতই-না নিকৃষ্ট! আর যারা তওবা করে না, তারাই তো জালিম।' (সূরা হুজুরাত : ১১)

বোনদের জন্য সতর্কতা

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে মেয়েদের বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। তাদের জন্য এটা খুবই বিপজ্জনক একটা জায়গা। ভার্চুয়াল দুনিয়ার পরিচয়ে কখনো কাউকে নিজের তথ্য দেবেন না। বাস্তবে পরিচয়হীন কোনো মেয়ে বন্ধুকেও ইনবক্সে ছবি, ভিডিও শেয়ার করবেন না। একটা ভুল সিদ্ধান্ত আপনার চোখে অনেকদিন অশ্রু ঝরাবে। হতে পারে, ফেইক আইডি দিয়ে বন্ধুত্বের আহ্বান জানানো ব্যক্তিটি কোনো গুপ্ত ঘাতক!

তাই সাবধান! আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখুন। অযথা হুটহাট ছবি-ভিডিও আপলোড করা থেকে বিরত থাকুন। এর মাঝেই রয়েছে কল্যাণ। মিষ্টি কথায় তথ্য ও ছবি হাতিয়ে সুপার এডিটের মাধ্যমে ব্ল্যাকমেইলের ঘটনা আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় অহরহ।

অনলাইন মুফতি হবেন না

সোশ্যাল মিডিয়ায় মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রান্তিকতা পরিহার করুন। প্রায়শ আমরা এখানে খুব সহজেই বিচারক বনে যাই। আমাদের আচরণ

Scanned by CamScanner

অনেকটা এমন, যেন আমরা অন্যের ভুলের বিচারক আর নিজের ভুলের অ্যাডভোকেট। সামান্য পড়াশোনা নিয়ে প্রান্তিক সিদ্ধান্ত দেওয়া কখনোই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

আজকাল হাজারো অনলাইন মুফতি দেখা যায়, যাদের জ্ঞানের পরিসর খুবই স্বল্প। এমন চর্চা দিনশেষে বিপদেই ডেকে আনে। ফতোয়া কিংবা সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ আলিমগণ রয়েছে। এই গুরুদায়িত্ব তাদের কাঁধেই রাখুন; নিজের দুর্বল কাঁধে চাপিয়ে নেওয়ার দরকার কী?

একজন অ্যাক্টিভিস্ট ও দাঈর বিচারকসুলভ কথা এড়িয়ে চলা উচিত। আরব দাঈদের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে—'নাহনু দুআত ওয়া লাসনা কুদাত' অর্থাৎ আমরা দাঈ, বিচারক নই। অনলাইনে দাঈদের ভূমিকা আসলে এমনই হওয়া উচিত।

সোশ্যাল মিডিয়াকে রিয়েল লাইফ না ভাবা

আপনি কি সোশ্যাল মিডিয়াকে বাস্তব জীবনের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করছেন? সোশ্যাল মিডিয়াতে অন্যরা কতটা সফল, তার ওপর ভিত্তি করে নিজের সাফল্যকে মাপতে শুরু করেছেন? যদি এমনটি করে থাকেন তবে ভুল করছেন। সোশ্যাল মিডিয়া মানুষের বাস্তব জীবনের প্রতিফলন নয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় লোকজন যা-ই পোস্ট করে, সেটাই তার হুবহু বাস্তব জীবন—এমনটা না-ও হতে পারে। কিন্তু আমরা মানুষের ফেইক লাইফ দেখে, নিজের রিয়েল লাইফের সঙ্গে কম্পেয়ার করে আফসোস করছি। অন্য মানুষের ফেইক লাইফ দেখে, আমরা আমাদের রিয়েল লাইফকে অভিশাপ মনে করছি। সোশ্যাল মিডিয়াকে আপনার প্রয়োজনে ব্যবহার করুন, সোশ্যাল মিডিয়া যেন আপনাকে ব্যবহার করতে না পারে। সোশ্যাল মিডিয়াতে নয়; বরং রিয়েল লাইফে খুশি থাকা শিখুন।

সন্তানের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার পর্যবেক্ষণ

নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যখন শিশু-কিশোর বা তরুণরা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে থাকে, তখন তারা এটাতে আসক্ত হয়ে পড়ে। অধিক আসক্তির কারণে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। তাই আপনার

Scanned by CamScanner

আদরের সন্তান কীভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটাচ্ছে, কার সাথে যোগাযোগ করছে, তার ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে কারা কারা আছে—সেটা আপনাকে জানতে হবে। এর আলোকে তার সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এক্ষেত্রে 'প্যারেন্টিং কন্ট্রোল অ্যাপস' ব্যবহার করতে পারেন। শিশু-কিশোরদের পর্যবেক্ষণের জন্য কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি বাসার এমন জায়গায় রাখুন, যাতে আপনার সন্তান কী করছে তা দেখতে পারেন।

কিছু ইতিবাচক কাজ

জ্ঞান অর্জন : ফেইসবুকে বিভিন্ন শিক্ষামূলক পেইজ ফলো করে অনেক আপডেটেড থাকা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে দেশ-বিদেশে ঘটে যাওয়া সংবাদ মুহূর্তেই জেনে যাওয়ার সুযোগ আছে এখানে। বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ হয়ে ওঠার জন্য অনলাইনে কোর্স করার সুযোগ রয়েছে। ইউটিউব টিউটোরিয়াল নিয়ে যেকোনো কিছু খুব সহজেই শিখে ফেলা যায়। সোশ্যাল মিডিয়াতে চাইলে আপনার দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারেন, যা থেকে অন্যরা উপকৃত হতে পারে। এভাবে উপকারী জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ দুটোরই এক সহজ মাধ্যম হতে পারে সোশ্যাল মিডিয়া।

ফান্ড রাইজিং : সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে আমরা মানুষের পাশে অর্থনৈতিক সহায়তা নিয়ে দাঁড়াতে পারি। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, মহামারিসহ নানান দুর্যোগ-দুর্বিপাকে পর্যুদস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এই মাধ্যমটির ফলপ্রসূতা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ইভেন্ট খুলে আমরা সহজেই ভালো অঙ্কের অর্থ সংগ্রহ করে ফেলতে পারি অল্প সময়ের মধ্যেই।

রক্ত সংগ্রহ : রক্ত একার্থে জীবন। অনেক সময় দেখা যায়—মুমূর্ষু রোগীর জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েও স্বজনরা সঠিক সময়ে রক্ত জোগাড় করতে ব্যর্থ হন। এতে জীবনের ঝুঁকিও তৈরি হয়। আমরা সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে রক্ত সংগ্রহের অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে পারি। এতে কোনো জরুরি মুহূর্তে রক্তের প্রয়োজনে হন্য হয়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানো সম্ভব হবে।

অন্যকে অনুপ্রাণিত করা : আমাদের প্রজন্ম খুব সহজেই জীবনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়ে, আঁধারে পথ হাতড়ে বেড়ায়। তাদের অনুপ্রাণিত করার

Scanned by CamScanner

জন্য সোশ্যাল মিডিয়া হতে পারে মোক্ষম অস্ত্র। এটি দ্বীনি দাওয়াতের অন্যতম একটি অংশও বটে। নবিজি বলেছেন—

> 'সহজ করো, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না।' (বুখারি : ৬৯)

সচেতনতা তৈরি : সচেতনতা তৈরিতে সোশ্যাল মিডিয়া এক বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। করোনা ভ্যাকসিন, নানা কুসংস্কার প্রতিরোধে, স্বাস্থ্য সচেতনতা, খাদ্য সচেতনতা, শিক্ষা সচেতনতা ইত্যাদি ব্যাপারে গত কয়েক বছর সোশ্যাল মিডিয়া ছিল সরব। লোকজন খুব সহজেই এসব ব্যাপারে জানতে পারছে এবং সচেতনতা বাড়ছে।

সোশ্যাল মিডিয়া দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। এটি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে ব্যবহারকারীরা জনপরিসরে নিজেদের উপস্থাপন করার একটি সুযোগ পায়। খুব সহজেই তারা বিভিন্ন কন্টেন্ট শেয়ার করতে পারে, বিভিন্ন পোস্টের মাধ্যমে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে, গ্রুপ তৈরি করে একসঙ্গে সবার সাথে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ার আছে এ রকম নানা ব্যবহার। কিন্তু মুসলিম হিসেবে এক্ষেত্রে আমাদের উচিত, এর পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা। মাত্রাতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার থেকে দূরে রাখা প্রয়োজন। এটা আসক্তির জন্ম দেয়।

নিজের ব্যক্তিজীবনকে অতিরিক্ত খোলামেলাভাবে উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকা উচিত। প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। কারণ, সোশ্যাল মিডিয়ার পরিধিটা অনেক ব্যাপক এবং এখানে ভালো ও খারাপ উভয় মানসিকতার ব্যবহারকারীই রয়েছে। তাই যতটা প্রয়োজন ততটাই প্রকাশ করা এবং ব্যক্তিজীবনের গোপনীয়তা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে ক্ষেত্রবিশেষে সোশ্যাল মিডিয়া মূলধারার গণমাধ্যমের চেয়েও শক্তিশালী এবং এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তাই এই সেন্সেটিভ জগতে আমাদের সম্পৃক্ততা হতে হবে খুব বুঝে-শুনে, ভদ্রতা ও শালীনতা বজায় রেখে এবং অন্যের অধিকার ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে। সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানারগুলো মেনে চললেই কেবল এই প্লাটফর্মটি ব্যবহার উপযোগী থাকবে। নচেৎ সোশ্যাল মিডিয়া হতে পারে সর্বনাশের কারণ।

Scanned by CamScanner

শেষ ভরসা

চারজন চারটি বাইক নিয়ে একটি উঁচু বিল্ডিংয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। বিল্ডিংয়ের ১০ তলায় তাদের অফিস। অফিস টাইমে বাইকগুলো তারা রাস্তার পাশেই পার্কিং করে রাখে।

দুজন বলল—'আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করি, বাইকে তালা দেওয়ার কী দরকার? আল্লাহই আমাদের বাইক হেফাজত করবেন।' অন্য দুজন বলল—'আমরা নিজের পক্ষ থেকে সাধ্যানুযায়ী নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বাকিটার জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম।' ফলে তারা বাইকে তালা দিয়েই অফিসে গেল।

অফিস শেষে নিচে নেমে তারা দেখল—প্রথম দুজনের মধ্যে একজনের বাইক চুরি হয়ে গেছে। অপর দুজনের মধ্যে একজনের বাইক অন্য গাড়ির ধাক্কায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রথম দুজন কোনো ধরনের জাগতিক উপায় অবলম্বন না করে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করেছিল। কিন্তু দেখা গেল একজনের বাইক চুরি হয়ে গেছে, অপরজনেরটা ঠিক আছে। দ্বিতীয় দলের ক্ষেত্রেও একই পরিণতি। জাগতিক উপায় অবলম্বনের পরও একজনেরটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অপরজনেরটা ঠিক আছে।

Scanned by CamScanner

উপরিউক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খুব স্বাভাবিকভাবে মনে প্রশ্ন জাগে—তাহলে কোন প্রকারের তাওয়াক্কুল আমরা করব? জাগতিক উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে, নাকি এগুলো ছাড়াই তাওয়াক্কুল করব? আর সঠিকভাবে তাওয়াক্কুল করার পরও কি বৈষয়িক ক্ষতি হতে পারে? তাওয়াক্কুল ছাড়াও কি জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকতে পারে?

এসব প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব এবার। তবে তার আগে চলুন জেনে নেওয়া যাক—তাওয়াক্কুল কী, এর গুরুত্ব কতটুকু এবং এর ধরনই-বা কেমন।

তাওয়াক্কুল কী

সাধারণত ভরসা করাকেই আরবি ভাষায় বলে তাওয়াক্কুল। মানুষ তার জীবন পরিচালনা ও বিভিন্ন চাহিদা মেটানোর জন্য কারও না কারও ওপর নির্ভর করে। এই নির্ভরতাকেই বলে তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুলের শাব্দিক অর্থ—

- আল্লাহর ওপর ভরসা ও নির্ভর করা (To rely upon Allah.)
- তাঁর নিকট কার্যভার অর্পণ করা (To put your trust on Allah.)

পারিভাষিক অর্থে তাওয়াক্কুল হলো—

কর্মশেষে ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর নির্ভরতা। তাওয়াক্কুলের মূল হাকিকত হলো—মানুষ আল্লাহকে সকল কাজের কর্মবিধায়ক মনে করবে।

ইসলামি চিন্তাবিদ ও স্কলারগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞায়ন করেছেন। ইসলামি চিন্তাবিদদের অনেকেই মনে করেন, তাওয়াক্কুল হলো আত্মিক স্থিতি বা স্থিরতা। অর্থাৎ, নিজের ইহকাল-পরকালের ভূতভবিষ্যৎ সমস্তই আল্লাহর নিকট সমর্পণ করা। নিজেকে তুচ্ছ করে রবের নিকট সঁপে দেওয়াই তাওয়াক্কুল। সাহাল (রহ.) বলেন—

> 'তাওয়াক্কুল হলো আল্লাহর সিদ্ধান্ত বান্দা কর্তৃক সাদরে গ্রহণ করা।'[১২]

---

[১২] ইউসুফ আল কারজাভি, *আত-তাওয়াক্কুল* : পৃ.-১৮

Scanned by CamScanner

তাওয়াক্কুল সম্পর্কে হাসান (রহ.) বলেছেন—

'মালিকের ওপর বান্দার তাওয়াক্কুলের অর্থ, আল্লাহই তার নির্ভরতার স্থান—এ কথা সে মনে রাখবে।'[১৩]

আজ-জুবাইদি (রহ.) বলেন—

'আল্লাহ তায়ালার নিকট যা আছে, তার ওপর নির্ভর করা এবং মানুষের হাতে যা আছে, তার প্রতি আশাহত থাকাকে তাওয়াক্কুল বলে।'[১৪]

উমর (রা.) খুব সুন্দর করে তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন—

'প্রকৃত মুতাওয়াক্কিল তিনি, যিনি জমিনে বীজ বপন করে, অতঃপর ফসলের জন্য আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করে।'[১৫]

তাওয়াক্কুল কার ওপর করব

মুমিন ব্যক্তি তাওয়াক্কুল করবে কেবলই মহান আল্লাহর ওপর; কোনো উপায়-উপকরণ, অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা কিংবা ব্যক্তির ওপর নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ-

'যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো, তবে আল্লাহর ওপর ভরসা করো।' (সূরা মায়েদা : ২৩)

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ-

'আর তুমি ভরসা করো এমন চিরঞ্জীব সত্তার ওপর, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করেন না।' (সূরা ফুরকান : ৫৮)

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ-

'আর আল্লাহর ওপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।' (সূরা ইবরাহিম : ১১)

---

১৩ ইবনু রজব, *জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম* : পৃ.-৪৩৭

১৪. মুরতাজা আজ-জুবাইদি, তাজুল আরুস শীর্ষ শব্দ (وكل)

১৫. ইবনু রজব, *জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম*

Scanned by CamScanner

قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ-

'এদের বলে দাও, তিনিই আমার রব; তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি এবং তাঁরই কাছে আমাকে ফিরে যেতে হবে।' (সূরা রা'দ : ৩০)

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ-

'অতঃপর যখন কোনো ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ হও, তখন আল্লাহর ওপরই ভরসা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদের পছন্দ করেন।' (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ওপর তাওয়াক্কুল করা হারাম এবং তা শিরকের পর্যায়ভুক্ত। যারা আল্লাহ ব্যতীত কোনো সৃষ্টি বা উপায়-উপকরণের ওপর নির্ভর করে, প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর অভিভাকত্বকেই অস্বীকার করে। তারা প্রয়োজন পূরণের জন্য ভুল কাউকে ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করে অথবা জ্ঞান-গরিমা, অর্থ-সম্পদের বলে নিজেকে স্বয়ংসম্পন্ন ভেবে আত্ম-অহমিকায় ভুগতে থাকে। চিন্তা করে, তারা আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষী নয়। অথচ মানুষের সবকিছুই আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষী। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত মানুষের অস্তিত্বই অসম্ভব। সূচনা থেকে শুরু করে অনন্তকাল পর্যন্ত তিনিই মানুষের প্রকৃত অভিভাবক। মহান আল্লাহ বলেন—

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ-

'হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।' (সূরা ফাতির : ১৫)

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ-

'আল্লাহই তো জীবিকাদাতা, শক্তির আধার।' (সূরা জারিয়াত : ৫৮)

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ-

'তোমাদের ওপর যা কিছু করুণা রয়েছে, তার সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে। তারপর যখন তোমরা কোনো কঠিন সময়ের মুখোমুখি হও, তখন তোমরা নিজেরাই নিজেদের ফরিয়াদ নিয়ে তাঁরই দিকে দৌড়াতে থাকো।' (সূরা নাহল : ৫৩)

Scanned by CamScanner

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا -

'তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাই তাঁকেই অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো।' (সূরা মুজ্জাম্মিল : ০৯)

সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্তা কিংবা উপায়-উপকরণের ওপর ভরসা করা থেকে আমাদের অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। আমরা প্রায়শই বলে থাকি—'এই চাকরি বা ব্যবসাটাই আমার শেষ ভরসা।' 'এই সন্তানই আমার পড়ন্ত সময়ের আস্থা।' 'বাড়িটা করার জন্য ব্যাংকের ঋণই এখন শেষ ভরসা।' এগুলোর ওপর পুরোপুরি তাওয়াক্কুল করলে নিজের অজান্তেই আমরা শিরকে জড়িয়ে পড়ছি। মুমিন হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো—যাবতীয় উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে কার্যোদ্ধারের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করা। যেমনটি নবি শোয়াইব (আ.) বলেছিলেন তাঁর রবের নিকট—

اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ -

'আমি তো আমার সাধ্য অনুযায়ী সংশোধন করতে চাই। আমি যা কিছু করতে চাই—তা সবই আল্লাহর তাওফিকের ওপর নির্ভর করে। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি এবং সব ব্যাপারে তাঁরই দিকে রুজু করি।' (সূরা হুদ : ৮৮)

তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব

তাওয়াক্কুল একটি ইবাদত। আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতিদানে তাওয়াক্কুলের মতো উঁচু স্তর দ্বিতীয়টি মেলে না। একজন বিশ্বাসীর প্রতিটি কাজে, প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা আবশ্যক। কুরআনের অসংখ্য স্থানে এই বিষয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়াও আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের তাওয়াক্কুলের নির্দেশ দিয়ে বেশ কিছু আয়াত নাজিল করেছেন—

Scanned by CamScanner

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ-

'যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো, তবে আল্লাহর ওপর ভরসা করো।' (সূরা মায়েদা : ২৩)

قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ-

'বলুন, হে নবি! আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই ওপর নির্ভর করে।' (সূরা জুমার : ৩৮)

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ-

'আর সেই পরাক্রান্ত ও দয়াময়ের ওপর ভরসা করো।' (সূরা শুআরা : ২১৭)

যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হয়ে যান। তখন তার যা প্রয়োজন, দয়াময় রব নিজ থেকেই সেটার ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۖ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا-

'যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ তার ইচ্ছে পূরণ করবেনই। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্য একটা মাত্রা ঠিক করে রেখেছেন।' (সূরা তালাক : ০৩)

স্বয়ং আল্লাহ যার হয়ে যান, কোন অপূর্ণতা তাকে ছোঁয়ার দুঃসাহস রাখে?

আল্লাহর ভালোবাসাপ্রাপ্তি : মানুষ তার পরম করুণাময় প্রভুকে নিজের একমাত্র অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাঁর নিকট নিজের সমস্ত সত্তাকে সঁপে দেয়, তাঁর ওপরই ভরসা করে, তখন করুণার আধার আল্লাহ বান্দার প্রতি খুশি হয়ে যান। যে বান্দা তাঁকে বিশ্বাস করে, এতটা নির্ভর করে তাঁর ওপর, সেই বান্দার জন্য তিনি নিজের ভালোবাসা ও নিয়ামতের দুয়ার খুলে দেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

Scanned by CamScanner

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ-

'নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।'
(সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

অহংকার থেকে মুক্তি : তাওয়াক্কুলশূন্য হৃদয়ে বাধাহীনভাবে এবং খুব সহজেই অহংকার প্রবেশ করে। আর অহংকার মুমিনের সমস্ত নেক আমল বিনষ্ট করে দেয়। তাওয়াক্কুলহীনতা যেমন বান্দাকে আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর অটল থাকতে দেয় না, ঠিক তেমনই আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত নিয়ামতের শুকরিয়া করাও ভুলিয়ে দেয়। এর ফলে বান্দা হয়ে উঠে দাম্ভিক ও অহংকারী।

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى- اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى-

'সত্যি সত্যি মানুষ সীমালঙ্ঘন করে। কারণ, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।' (সূরা আলাক : ৬-৭)

ঈমানের বৈশিষ্ট্য অর্জন : একজন মুমিন-মুসলমানের মুতাওয়াক্কিল বা আল্লাহর ওপর ভরসাকারী হয়ে থাকাই বাঞ্ছনীয়। বস্তুত আল্লাহর ওপর ভরসা করা দুনিয়া ও আখিরাতে সমৃদ্ধি লাভের একমাত্র কার্যকর ও মসৃণ পন্থা। মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ-

'প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই, আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে, আল্লাহর আয়াত তাদের সামনে পড়া হলে তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা নিজেদের রবের ওপর ভরসা করে।' (সূরা আনফাল : ০২)

স্বজাতির লোকদের সাথে বিতর্কের পরিস্থিতিতে আল্লাহর ওপর ভরসার ব্যাপারে নবিদের উক্তিকে আল্লাহ সরাসরি উল্লেখ করেছেন—

وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ
اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ-

Scanned by CamScanner

> 'আমাদের আল্লাহর ওপর ভরসা না করার কী কারণ থাকতে পারে, অথচ তিনি আমাদের আমাদের পথ বলে দিয়েছেন? তোমরা আমাদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছ, তার জন্য আমরা ধৈর্যধারণ করব। ভরসাকারীদের কেবল আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।' (সূরা ইবরাহিম : ১২)

অন্যদিকে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল না করা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। তারা ভাবে—উন্নতি-অবনতি সবকিছু কেবলই মেধা, পরিশ্রম ও অর্থ-সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। এই জন্য তারা দুনিয়ার উপকরণগুলোকে সমস্ত কিছুর মূল বিবেচনা করে, এগুলো অর্জন করাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মনে করে। ফলে তারা জ্বলন্ত সত্যকে অস্বীকার করে এবং যাবতীয় অবৈধ ও জুলুম-নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশে বলেন—

وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ-

> 'ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের ধনভান্ডার তো আল্লাহরই; কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না।' (সূরা মুনাফিকুন : ৭)

তাওয়াক্কুল নবিদের বৈশিষ্ট্য : তাওয়াক্কুল নবিগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক নবিই আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। আর যে বৈশিষ্ট্যটি সমস্ত নবির চরিত্রের অংশ ছিল, তা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। এবার কয়েকজন উল্লেখযোগ্য আম্বিয়ায়ে কেরামের তাওয়াক্কুলের নিদর্শন দেখে নেওয়া যাক—

নুহ (আ.)-এর তাওয়াক্কুল : নুহ (আ.) তাঁর জনপদের অধিবাসীদের দীর্ঘ সাড়ে নয়শো বছর ধরে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহ্বান করেছিলেন; কিন্তু মাত্র ৮০ জন ব্যক্তি ছাড়া কেউ-ই তাঁর এই ডাকে সাড়া দেয়নি। উলটো তারা এই দাওয়াতকে নিজেদের জন্য খুবই অসহ্য ও বিরক্তিকর বলে প্রকাশ করেছিল; ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। এই ষড়যন্ত্রের জবাবে তিনি নিজ জাতির লোকজনদের তাওয়াক্কুলের সাহসী বাণী উচ্চারণ করেছিলেন—

يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ-

Scanned by CamScanner

'হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি আর আল্লাহর আয়াতসমূহ দ্বারা তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ দান যদি তোমাদের কাছে অসহ্য মনে হয় (তাতে আমার কোনো পরোয়া নেই)। কারণ, আমি ভরসা করি আল্লাহর ওপর। (সূরা ইউনুস : ৭১)

হুদ (আ.)-এর তাওয়াক্কুল : আদ জাতি পৌত্তলিকতা ও কাল্পনিক দেবতার পূজায় মত্ত ছিল। তাদের শোধরানোর জন্য আল্লাহ হুদ (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। হুদ (আ.) তাঁর জাতিকে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহ্বান করে সমস্ত মিথ্যা উপাস্য পরিত্যাগ করতে বললেন। কিন্তু তাঁর জাতি এই আহ্বান নাকচ করে উলটো বলা শুরু করল—'তোমার ওপর দেবতাদের গজব পড়ুক!' জবাবে হুদ (আ.) তাওয়াক্কুলের নিদর্শন স্থাপন করে বললেন—

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ-

'তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে যা করার করো, তাতে কোনো ত্রুটি রেখ না এবং আমাকে একটু ছাড়ও দিয়ো না।' (সূরা হুদ : ৫৫)

اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا-

'আমি আল্লাহর ওপর নিশ্চিত ভরসা করেছি, যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই—যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়।' (সূরা হুদ : ৫৬)

ইবরাহিম (আ.)-এর তাওয়াক্কুল : মুসলিম জাতির পিতা সাইয়্যিদুনা ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের জন্য ইতিহাসের উজ্জ্বলতম তারকা। কঠিন মুসিবতের মাঝে অবস্থান করেও তিনি ছিলেন আল্লাহর আস্থায় অনড়। যুবক বয়সেই তিনি গ্রহ-নক্ষত্র ও মূর্তিপূজারি নিজ জাতিকে দীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন—

Scanned by CamScanner

اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ-

'তিনি তাঁর কওমকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন—"তোমাদের সঙ্গে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত করো, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করছি। আমাদের আর তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেছে (এবং তা চলতেই থাকবে), যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো।"' (সূরা মুমতাহিনা : ৪)

তাওহিদের এই স্পষ্ট ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ওপর যে পাহাড়সম বিপদ অপেক্ষমাণ ছিল, তা তিনি ভালো করেই জানতেন। কিন্তু সেসব থোড়াই পরোয়া করে আসন্ন মুসিবত মোকাবিলার জন্য নিশ্চিত মনে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করেছিলেন তিনি। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছিলেন—

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ-

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই ওপর ভরসা করছি, তোমারই দিকে মুখ ফিরিয়েছি এবং তোমার নিকটেই আমাদের ফিরে আসতে হবে।' (সূরা মুমতাহিনা : ৪)

তাওহিদের এই দৃপ্ত ঘোষণার ফলে ইবরাহিম (আ.)-এর জাতি তাঁকে বিশাল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত করল। পুরো জাতি; এমনকী নিজ পিতাও তাঁর বিরুদ্ধে; সামনে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড, পেছনে শাস্তিদানের প্রতীক্ষায় স্লোগানরত বিরুদ্ধ শক্তি; এমন কঠিন মুসিবতের সময় আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত সাইয়্যিদুনা ইবরাহিম (আ.) বলেছিলেন—

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ-

'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম অভিভাবক।' (সূরা আলে ইমরান : ১৭৩)

Scanned by CamScanner

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত—

‘حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ’ বাক্যটি ইবরাহিম (আ.) বলেছিলেন, যখন তিনি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। আর মুহাম্মাদ ﷺ ও এ কথা বলেছিলেন, লোকেরা যখন তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল—“তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো।” কিন্তু তাদের এ কথাটি মুমিনদের ঈমানকে আরও দৃঢ়তর করেছিল। আর তাঁরাও নবিজির মতো করে বলেছিলেন—“আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।”’[১৬]

ইউসুফ (আ.)-এর তাওয়াক্কুল : আল্লাহর নবি ইউসুফ (আ.) জীবনব্যাপী বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। ছোটোকালে ভাইদের ষড়যন্ত্রের কারণে বাবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মিশরে দাস হিসেবে বিক্রি হয়েছেন। যুবক বয়সে প্রভাবশালী নারীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মিথ্যা অপবাদে দীর্ঘকাল বন্দি থেকেছেন অন্ধকার কারাগারে। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সেই কঠিন দিনেও তিনি আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থা থেকে একচুল স্থানচ্যুত হননি; বরং আল্লাহর কাছে দুআ মেঙেছেন—

فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيِّيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ-

‘হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা! দুনিয়ায় ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক। ইসলামের ওপর আমাকে মৃত্যু দান করুন এবং পরিণামে আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন।’ (সূরা ইউসুফ : ১০১)

শোয়াইব (আ.)-এর তাওয়াক্কুল : শোয়াইব (আ.)-এর জাতি মাদায়েনবাসী ছিল জোচ্চুরিতে অভ্যস্ত। তারা ওজনে কম দিয়ে মানুষ ঠকাত। মনে করত, ওজনে সঠিক দেওয়া হলে তাদের ব্যবসায় ক্ষতি হবে। ফলে জীবন নির্বাহ করার ক্ষেত্রে তারা সমস্যায় পতিত হবে। শোয়াইব (আ.) দীর্ঘদিন ধরে নিজ জাতিকে শোধরানোর চেষ্টা করলেন।

---

[১৬] বুখারি : ৪৫৬৩

Scanned by CamScanner

বললেন—'আল্লাহর আনুগত্য মেনে নিয়ে তোমরা ওজনে সঠিক পরিমাপ দাও। এতে তোমাদের রিজিকে কোনো সমস্যা তো হবেই না; বরং অফুরন্ত বারাকাহ হবে। কারণ, রিজিকের ভান্ডার আল্লাহর হাতে। আর আমি আমার রবের পক্ষে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছি। তোমাদের মতো অবাধ রোজগারের সাথে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই, অথচ—

وَرَزَقَنِىۡ مِنۡهُ رِزۡقًا حَسَنًا-

"তিনি আমাকে উত্তম রিজিক দান করেন।"' (সূরা হুদ : ৮৮)

কিন্তু মাদায়েনবাসী তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে উলটো বিদ্রুপ শুরু করল। এমন পরিস্থিতিতে শোয়াইব (আ.)-এর ভাষ্য ছিল—

اِنۡ اُرِيۡدُ اِلَّا الۡاِصۡلَاحَ مَا اسۡتَطَعۡتُ ؕ وَمَا تَوۡفِيۡقِىۡۤ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَاِلَيۡهِ اُنِيۡبُ-

'আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আমার কাজের সাফল্য তো আল্লাহরই পক্ষ হতে আসে। আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তাঁরই নিকট ফিরে যাই।' (সূরা হুদ : ৮৮)

মুসা (আ.)-এর তাওয়াক্কুল : মুসা (আ.) দুর্দণ্ড প্রতাপশালী ফেরাউনের সামনে এক আল্লাহর গোলামির দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বনি ইসরাইলকে মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন শত বছরের গোলামির জিঞ্জির থেকে। এর অনিবার্য পরিণামে তাঁর ও বনি ইসরাইলের ওপর নেমে এসেছিল রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন ও হত্যার ষড়যন্ত্র। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে মুসা (আ.) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন—

يٰقَوۡمِ اِنۡ كُنۡتُمۡ اٰمَنۡتُمۡ بِاللّٰهِ فَعَلَيۡهِ تَوَكَّلُوۡۤا اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّسۡلِمِيۡنَ-

'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকো, তবে তাঁরই ওপর ভরসা করো; যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও।' (সূরা ইউনুস : ৮৪)

Scanned by CamScanner

উত্তরে তারা বলেছিল—

عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ - وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

'আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জালিমদের শিকারে পরিণত করো না। আর অনুগ্রহ করে এই কাফিরদের কবল থেকে আমাদের মুক্তি দাও।' (সূরা ইউনুস : ৮৫-৮৬)

অতঃপর কিবতিদের দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য মুসা (আ.) নিজ জাতিকে নিয়ে জেরুজালেমের দিকে যাত্রা করলেন। এই সংবাদ পেয়ে ফেরাউনও সৈন্যসামন্ত নিয়ে ধাওয়া করল তাদের পিছু পিছু। মুসা (আ.)সহ বনি ইসরাইলকে ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়াই লক্ষ্য তার। সদলবলে মুসা (আ.) যখন লোহিত সাগরের তীরবর্তী হলেন, তখন দেখা গেল ফেরাউনের সৈন্যবাহিনী প্রায় তাদের নিকটবর্তী। সামনে বিশাল সমুদ্র, পেছনে ফেরাউনের সশস্ত্র সৈন্যদল। বনি ইসরাইল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল। বাঁচার মতো কোনো স্বপ্নই তাদের অবশিষ্ট রইল না। উৎকণ্ঠা মিশ্রিত কণ্ঠে তারা বলল—'আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম!' কিন্তু আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের শ্রেষ্ঠ উপমা প্রদর্শন করে মুসা (আ.) বলে উঠলেন—

كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ -

'কক্ষনো না! নিশ্চয় আমার সাথে আছেন আমার রব; তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।' (সূরা শুআরা : ৬২)

মুসা (আ.)-এর তাওয়াক্কুলের এই শক্তিতে খুশি হয়ে আল্লাহ তায়ালা বললেন—

اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ -

'সাগরের বুকে তোমার লাঠি দিয়ে আঘাত করো। (মুসা আ. তা-ই করল) সহসাই সাগর বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং তার প্রত্যেকটি টুকরা হয়ে গেল এককেটি বিশাল পাহাড়ের মতো।' (সূরা শুআরা : ৬৩)

Scanned by CamScanner

সাগরের মাঝখান দিয়ে তৈরি হলো প্রশস্ত রাস্তা। সেই পথ দিয়ে হারুন (আ.)সহ বনি ইসরাইল নিরাপদে ওপারে চলে গেলেন। এরপর পার হয়ে গেলেন মুসা (আ.)। আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসার চাক্ষুষ ফলাফল অবলোকন করল লক্ষাধিক বনি ইসরাইল, ফেরাউন ও তার চ্যালাচামুণ্ডা। অক্ষত রইল মুসা ও হারুন (আ.)সহ বনি ইসরাইলের সবাই। আর লোহিত সাগরে ডুবে মরল আল্লাহদ্রোহী পাপিষ্ঠের দল।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর তাওয়াক্কুল : আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ-কে বলেছেন—

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ-

'অতঃপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করুন।' (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

নবিজি সর্বোচ্চ তাওয়াক্কুল অবলম্বনকারী ছিলেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল তাওয়াক্কুলের রঙে রঙিন। তাওয়াক্কুলের বলে বলীয়ান হয়েই তিনি মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে পালটে দিয়েছিলেন বস্তুপূজারি পৌত্তলিকদের পুরো সমাজব্যবস্থাকে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও তাওয়াক্কুল থেকে একবিন্দু টলে পড়েননি তিনি।

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্জনে একটি গাছের ছায়ায় শুয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। এক দুশমন সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর গর্দান লক্ষ করে শাণিত তরবারি তুলে ধরল। হুংকার দিয়ে বলল—'মুহাম্মাদ! আমার হাত থেকে এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে?' বিশ্বনবি সেই তরবারির নিচ থেকে দ্ব্যর্থ কণ্ঠে বললেন—'আল্লাহ!' এই শব্দে ঘাতকের দেহ থরথর করে কেঁপে উঠল। তরবারি খসে পড়ল তার হাত থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তৎক্ষণাৎ সেই তরবারিটি নিজ হাতে তুলে নিলেন। বললেন—'এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে?' লোকটি বলল—'যিনি মুহূর্তের মধ্যে আমার হাতের তরবারি আপনার হাতে তুলে দিলেন, তিনিই।' এরপর সেই ব্যক্তি কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন।[১৭]

হিজরতের দিন আবু বকর (রা.)সহ রাসূল ﷺ সাওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিলেন। কাফিররা তাঁদের পাকড়াও করার জন্য খুঁজতে খুঁজতে

[১৭]. *সিরাত ইবনে হিশাম* : আবু মুহাম্মাদ আবদ আল মালিক ইবনে হিশাম

Scanned by CamScanner

গুহার মুখের নিকট চলে এলো। আবু বকর (রা.) ভাবলেন—এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম। শঙ্কিত কণ্ঠে নবিজিকে বললেন—'হে আল্লাহর নবি! তাদের কেউ যদি শুধু নিজের পায়ের দিকে তাকায়, তাহলেই আমাদের দেখে ফেলবে।' রাসূল ﷺ আবু বকর (রা.)-কে অভয় দিয়ে বললেন—

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا-

'ভয় পেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন!' (সূরা তাওবা : ৪০)

শত্রুকে মাথার ওপর রেখে তাওয়াক্কুলের এমন দৃঢ়চিত্ত ঘোষণা দেওয়া মুখের কথা নয়। তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছলেই কেবল এমন স্থির ও দৃঢ় মনোবল প্রকাশ করা যায়। তা ছাড়া হিজরত শেষে মদিনায় এসে এক বছরের মাথায় বদরের প্রান্তরে মাত্র ৩১৩ জন মুসলিম সৈন্য নিয়ে সহস্রাধিক কাফিরের সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া, খন্দকের যুদ্ধে মাত্র ৩ হাজার সৈন্য নিয়ে প্রচণ্ড শীতের মৌসুমে অস্ত্রসজ্জিত ১০ হাজার সৈন্যের মোকাবিলায় পরিখা খনন করে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, নবম হিজরিতে তৎকালীন পরাশক্তি রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাবুকে দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা—এর সবই আল্লাহর ওপর তাঁর মজবুত তাওয়াক্কুলেরই সাক্ষ্য বহন করে।

তাওয়াক্কুল সাহাবিদের বৈশিষ্ট্য : সাহাবিগণ আল্লাহর রাসূলের পদাঙ্ক হুবহু অনুসরণ করেছেন। তাই তাঁদের তাওয়াক্কুলও ছিল উঁচু স্তরের। তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে রাসূল ﷺ সবাইকে বেশি বেশি দান-সাদাকা করার নির্দেশ দিলেন। সবাই যার যার সাধ্যানুযায়ী দান করলেন। কেউ দান করলেন তাদের সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ, কেউ দান করলেন অর্ধেক। আর আবু বকর (রা.) নিয়ে এলেন তাঁর সম্পদ সবটুকু। নবিজি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

'হে আবু বকর! তোমার পরিবার-পরিজনদের জন্য কী রেখে এসেছ?' তিনি নির্দ্বিধায় উত্তর দিলেন—'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে।' (তিরমিজি : ৩৬৭৫)

অষ্টম হিজরিতে মুতার প্রান্তরের অসম যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যবাহিনী সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলো। উন্নত সমরাস্ত্রে সজ্জিত রোমানদের দুই লাখ

Scanned by CamScanner

সৈন্যের মোকাবিলায় মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা মাত্র ৩ হাজার। মদিনা থেকে এত দূরে কী করে এই যুদ্ধ মোকাবিলা সম্ভব! এটা ছিল জাজিরাতুল আরবের সীমানার বাইরে মুসলিমদের প্রথম অভিযান। বিস্মিত মুসলিম বাহিনী দুই রাত ধরে পরামর্শ করলেন। কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করলেন—রাসূল ﷺ-কে চিঠি লিখে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হোক। এরপর তিনি হয়তো বাড়তি সৈন্য পাঠাবেন অথবা অন্য কোনো নির্দেশনা দেবেন।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) দৃঢ়তার সাথে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। বললেন—'হে লোকসকল! তোমরা যা এড়াতে চাইছ, তা তো সেই শাহাদাত, যার জন্য আমরা বেরিয়েছি। স্মরণ রাখবে—শত্রুদের সাথে আমাদের মোকাবিলার মাপকাঠি সৈন্যদল, শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের নিরিখে বিচার্য নয়। আমরা তো সেই দ্বীনের জন্যই লড়াই করি, যে দ্বীন দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের গৌরবান্বিত করেছেন। কাজেই সম্মুখপানে এগিয়ে চলো। আমরা দুটি কল্যাণের মধ্যে অবশ্যই একটি লাভ করব। হয় জয়লাভ করব, নয়তো শাহাদাতের মর্যাদা।'

অবশেষে তাঁরা মহান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হয়েছিলেন। জায়েদ ইবনে হারেসা, জাফর ইবনে আবু তালিব ও আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.)—এ তিনজন সেনাপতিই বীরদর্পে লড়াই করতে করতে পান করেছিলেন শাহাদাতের অমিয় সুধা।[১৮]

তাওয়াক্কুলের ধরন

সাধারণভাবে তাওয়াক্কুল দুই ধরনের হয়ে থাকে :

- কর্মহীন তাওয়াক্কুল
- কর্মসহ তাওয়াক্কুল

কর্মহীন তাওয়াক্কুল : তাওয়াক্কুলের প্রথম ধরন হলো—কোনো প্রকার কাজকর্ম এবং জাগতিক উপায়-উপকরণ গ্রহণ না করে শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ব্যাপারটা যেন অনেকটা এমন যে, তারা কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে

[১৮]. *সিরাত ইবনে হিশাম* : আবু মুহাম্মাদ আবদ আল মালিক ইবনে হিশাম

Scanned by CamScanner

শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করবে, আর আল্লাহ তাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন। এমনকী অসুস্থ হলে চিকিৎসা গ্রহণকেও তাওয়াক্কুলবিরোধী মনে করে তাদের কেউ কেউ। এই ধরনের তাওয়াক্কুলকারীরা দলিল হিসেবে কুরআন-হাদিসের কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেন। উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

> 'তোমরা যদি প্রকৃতার্থেই আল্লাহর ওপর ভরসা করো, তবে তিনি পাখিদের মতোই তোমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যুষে পাখিরা খালি পেটে বেরিয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় নীড়ে ফেরে ভরা পেটে।' (তিরমিজি : ২৩৪৪)

একই ভাষ্য কুরআনের কিছু আয়াতেও প্রতিফলিত হয়েছে—

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ-

'আর পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাণী নেই—যার জীবিকার ভার আল্লাহর ওপর ন্যস্ত নয়; আর তিনিই জানেন তার বাসস্থান ও তার বিশ্রামস্থল। সবই আছে এক সুস্পষ্ট গ্রন্থে।' (সূরা হুদ : ০৬)

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ রিজিকদাতা। তিনি শক্তির আধার, মহাপরাক্রমশালী।' (সূরা জারিয়াত : ৫৮)

وَكَأَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-

'কত জীব-জানোয়ার আছে, যারা নিজেদের জীবিকা বহন করে না; আল্লাহই তাদের জীবিকা দেন এবং তোমাদের জীবিকাদাতাও তিনিই। তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।' (সূরা আনকাবুত : ৬০)

وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ- فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ-

Scanned by CamScanner

> 'আসমানেই রয়েছে তোমাদের রিজিক এবং সে জিনিসও, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হচ্ছে। তাই আসমান ও জমিনের মালিকের শপথ, এ কথা সত্য এবং তেমনই নিশ্চিত, যেমন তোমরা কথা বলছ।' (সূরা জারিয়াত : ২২-২৩)

উপরিউক্ত হাদিস ও আয়াতের মূল বক্তব্য হলো—মানুষের রিজিক কেবল আল্লাহই দিয়ে থাকেন। এটাই ঈমানের অন্যতম মৌলিক সাক্ষ্য। একজন মুমিন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করবেন—মানুষের যাবতীয় রিজিক তথা খাওয়া-পরা, অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান-গরিমা, ক্ষমতা-সম্মান—সবকিছুই আসে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে। কিন্তু তিনি এ সমস্ত নিয়ামত মানুষকে দেন একটি নিয়ম মেনে। আর এই নিয়ম তিনি নিজেই নিজের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছেন। সেটি হলো—

لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ-

> 'মানুষ যা চেষ্টা-সাধনা করে, তা ছাড়া তার আর কিছুই প্রাপ্য নেই।' (সূরা নাজম : ৩৯)

তাই আল্লাহর নির্ধারিত রিজিক পেতে হলে সাধনা ও জাগতিক উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা জরুরি। ওপরে বর্ণিত উমর (রা.)-এর হাদিসটিও এই কথার সাক্ষ্য দেয়। সেখানে বলা হয়েছে—পাখিরা সকালে আল্লাহর ওপর ভরসা করে খালি পেটে বেরিয়ে যায়। অর্থাৎ তারা কর্মে আত্মনিয়োগ করে। পাখিরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকে না; বরং নিজেদের সক্ষমতার সর্বোচ্চটা দিয়ে নেমে পড়ে খাবারের সন্ধানে। পাখিদের এই ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের কারণেই আল্লাহ তাদের খাবার জুটিয়ে দেন।

উপরোল্লেখিত হাদিসটিতে পাখিকে তাওয়াক্কুলের মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেটি কেমন? সেটি হচ্ছে—পাখিরা কর্ম ও তাওয়াক্কুলের মধ্যে সমন্বয় করে। অর্থাৎ, তারা শুধু কর্মের ওপর নির্ভর করে না, আবার আল্লাহর ওপর ভরসা করে কর্মবিমুখও থাকে না; বরং রোজ সকালে আল্লাহর ওপর ভরসা করে কিচিরমিচির কলরবে রিজিকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। সারাদিন খাদ্যের সন্ধানে উড়ে বেড়ায় দিগ্‌বিদিক। বেলা শেষে উদরপূর্তি করে রবই তাদের নীড়ে ফেরায়। সুতরাং মুমিনের কর্তব্য হলো—পাখির মতো

Scanned by CamScanner

নিজের সক্ষমতার সর্বোচ্চটা দিয়ে কর্ম ও প্রচেষ্টা জারি রেখে ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করা। তাহলেই আল্লাহ তায়ালা পাখির মতো তাদেরও রিজিকের ব্যবস্থা করে দেবেন।

কর্মহীন তাওয়াক্কুলকারীরা ইবরাহিম (আ.)-এর তাওয়াক্কুলকেও উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের প্রাক্কালে জিবরাইল (আ.) এসে ইবরাহিম (আ.)-কে বলেছিলেন—'আপনার কোনো চাওয়া থাকলে আমায় বলুন!' জবাবে তিনি বলেছিলেন—'চাওয়ার অর্থ যদি হয় আপনার নিকট প্রত্যাশা, তাহলে আমার চাওয়ার কিছু নেই। আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই উত্তম কার্যনির্বাহক।'

তারা বলেন—'এখানে ইবরাহিম আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ছাড়া আর কোনো বাহ্যিক উপকরণ গ্রহণ করেননি। তাই খাঁটি তাওয়াক্কুল হবে বাহ্যিক উপায় অবলম্বন ছাড়া কেবলই আল্লাহর ওপর।'

বস্তুত এই ঘটনায় ইবরাহিম (আ.) কোনো উপায়-উপকরণ অবলম্বনকে নাকচ করেননি; বরং তিনি নাকচ করেছেন আল্লাহর নিকট নিজের প্রয়োজন জানানোর জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে অন্য কাউকে গ্রহণ করাকে। জিবরাইল (আ.) তাঁর নিকট এসে বললেন—'কোনো চাওয়া থাকলে আমাকে বলুন। আমি তা আল্লাহর নিকট পৌঁছে দিচ্ছি।' ইবরাহিম (আ.) অকুণ্ঠচিত্তে জানিয়ে দিলেন—'আল্লাহর নিকট আমার প্রয়োজন জানানোর জন্য বা কিছু চাওয়ার জন্য মাধ্যম হিসেবে আপনাকে প্রয়োজন নেই; বরং এ মুহূর্তে আমার কী প্রয়োজন, সেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভালো করেই জানেন এবং তা পূরণে তিনিই যথেষ্ট।'

তা ছাড়া ইবরাহিম (আ.)-এর নিকট তখন বাহ্যিক কোনো উপায়-উপকরণও অবশিষ্ট ছিল না, যা তিনি গ্রহণ করবেন। কেবলই আল্লাহর ওপর ভরসা ছাড়া তাঁর আর কিছুই করার ছিল না। তাই ইবরাহিম (আ.)-এর ঘটনাকে কর্মবিহীন তাওয়াক্কুলের দলিল হিসেবে গ্রহণ করা মোটেও সঠিক নয়।

এই ধরনের তাওয়াক্কুলকে রাসূল ﷺ ও তাঁর বিজ্ঞ সাহাবিগণ নিরুৎসাহিত করেছেন। কারণ, এই পদ্ধতি সমস্ত নবি-রাসূলের কর্মনীতিবিরোধী। প্রত্যেক নবি-রাসূলই জীবিকার জন্য কাজ করেছেন।

Scanned by CamScanner

আদম, শিস, লুত ও ইউনুস (আ.) কৃষিকাজ করতেন।[১৯] ইদরিস (আ.)-এর পেশা ছিল কাপড় সেলাই করা। নুহ ও জাকারিয়া (আ.) নবুয়তি মিশনের পাশাপাশি কাঠমিস্ত্রির কাজও করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়াতে আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'জাকারিয়া (আ.) কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন। শত্রুরা তাঁর করাত দিয়েই দ্বিখণ্ডিত করেছে তাঁকে।'[২০]

ইবরাহিম (আ.) জীবিকা নির্বাহের জন্য কখনো ব্যাবসা, আবার কখনো পশুপালন করতেন। ইয়াকুব (আ.)-এর পেশা ছিল ব্যাবসা, কৃষিকাজ ও পশুপালন। ইউসুফ (আ.) রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বেতন হিসেবে রাষ্ট্রীয় অর্থ গ্রহণ করতেন।[২১] দাউদ (আ.) ছিলেন বাদশাহ ও নবি। নিজ হাতে তিনি যুদ্ধাস্ত্র, লৌহবর্ম ও পোশাক প্রস্তুত করতেন। এগুলো বিক্রি করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন তিনি।[২২]

হুদ, সালেহ, ইসমাইল, শোয়াইব, মুসা, হারুন, আইয়ুব, ইলিয়াস, জুলকিফল ও ইয়াসা (আ.)-এর পেশা ছিল পশুপালন। তাঁরা পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

বিশ্বনবি ﷺ ছিলেন একজন সফল ও সৎ ব্যবসায়ী। তিনি যুবক বয়সে খাদিজা (রা.)-এর ব্যাবসা পরিচালনা করে উপার্জন করেছেন। ইরশাদ করেছেন—

> 'সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীদের হাশর হবে নবি, সিদ্দিক ও শহিদদের সঙ্গে।'[২৩]

এ ছাড়াও তিনি বালক বয়সে পশুচারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন— 'কয়েক কিরাতের বিনিময়ে আমি মক্কাবাসীর ছাগল চরিয়েছি।' পরিশ্রম ছিল তাঁর ব্যক্তিসত্তার অন্যতম আকর্ষণীয় একটি গুণ। তিনি মসজিদে নববি নির্মাণকালে শ্রমিকের মতো কাজ করেছেন, খন্দকের যুদ্ধে মাটি কেটেছেন, বাজার থেকে মাঝে মাঝে নিজেই ক্রয় করেছেন প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী।

---

[১৯] *তাফসিরে ইবনে কাসির*

[২০] মুসলিম : ২৩৭৯

[২১] সূরা : ইউসুফ : ১০১

[২২] বুখারি, ব্যাবসা অধ্যায়

[২৩] তিরমিজি : ১২০৯; *আদ-দুররুল মানসুর* : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.-২২০

Scanned by CamScanner

ফলে এ ব্যাপারটি স্বচ্ছ কাচের ন্যায় পরিষ্কার যে, এ পৃথিবীতে নবি-রাসূলগণ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ তাওয়াক্কুলকারী। তাঁরা প্রত্যেকেই জীবনযাপনের জন্য কর্ম করেছেন এবং বিভিন্ন বৈষয়িক উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেছেন। সুতরাং তাওয়াক্কুলের নামে কর্মহীন জীবনযাপনের সুযোগ ইসলামে নেই।

কর্মসহ তাওয়াক্কুল : তাওয়াক্কুলের দ্বিতীয় ধরন হলো—কর্মসহ তাওয়াক্কুল। এটিই তাওয়াক্কুলের ইসলামসম্মত পদ্ধতি, যা সমস্ত নবি-রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফগণ অনুসরণ করেছেন। অপারগতা ও অলসতার নাম তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর ভরসা নয়। অনেকে নিজেদের অপারগতা, দুর্বলতা, কর্মহীনতা ও অলসতাকে তাওয়াক্কুল বানিয়ে নিয়েছে। অথচ যাবতীয় অপারগতা, দুর্বলতা ও অলসতা থেকে রাসূল ﷺ সব সময় আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন। আল্লাহর কাছে দুর্বল ঈমানদারের চেয়ে শক্তিশালী ঈমানদার শ্রেষ্ঠতর এবং অধিক প্রিয়।[২৪] মূলত তাওয়াক্কুল হলো—

- পরিকল্পনা প্রণয়ন
- বাস্তবায়নের উপায় বের করা
- প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং
- ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর নির্ভর করা

তাওয়াক্কুলের ইসলামি পন্থা

ক. আগে কাজ পরে তাওয়াক্কুল : প্রথমে আমরা নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিয়োগ করব, তারপর ফলাফলের জন্য তাওয়াক্কুল করব আল্লাহর ওপর। Tawakkul is always your second step, The first step is your effort.

আনাস (রা.) বর্ণনা করেন—

> 'এক ব্যক্তি বলল—"হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি উট বেঁধে আল্লাহর ওপর ভরসা করব, নাকি না বেঁধেই ভরসা করব?" নবিজি বললেন—"উট বেঁধে নাও, তারপর আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করো।"' (তিরমিজি : ২৫১৭)

---

[২৪] ইবনে মাজাহ : ৪১৬৮

Scanned by CamScanner

খ. কাজের প্রতি উৎসাহ : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জীবিকা নির্বাহের জন্য জমিনে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করতে বলেছেন—

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

'অতঃপর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।' (সূরা জুমুআ : ১০)

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِه ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ-

'তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। অতএব, তোমরা তাতে বিচরণ করো এবং তাঁর দেওয়া রিজিক আহার করো। তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।' (সূরা মুলক : ১৫)

আরও বলা হয়েছে—

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ-

'তোমাদের ওপর পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণে কোনো পাপ নেই।' (সূরা বাকারা : ১৯৮)

কেউ যদি শুধু তাওয়াক্কুল করে হাত গুটিয়ে বসে থাকে, তবে স্বাভাবিকভাবেই তাকে খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য কারও না কারও ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। কেউ না কেউ তার খাবার বা মৌলিক চাহিদার ব্যবস্থা করে দেবে। ফলে ব্যক্তি তখন অন্যের অনুগ্রহ বা অনুকম্পার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। আর মৌলিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া ইসলাম অপছন্দ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

'মানুষের জন্য তার নিজের হাতে উপার্জন করা খাদ্য সর্বোত্তম।' (ইবনে মাজাহ : ২১৩৮)

'হালাল রুজি অর্জনের অন্বেষণ করা ফরজের পর একটি ফরজ।' (ফাতহুল কাবির ফি জাম্মিজ জিয়াদাতি ইলাল জামিউ : ৭৫০৭)

Scanned by CamScanner

'সৎ পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জিত খাদ্যই যেকোনো লোকের পবিত্রতম বা সর্বোত্তম হালাল খাদ্য।' (আত-তারগিব ওয়াত তারহিব : ৪/৩)

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন—

'যার জমি আছে, সে যেন নিজেই তা চাষাবাদ করে। যদি নিজে চাষ না করতে পারে, তবে (পতিত না রেখে) কোনো প্রতিদান ছাড়াই যেন অপর ভাইকে তা দান করে।' (বুখারি : ২৩৪১)

তাওয়াক্কুলের ভুল ব্যাখ্যা করে কেউ যেন তার সন্তানদের অর্থহীন বা অসচ্ছল রেখে মৃত্যুবরণ না করে, সেজন্য রাসূল ﷺ বলেন—

'তোমার ওয়ারিশদের অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া, তাদের খালি হাতে অন্যের ওপর নির্ভরশীল অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম।' (বুখারি : ১২৯৫)

কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব এতটাই বেশি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

'তোমাদের কারও হাতে যদি একটি চারাগাছ থাকে এবং সেই মুহূর্তে কিয়ামত আরম্ভ হয়ে যায়, সম্ভব হলে সে যেন তা পুঁতে দেয়।' (আদাবুল মুফরাদ : ৪৭৯)

কর্মের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এই সব নির্দেশনা এবং শিক্ষা তাঁর সাহাবিগণ পুঙ্খানুপুঙ্খ মেনে চলতেন। বিশেষ কারণ ব্যতীত জীবিকার জন্য তাঁরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কেউ কৃষিকাজ করতেন, কেউ-বা করতেন ব্যাবসা-বাণিজ্য। আবু বকর সিদ্দিক, উসমান ইবনে আফফান, আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও তালহা ইবনে জোবায়ের (রা.)—সকলেই বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন।

আবু বকর (রা.) সম্পর্কে আবু তালিব আল মাক্কি (রহ.) বলেন—

'আবু বকর সিদ্দিক (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর জনগণ তাঁর বাজারে যাওয়াকে (ব্যবসায়ের জন্য) অপছন্দ করল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বললেন—"তোমরা আমাকে পরিবারের জন্য জীবিকা অন্বেষণে বাধা দিয়ো না। আমি যদি তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে না পারি, তাহলে

Scanned by CamScanner

অন্যদের দায়িত্ব পালনে অবশ্যই অবহেলা হবে।" তখন সবাই মিলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাঁর জন্য ভাতা নির্ধারণ করলেন, যা তাঁর পরিজনদের জন্য যথেষ্ট হয়। সেটা একেবারে কমও নয়, আবার বেশিও নয়।'[২৫]

সালাফগণও তাওয়াক্কুলের অংশ হিসেবে কাজকর্ম করতেন। ইবনুল জাওজি (রহ.) বলেন—

'ইবরাহিম বিন আদহাম (রহ.) কৃষিকাজ করতেন এবং হুজাইফা মিরআশি (রহ.) ইট তৈরি করতেন।'[২৬]

আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন—

'আমি আমার সন্তানদের বলেছি, তারা যেন বাজারে যায় এবং ব্যবসায় অংশগ্রহণ করে।'[২৭]

ইমাম রাগিব ইস্পাহানি বলেছেন—

'যে ব্যক্তি বেকার ও কর্মহীন থাকল, সে যেন নিজেকে মানুষের তালিকা থেকেই আলাদা করে ফেলল; বরং প্রাণিজগৎ থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করল।'[২৮]

গ. সতর্কতা অবলম্বন : সতর্কতা অবলম্বন এবং জাগতিক উপায় অবলম্বন করা যে তাওয়াক্কুল পরিপন্থি নয়, পূর্ববর্তী নবি-রাসূলগণের কর্মনীতি থেকে সেটা সুস্পষ্ট।

ইয়াকুব (আ.)-এর ১০ পুত্র যখন খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য মিশরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল, তখন তিনি পুত্রদের নির্দেশ দিয়েছিলেন—তারা যেন মিশরের রাজধানীতে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে। এতে তারা মানুষের কুদৃষ্টি, অযাচিত সন্দেহ ও ভুল বোঝাবুঝি থেকে সুরক্ষিত থাকবে। কুরআনে তাঁর সেই উপদেশ উদ্ধৃত হয়েছে—

---

[২৫] আবু তালিব মাক্কি প্রণীত *কুতুল কুলুব* : ১৭/২

[২৬] ইবনুল জাওজি, *তালবিস* : পৃ.-২৮৫

[২৭] ইউসুফ আল কারজাভি, *আত-তাওয়াক্কুল* : পৃ.-৫৫

[২৮] ইউসুফ আল কারজাভি, *আত-তাওয়াক্কুল* : পৃ.-৬১

Scanned by CamScanner

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَّمَا اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ-

'তারপর সে বলল—"হে আমার সন্তানরা! মিশরের রাজধানীতে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না; বরং বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারি না। তাঁর ছাড়া আর কারোর হুকুম চলে না, তাঁর ওপরই আমি ভরসা করি এবং যারা নির্ভর করতে চায়, তারা তাঁর ওপরই নির্ভর করুক।"' (সূরা ইউসুফ : ৬৭)

যুদ্ধের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-কে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে সামর্থ্যানুযায়ী সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا-

'হে ঈমানদারগণ ! (শত্রুদের) মোকাবিলার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করো। তারপর সুযোগ পেলে পৃথক পৃথক বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে অথবা একসঙ্গে বের হও।' (সূরা নিসা : ৭১)

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ-

'অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে নামাজ পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়।' (সূরা নিসা : ১০২)

বর্তমান সময়ে মুসলিমরা আশায় বুক বেঁধে বসে থাকে, আল্লাহ তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন; অথচ সেজন্য তাদের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, যুদ্ধের প্রস্তুতিজনিত অস্ত্রশস্ত্র এবং আনুষঙ্গিক জিনিসের কোনোই ব্যবস্থা বা উদ্যোগ নেই। এর নাম তাওয়াক্কুল হতে পারে না; বরং নিঃসন্দেহে এটি তাওয়াক্কুলের নামে প্রচ্ছন্ন ছলনা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন—

اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اللهُ يَعْلَمُهُمْ-

Scanned by CamScanner

‘আর তোমরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি ও সদা প্রস্তুত ঘোড়া তাদের মোকাবিলার জন্য জোগাড় করে রাখো। এর মাধ্যমে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, নিজের শত্রুকে এবং অন্য এমন সব শত্রুকে, যাদের তোমরা চেনো না। কিন্তু আল্লাহ চেনেন।’ (সূরা আনফাল : ৬০)

রাসূল ﷺ কাফিরদের সাথে প্রতিটি অসম যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাওয়াক্কুলের বলে শক্তিমান হয়ে। কিন্তু তিনি কেবল তাওয়াক্কুল করেই ক্ষান্ত থাকেননি; বরং সাধ্যানুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন, যুদ্ধ-পরিকল্পনা সাজিয়েছেন, তহবিল সংগ্রহ ও সৈন্য বিন্যাস করেছেন, দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়েছেন সাহাবিদের মাঝে। এ ছাড়া নিজের নিরাপত্তার জন্য উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুটি বর্ম পরিধান করেছিলেন।[২৯] হিজরতের সময় শত্রুদের দৃষ্টি এড়াতে আশ্রয় নিয়েছিলেন পাহাড়ের গুহায়। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহচরদের বলেছিলেন—‘আজ রাতে কে আমাকে পাহারা দেবে?’

তিনি অসুস্থ হলে চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতেন। ঘরের নিরাপত্তার স্বার্থে বন্ধ রাখতেন ঘরের দরজা। জাবের (রা.)-কে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন—

‘রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পানপাত্রের মুখ ঢেকে দেবে, ঘরের আলো নিভিয়ে দেবে এবং ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে।’ (মুসলিম : ২০১২)

ঘ. আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্তির প্রচেষ্টা : আন্তরিক প্রচেষ্টার পরেই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সাহায্য করেন। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ -

‘আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থা বদলান না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের বদলে ফেলে।’ (সূরা রা’দ : ১১)

আমাদের পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ ও রাসূল ﷺ-এর কর্মনীতিতেও আমরা এই বিষয়টি দেখতে পাই। ইউসুফ (আ.)-কে যখন জুলাইখা সাতটি দরজা দ্বারা সুরক্ষিত নিজের অন্দরমহলে ডেকে নিয়ে কুপ্রস্তাব করেছিল। তখন তরুণ ইউসুফ (আ.) এই পাপ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে

[২৯]. আবু দাউদ : ২৫৯০

Scanned by CamScanner

দৌড়ে স্থান ত্যাগ করেছিলেন। তিনি সাধ্যের মধ্যে সবটুকু চেষ্টা করেছিলেন। আর আল্লাহ তায়ালা নিজ কুদরত দিয়ে প্রত্যেকটি দরজা খুলে দিয়েছিলেন তাঁর জন্য।

মুসা (আ.) যখন বনি ইসরাইলকে নিয়ে লোহিত সাগরের তীরবর্তী হয়েছিলেন, তখনও তিনি বসে থাকেননি। আল্লাহর নির্দেশে সাগরের ওপর লাঠি দিয়ে আঘাত করেছেন। এর পরই আল্লাহ সাগর দ্বিখণ্ডিত করে রাস্তা তৈরি করে দিয়েছেন গোটা বনি ইসরাইল জাতির জন্য।

সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য মারইয়াম (আ.) জনপদ থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে খাদ্য সংকটে পড়েছিলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বলেছিলেন খেজুরগাছের কাণ্ড ধরে ঝাঁকুনি দিতে। এটাও তাঁর জন্য কর্ম ও প্রচেষ্টার অংশ ছিল। আল্লাহ তাঁকে বলেছিলেন—

وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا-

> ‘খেজুরগাছের কাণ্ড ধরে তোমার দিকে নাড়া দাও, ওটা তোমার সামনে সদ্যপক্ব তাজা খেজুর ফেলতে থাকবে।’ (সূরা মারইয়াম : ২৫)

তাহলে ওপরের প্রত্যেকটি ঘটনায় আমরা দেখলাম, আগে নবিগণ তাঁদের সর্বোচ্চ এফোর্ট দিয়েছেন, তারপর আসমানি মদদ পেয়েছেন। কেউ-ই কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি। ইউসুফ (আ.)-এর দৌড়, মুসা (আ.)-এর লাঠির আঘাত এবং মারইয়াম (আ.)-এর খেজুরের ডাল ধরে ঝাঁকুনি দেওয়া ছিল সেই সময়ে তাঁদের সাধ্যের সবটুকু। আর যখনই তাঁরা তাঁদের সাধ্যের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছেন, ঠিক তখনই আল্লাহ তায়ালার সাহায্য এসে সেখানে হাজির হয়েছে। এটাই যুগে যুগে আল্লাহর সুন্নাহ। চেষ্টা-প্রচেষ্টা হলো আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্তির পূর্বশর্ত।

প্রশ্নের জবাব

শুরুতে আমরা কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছিলাম। মনে আছে নিশ্চয়! এবার সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

Scanned by CamScanner

মূলত তাওয়াক্কুলের সাথে তাকদিরের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাওয়াক্কুল করার পর তার পার্থিব ফলাফল লাভ করব কি না, তা অনেকাংশেই তাকদিরের সাথে সম্পৃক্ত। তাওয়াক্কুল করার পর তার ফলাফল কখনো আমরা তাৎক্ষণিক পেতে পারি, আবার কখনো খাঁটি তাওয়াক্কুল করার পরও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নাও পেতে পারি। যদি তা-ই হয়, তবে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করব কেন? কী লাভ এতে?

মূলত তাওয়াক্কুল হচ্ছে একটি অবশ্যপালনীয় ইবাদত। বান্দা যে কাজই করুক না কেন, তাতে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা অত্যন্ত জরুরি। কেননা, এটাই মহান আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ। তাওয়াক্কুল করার পর ফলাফল যা-ই হোক না কেন, ব্যক্তি নির্ধারিত সওয়াব ঠিকই পাবে। আর ফলাফল হয় তার আকাঙ্ক্ষানুযায়ী পাবে, নয়তো সেটা জমা থাকবে আল্লাহর নিকট।

ইমাম ইবনুল জাওজি (রহ.) বলেন—

> 'যদি কোনো প্রশ্নকারী বলে—তাকদির তো পূর্বনির্ধারিত, তাহলে সর্তকতা অবলম্বনে লাভ কী? তার উত্তর হলো—যিনি তাকদির নির্ধারণ করেছেন, তাঁর নির্দেশনা এড়িয়ে যাওয়ারই-বা যুক্তি কী? যিনি তাকদির লিখেছেন, তিনিই আদেশ দিয়েছেন—"তোমরা সর্তকতা অবলম্বন করো।"' (সূরা নিসা : ১০২)

ইমাম ইবনুল জাওজি (রহ.) আরও বলেন—

> 'শয়তান এই ব্যাপারে অনেককেই ধোঁকায় ফেলে যে, কোনো উপায়-উপকরণ অবলম্বন করতে হবে না; এমনকী সে অনেককে এ কথা বোঝাতেও সক্ষম হয়, আল্লাহর ওপর ভরসা করা উপকরণ অবলম্বন করার সাথে সাংঘর্ষিক।'

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) আবদুল কাদির জিলানি (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন—

> 'নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি বিচক্ষণ নয়, যে তাকদিরের সামনে নিজেকে অসহায়ভাবে সমর্পণ করে। আর নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকদিরের মাধ্যমেই তাকদিরকে মোকাবিলা করে।'

সুতরাং তাকদিরের ওপর অসহায় আত্মসমর্পণ করা কোনো বুদ্ধিমান মুমিনের কাজ নয়। রাসূল ﷺ-এর তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল পৃথিবীর সবার

Scanned by CamScanner

চেয়ে বেশি থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন, অবলম্বন করতেন নানাবিধ কৌশল। ভাগ্যকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিতেন না কখনোই। এ দুনিয়ায় সফল হতে হলে জাগতিক নিয়মের সর্বোচ্চটুকু আমাদের রপ্ত করতে হবে। নিময়তান্ত্রিক পন্থায় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে, একই সঙ্গে পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখতে হবে আল্লাহর ওপর। এর পরও যদি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া না যায়, তবে আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপরই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। মনে বিশ্বাস রাখতে হবে—আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা প্রত্যাশার বিপরীত হলেও সেটাতেই রয়েছে আমার জন্য সর্বোচ্চ কল্যাণ। সেই কল্যাণ হতে পারে ইহকালীন কিংবা পরকালীন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

عَسَىٰٓ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰٓ اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا
وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ-

> ‘তোমরা যা অপছন্দ করো, হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালোবাসো, হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন (কোথায় তোমাদের কল্যাণ, কোথায় অকল্যাণ) তোমরা জানো না।’ (সূরা বাকারা : ২১৬)

আল্লাহ অনেক সময় বান্দার রোগ-শোক ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা তার পাপ মোচন করেন। দুনিয়ার ক্রটি দুনিয়াতেই মিটিয়ে দিয়ে প্রস্তুত করেন জান্নাতের জন্য। রাসূল ﷺ বলেন—

> ‘মুসলিম ব্যক্তির ওপর কষ্ট-ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আপতিত হলে; এমনকী তার দেহে একটি কাঁটা ফুটলেও এসবের বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।’ (বুখারি : ৫৬৪১, মুসলিম : ২৫৭৩)

সুতরাং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করার পরও যখন বান্দা কোনো ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তখন এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করছেন। তার প্রকৃত কল্যাণ সাধন করছেন জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর মাধ্যমে—যা ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট পার্থিব প্রত্যাশার চেয়ে অনেকগুণ বেশি উত্তম। বস্তুত আল্লাহই জানেন—কোথায় আমাদের কল্যাণ, আর কোথায় অকল্যাণ।

Scanned by CamScanner

তাই কার্য হাসিলের জন্য এ পৃথিবীতে আমরা আমাদের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাব, কৌশল অবলম্বন করব; যেকোনো কাজে নামার আগেই অবলম্বন করব পূর্ব সতর্কতা। কিন্তু এগুলোর কোনোটার ওপরই ভরসা রাখব না। ভরসা রাখব কেবল মহান আল্লাহর ওপর। এটাই হচ্ছে প্রকৃত তাওয়াক্কুল। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ভাগ্যলিপিতে আমাদের জন্য যা রয়েছে, ঠিক তা-ই হবে; তার চেয়ে একবিন্দু বেশিও নয়, কমও নয়। সুতরাং আমাদের বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরা আমাদের কাজটুকু করে যাব, বাকিটা তিনিই দেখবেন। চিন্তার কিছু নেই; কারণ, ভরসা তো দয়াময় বিশ্বপ্রতিপালকের ওপরই করেছি।

০

Scanned by CamScanner

দয়াময় রব গোটা সৃষ্টিজগৎকে সাজিয়েছেন অপরূপ নৈপুণ্যে, সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন অনুপম কারুকার্যের হাজারো নিদর্শন। কত বদল আর বৈচিত্র্যে ঠাসা এ চরাচর! যেন প্রভুর পরম আসমানি স্পর্শ লেগে আছে প্রতিটি কোনে। এককে সৃষ্টিকে তৈরি করেছেন এককে ব্যঞ্জনায়। এজন্যই তো অহংকার তাঁর আপন চাদর।

আমাদের যত প্রার্থনা ও স্তুতি—সকলই কেবল তাঁকে ঘিরে। তিনিই মানুষকে পাঠিয়েছেন জোড়ায় জোড়ায়; একে অন্যের ভূষণরূপে। আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন উত্তম রিজিকে, প্রখর মেধা আর তারুণ্যের প্রাণোচ্ছল চঞ্চলতায়। ভরসার ছায়া আর অবারিত অনুগ্রহে আগলে রেখেছেন তামাম কুল-কায়েনাত।

এসবেরই স্বচ্ছন্দ ও সুখপাঠ্য পর্যালোচনা হাজির করেছেন বর্তমান সময়ের তুমুল জনপ্রিয় দাঈ শাইখ মিজানুর রহমান আজহারি। সেইসঙ্গে তরুণ প্রজন্মের সামনে পেশ করেছেন সুস্থ-সুন্দর, সময়োপযোগী ও ঈমানদীপ্ত জীবনের নববি চালচিত্র। সময়ের সবুজ সওয়ারিদের আহ্বান করেছেন গৌরবময় সত্যের পথে।

Scanned by CamScanner